আত্ম স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়কে
যিনি আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়া
আমার যাত্রাপথ
সুগম করিয়াছিলেন,
তাঁহার উনত্রিশ বিবাহ-বার্ষিক দিবসে

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
। ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ।

। সূচী ।

আত্মস্মৃতি

প্রথম তরঙ্গ

পরিচয়

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র তারিখে আমার পঞ্চাশত্তম জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায়* সংক্ষেপে আমার জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন; তাহা আমার সেই জীবনের কাহিনী যাহা প্রত্যক্ষ, সকলের গোচর; সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হাকিমের সম্মুখে হলফ করিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ইহার বাহিরে আমার আর একটা জীবন আছে, যাহা শুধু অন্যের অগোচর নয়, আমারও সম্পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে নহে—কতকটা অবাঙ্‌মনসগোচর; সৃষ্টিরহস্য-সমুদ্রের উপরিভাগে যাহা মাঝে মাঝে কমলের মত শোভমান হইয়া সুরভি বিস্তার করিয়া অতলে তলাইয়া যায়—যাহার বিকাশ শুধু অনুভব করা যায়, বাস্তবে ধরা-ছোঁয়া যায় না। জানা-অজানার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত এই জীবন শুধু আমারই একান্ত নহে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই ইহা বর্তমান। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও সাধনা করিলে সকলেই স্ব-স্ব-অগোচর জীবনকে অন্তত অংশতও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু তাহার অবসর সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে কদাচিৎ ঘটে। ঝড়ের তাড়নায় শুষ্ক পাতার মত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নিরন্তর অজ্ঞাত ও অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবমান, পরিণামে কোথায় কোন্ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে তাহার বিলুপ্তি—কে তাহার সন্ধান রাখে? অতি গূঢ়, গোপন, রহস্যময় এই জীবনকে বাঙ্ময় প্রকাশ দিতে পারেন শুধু কবিরা। তাঁহারা ভাগ্যবান, বিশেষকে সাধারণ করিয়া তুলিবার অধিকারী তাঁহারা। তাঁহারাই প্রমাণ করিয়া

* 'শ্রীসজনীকান্ত দাস'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ১৯৫০

দেন—সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য কাব্যই যথার্থ মানুষের আত্মকথা; সন-তারিখের ইতিহাস—অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য, রসিকজনের কাছে অগ্রাহ্য। আমার জীবন যদি কোনদিন সম্যক্ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে, তখন তাহার কাহিনী রচনা করিবার ভার সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের—আমার নহে। যে অগোচর জীবনের কথা আগে বলিলাম তাহার আভাস কেবল আমি একাই দিতে পারি। কিন্তু একটানা সে কাহিনী ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে পারি তেমন বস্তুতান্ত্রিক হিসাবী ঐতিহাসিক আমি নই। সৌভাগ্যক্রমে কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন—মহাজীবন-জলতরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গমালার কথা সকলকে শুনাইবার উপকরণ আমার রচনায় আছে। আজ আত্মস্মৃতির নাম করিয়া জীবনের ঢেউ গনিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি—মহাজীবনজলধি ব্যাপিয়া ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, কোনটি উত্তাল হইয়া গগন স্পর্শ করিবার স্পর্ধা করিতেছে, কোনটি নীরবে নিভৃতে ভাঙ্গ করিয়া মাথা তুলিবার পূর্বেই ভাঙিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে, বায়ুপ্রঘাতে উচ্ছ্রিত ফেনপুঞ্জে কোনটি আত্মহারা, কোনটি মুহুর্মুহু বীচিভঙ্গে বর্ণাঢ্য প্রতিবিম্বমালায় সমুজ্জ্বল। এই নির্বিশেষ তরঙ্গমালার মধ্যে একটি বিশেষকে চিহ্নিত করিবার জন্য কিছু লৌকিক প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। গোড়ায় সেই পরিচয়-কাহিনীই বলিব।

বর্ধমান জেলার বহরান গ্রামে দাসগোষ্ঠীর আদি নিবাস। বহরান উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থপ্রধান গ্রাম ছিল। আমরাও ওই সমাজভুক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই-একজন পদকর্তা ও কবিও ছিলেন। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে বহরান ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার বোলপুর স্টেশনের সন্নিকটবর্তী রাইপুর গ্রামে বসবাস

করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ লর্ড সিন্‌হা অব রাইপুর হইয়া এই গ্রামকে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছেন। দাসেরা বর্তমানে সেই রাইপুরের অধিবাসী। আমার পিতা হরেন্দ্রলাল দাস সিউড়ি সরকারী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাস করিয়া বর্ধমান রাজ কলেজে এফ. এ. পড়িতে পড়িতে কানুনগো হিসাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবিষ্ট হন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর হইতে পার্টিশন-ডেপুটি কালেক্টররূপে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাবনায় সাবডেপুটি কালেক্টর হইয়াছিলেন। আমার মাতুলালয় বর্ধমান জেলার মানকর স্টেশনের অনতিদূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত বুদ্বুদ থানার দক্ষিণে বেতালবন গ্রামে। সেখানকার সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারের কন্যা আমার মাতা তুঙ্গলতা। তাঁহার ন'দাদা সূর্যলাল দত্ত বাঁকুড়া শহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নটবর দত্ত মানকরের নাম-করা ডাক্তার—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের একজন বন্ধু ও সহপাঠী। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে এখন একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। দীক্ষায় যাহাই হউক, ব্যবহারে আমার পিতৃকুল ঘোরতর শাক্ত এবং মাতৃকুল ঘোরতর বৈষ্ণব। মাতাঠাকুরাণী সামান্য যেটুকু লেখাপড়া জানিতেন তাহার সাহায্যে তাঁহাকে আমাদের বাল্যকালে 'গোবিন্দ-লীলামৃত,' নরহরি সরকারের 'প্রার্থনা' প্রভৃতি পড়িতে দেখিতাম। প্রত্যহ ভোরে তাঁহার সুর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আবৃত্তিতে আমাদের ঘুম ভাঙিত।

বেতালবনে মাতুলালয়ে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যায় আমার জন্ম হয়, ইংরেজী ১৯০০, ২৫এ আগস্ট। কুম্ভলগ্নে জন্ম, নরগণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, সিংহরাশি। আমার জন্মের ঠিক এক বৎসর পূর্বে পিতামহ বৈদ্যনাথ দেহরক্ষা করেন, তিনিই আমার দেহে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন—পিতার বৃদ্ধা আত্মীয়ারা এইরূপ উল্লেখ করিতেন। আমার পূর্বে তিন সহোদর এবং এক ভগিনী,

পরে তিন ভগিনী, এক সহোদর। নয় ভাই-বোনের মধ্যে এখন তিন ভাই এক বোন বর্তমান আছি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই বাঁকুড়া শহরে মাতার এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় পিতার মৃত্যু হয়। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ (মৃত্যু : কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) যৌবনে স্বদেশী আমলে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

চার-পাঁচ বৎসর বয়সে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন আমরা উত্তর-বঙ্গের মালদহ শহরে (ইংরেজবাজার) কালীতলা নামক পাড়ার বাসিন্দা। তৎপূর্বে স্বগ্রামস্থ লর্ড সিংহের পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে আমার হাতেখড়ি হয়। এই সিতিকণ্ঠ সিংহের সহোদর শ্রীকণ্ঠ সিংহকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তার সহিত চিত্রিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের পথে আমার প্রথম স্মরণীয় গুরু স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার—তাঁহার পিতা তখন চাকুরিব্যপদেশে মালদহে আমাদেরই প্রতিবেশী ছিলেন। বিনয়কুমার নিজের পড়াশুনার অবকাশে আমাকে "ঐক্য-বাক্য" শিখাইতেন। স্বদেশী আন্দোলন তখন বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া সবে শুরু হইয়াছে। বিপিন ঘোষ ও রাধেশ শেঠের নেতৃত্বে "বাঙালী জাতির কর্মবীর" বিনয়কুমারের দল সমগ্র মালদহ শহরকে জাতীয়তা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু হইলেও আমার মনে তখন হইতেই স্বদেশভক্তির রঙ ধরিয়াছিল। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্" গানের সঙ্গে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে দল বাঁধিয়া নগর পরিভ্রমণ করার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে আছে গম্ভীরা-গান—সামান্য খুঁটিনাটি দৈনন্দিন ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গবিভাগ ও বিদেশীবর্জন প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শিবো-মহাদেবকে উপলক্ষ করিয়া সেই গম্ভীরা-গানের মহিমা স্মরণ করিলে আজিও

এক অনির্বচনীয় রসে মন ভরিয়া যায়। জাতীয় সাহিত্যের সহিত আমার প্রথম পরিচয় এই গম্ভীরা-গানের সাহায্যেই ঘটে। দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর পরে মালদহে সসম্মানে নিমন্ত্রিত হইয়া আমারই নামে বাঁধা গম্ভীরা-গান শুনিয়াও চিত্তে সে অনির্বচনীয়তার সঞ্চার হয় নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলেও "হায় রে সেকাল" বলিয়া আক্ষেপ যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষকে করিতেই হয়, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

আরম্ভ যেখানে যাহার কাছেই হউক, দীনবন্ধু চৌধুরী বা প্রসিদ্ধ দীনু পণ্ডিতের পাঠশালার শিক্ষা আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া আছে। সার্থক গুরুমহাশয় হিসাবে তাঁহার তুলনা এ যুগে তো মিলেই না, সে যুগেও মিলিত না। মালদহের বর্তমান প্রবীণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই শিক্ষার পত্তন এই দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায়। দীনু পণ্ডিতের কাছে কি শিখিয়াছিলাম—সরাসরি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজ কঠিন। আজ আমার সমগ্র জীবনের আলোকে হিসাব খতাইয়া এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, তিনি আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত অঙ্ক বা গণিতশাস্ত্র শিখাইয়াছিলেন—পরবর্তী জীবনে যাহা নিয়মানুবর্তিতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। পাঠশালা এবং স্কুল-জীবনে লেখাপড়ায় আমার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। এই পাঠশালা হইতে নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া আমি সমগ্র জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। অতঃপর স্থানীয় সরকারী জিলা-স্কুলে ক্লাস ফোর এবং ক্লাস ফাইভের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়িয়া, পিতা পাবনায় ১৯১২ সনে বদলি হওয়ায়, ন'মামার কর্মস্থল বাঁকুড়ায় নীত হই। সেখানে ছয় মাস কাল বাড়িতেই পড়াশুনা করিয়া ১৯১৩ সনের গোড়ায় পাবনা জিলা-স্কুলের ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ক্লাস সেভেনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়িয়া ১৯১৪ সনে দিনাজপুরে উপস্থিত হই এবং সেখানে জিলা-স্কুলে ক্লাস

মেডেলে ভর্তি হইয়া কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করি। সেখান হইতেই ১৯১৮ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করি।

আমার এই স্কুল-জীবনে স্কুলের শিক্ষা নিতান্ত গৌণ ছিল। নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবাধ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনের জন্য আমার কিশোর মন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। জন্মভূমির শীতে-শীর্ণতোয়া এবং বরষায়-দুকূলপ্লাবী অজয়, মালদহের কুলুকুলু-কলস্রোতা মহানন্দা, বাঁকুড়ার কচিৎ-মুমূর্ষু কচিৎ-ভীষণ দ্বারকেশ্বর এবং তাহার নিত্যসঙ্গিনী বালুমাত্ররূপা গন্ধেশ্বরী, পাবনার পারাপার-চিহ্নহীন সুবিপুলা ভয়ঙ্করী পদ্মা এবং দিনাজপুরের পল্লীবধূর মত শান্ত নিরলঙ্কার নিরহঙ্কার কাঞ্চন—ইহাদেরই খর অথবা ক্ষীণ ধারার সিঞ্চনে আমার মনের কাব্যরসপিপাসা আবাল্য শুধু মিটে নাই, আমার কাব্যজীবনের সহিত তাহারা ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে স্টীমারে প্রথম পদ্মা পাড়ি দিয়াছিলাম শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে; পরদিন রৌদ্রালোকিত প্রভাতে কুলঝাউবনের মাঝে দাঁড়াইয়া পদ্মার যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা আজও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করিতেছে। পাবনা হইতে দিনাজপুর যখন যাই, তখন সবে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সারা-ব্রীজনির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই—কি বিপুল আতঙ্ক ও উন্মাদনার মাঝখানে খেয়া-স্টীমারের যাত্রী হিসাবে সেদিন যে আবার পদ্মাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা মাত্র অনুভবগম্য। এই নদী, তটভূমি ও বালুবেলাগুলি আমার অন্তর্জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইয়াছিলাম, কিন্তু দিনাজপুরে থাকিতেই সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছিল; সুতরাং

সকল বিপ্লব-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল রাজধানী কলিকাতায় অধ্যয়ন আমার বারণ হইয়া গেল। পিতা সরকারী চাকুরিজীবী, সুতরাং আদেশ অমান্য করা গেল না। বিপ্লব-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তখন অনগ্রসর বাঁকুড়ার শান্ত পরিবেশে ওয়েস্‌লিয়ান মিশনরী কলেজে আমাকে ভর্তি করা হইল এবং সংলগ্ন হস্টেলে খাস বিলাতী সাহেবদের তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখা হইল। এই পরিবর্তনের ধাক্কায় মন উদাসীন হইয়া গেল, ফলে পাঠ সম্পূর্ণ শিকায় তুলিয়া রাখিয়া সহপাঠী ও সহবাসী বন্ধুদের মোড়লির কাজ লইলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত অধ্যয়নের ভিত্তি এমনই দৃঢ় ছিল যে, তাহার জোরেই আই. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উচ্চ স্থান অধিকার করিলাম। দুই বৎসর বাঁকুড়ার ঠাণ্ডা গারদে থাকিয়া কলিকাতার গরমে আসিবার আর কোনও বাধা ছিল না। সুতরাং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে স্কটিশ চার্চেস কলেজে বি. এস-সি. কেমিস্ট্রি অনার্সের ছাত্ররূপে কলিকাতায় পদার্পণ করিলাম। তোড়জোড়ে একটু দেরি হইয়াছিল, সুতরাং সাধারণ হিন্দু হস্টেলগুলিতে স্থানাভাব ঘটিল। অগত্যা প্রধানত খ্রীষ্টীয়ান ছাত্র-অধ্যুষিত মুসলমান বাবুর্চি-বয়-সেবিত ডাফ হস্টেলেই ডেরা বাঁধিলাম। অতি ভালমানুষ স্ক্রীমজার সাহেব ছিলেন হস্টেলের প্রধান রক্ষক, কিন্তু নামেমাত্র ; আসলে আমাদের আহার-বিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন একজন দিশী সাহেব; যে কারণেই হউক, প্রায়শই আহার্যবস্তুর ত্রুটি ঘটিতে লাগিল। আমার নেতৃত্বে কয়েকজন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, মামলা ঊর্ধ্বতন কলেজ-কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা অখ্রীষ্টীয়ান নেতাকে অগিল্‌ভি হস্টেলে বদলি করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন।

১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন যুবকের সহিত তখন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, তাহাদের

সহায়তায় একটি ভলান্টিয়ার দল গঠন করিলাম এবং যোগ্যতার সঙ্গে নেতা-সেবা করিয়া কলিকাতার রাজনৈতিক মহলে পরিচিত হইলাম। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে তখনই খুব নিকট সান্নিধ্যে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং উক্ত কয়দিনের অভিজ্ঞতায় দেশ ও মানুষ সম্পর্কে নূতন জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলাম।

অগিল্‌ভি হস্টেলে দেড় বৎসর অতিশয় সুখে অত্যন্ত আমোদে ও আনন্দে ছিলাম। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বি.এস-সি. পরীক্ষা দিয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করি। দেড় বৎসরকাল যাহাদের সহিত এই কালে দিনরাত্রি একত্রে কাটাইয়াছিলাম, তাহাদের অনেকেই আজ সরকারী ও বেসরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে কৃতী পুরুষ। সেই সময় খেলাধূলার মধ্য দিয়া যে অনাবিল চাপল্যে আমরা দিন কাটাইয়াছিলাম তাহা স্মরণে রাখিবার মত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরেই লেখাপড়ায় আমার যে ঔদাস্য জন্মিয়াছিল, তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল—কমে নাই, শুধু প্রাক্‌-ম্যাট্রিক পাকা ভিতের জোরে বি.এস-সি.ও পাস করিয়াছিলাম। খেলাধূলা ও সাহিত্যচর্চা লইয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতাম,—বিজ্ঞানের ছাত্র, সুতরাং সাহিত্যও খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল। আমার সাহিত্যজীবন গঠনে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেল ও অগিল্‌ভি হস্টেলের স্থান বিস্তৃততরভাবে স্মরণীয়। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুই স্থানে পত্তনের কাজ নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বি.এস-সি. পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার জন্য প্রার্থী দাঁড়াইলাম। ডাক্তার নটবর দত্ত আমার মাতুল, তাঁহার নামে কাজ হইল। আমি নির্বাচিত হইলাম কিন্তু আমার আর এক মামা বর্ধমানের উকিল জ্ঞানেন্দ্রলাল দত্তের পুত্র বিভূতিভূষণ দত্ত আই. এস-সি. পাস করিয়া প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিল, সেও নটবর দত্তের নিকটতর আত্মীয়তার দাবি জানাইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকেই মনোনীত করিয়া তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। আমি তখন

কঠিন আত্মত্যাগ করিয়া নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলাম। বিভূতি নির্বাচিত হইল।

ইহার পর আর কলিকাতায় নয়। আমি সুদূর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ইলেকৃট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে গেলাম। সুবিখ্যাত কিং সাহেব তখন সেখানকার অধ্যক্ষ, তাঁহার বাঙালী-প্রীতি সর্বজনবিদিত। এই অপরাধের জন্য ইউনিভার্সিটি-প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে তাঁহার প্রায়শই খিটিমিটি বাধিত। এই কলহের যুপকাষ্ঠে আমিই প্রথম বলি। কলেজ-সংলগ্ন হস্টেলগুলিতে মাছ মাংস ডিম রান্না বা খাওয়া নিষেধ ছিল। আজিও সেই ব্যবস্থা আছে কি-না জানি না। কিন্তু আমরা বাঙালী ছেলেরা, তখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। অনেকগুলি পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ছাত্রও আমাদের সহিত যোগ দিল। আমি হইলাম নেতা, সুতরাং পণ্ডিত মালব্যজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আমাকে সমর্থন করিলেন কিং সাহেব, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিলেন না। ফলে দুই মাস যাইতে না যাইতেই ইঞ্জিনীয়ারিং-সরস্বতীকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলাম। সেকালের সেই কলহের ইতিহাস অতিশয় চমকপ্রদ, বাঙালীবিদ্বেষ তাহার পূর্ব হইতে পশ্চিম ভারতে রূপপরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাহা হউক, আমি বীরের মতন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফিজিক্স (হীট) বিভাগে ভর্তি হইয়া এম.এস-সি. পড়িতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু আমার বিজ্ঞান-সরস্বতীর ভাগ্যও তেমন জোরালো ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চা এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপভোগের সঙ্গে পালা করিয়া কয়েকটি কঠিন রোগীর সেবাই মুখ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখানে সেখানে সঙ্কটত্রাণের কাজে বিশেষ উৎসাহী হইয়া পড়ি। দুই বৎসর পরে কলেজের পাঠক্রম যখন

সম্পূর্ণ এবং শেষ-পরীক্ষার দাবি যখন প্রবল, ঠিক তখনই 'শনিবারের চিঠি'র আবর্তে পড়িয়া বিজ্ঞান-জগৎ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইলাম, এবং একদা শুভ প্রভাতে অনুভব হইল নৌকাডুবির পর সাহিত্যের বালুচরে পড়িয়া আছি। "কমলা"ও পাশেই মূর্ছিতা ছিলেন কিনা উপলব্ধি হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় স্বাভাবিক সমাপ্তিরেখা আর টানা হইল না।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেই দিন হইতে সাহিত্য এবং তদানুষঙ্গিক নানা ব্যাপার আমার উপজীবিকা হইয়াছে এবং নানা বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া আমি বর্তমান পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এম.এস-সি. পড়িবার সময়েই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুন—১৩৩০ সালের ৪ঠা আষাঢ় স্বগ্রামনিবাসী ও তখন কলিকাতা-প্রবাসী পশুপতিনাথ চৌধুরীর (মৃত্যু : কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪) জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধারাণীর সহিত আমার বিবাহ হয়। তিনি আমার সাহিত্য-জীবনে কতখানি ছায়া বা আলোক পাত করিয়াছেন আমার এতাবৎকালরচিত সাহিত্যের মধ্যে নানা স্থানে তাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে বিধৃত হইয়া আছে।

প্রথম পরিচয়তরঙ্গ আর একটি কথা বলিয়াই শেষ করিব—আমার চাকুরি-জীবনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়-সরস্বতীর সেবায় ইস্তফা দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র লেখক হিসাবে যে দিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, তখন পৈতৃক মাসহারা বন্ধ হইয়াছে এবং আমি প্রাইভেট টিউশানি করিয়া কলিকাতায় দিন গুজরান করিতেছি। সে আয় এত সামান্য যে মূল্যবিনিময়ে একসঙ্গে আহার ও বাসস্থানের যোগাড় হইত না, কাজেই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বদলে ১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট—বিশ্বভারতী আপিসে কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি' শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিতান্ত শখের কাগজ ছিল। তিনি 'প্রবাসী'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং তখন 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ'

কার্যালয় ও প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ। ৯১নং আপার সারকুলার রোডে সেই প্রেস ও আপিস ছিল এবং সেখান হইতেই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' বাহির হইত। প্রথম সাত সংখ্যার সহিত আমার কিছুমাত্র যোগ ছিল না। হঠাৎ অষ্টম সংখ্যা হইতে আমি লেখক। এই সুবাদে অত্যল্পকাল মধ্যে 'প্রবাসী'র প্রূফ-রীডার হিসাবে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলাম, এবং সেখানে প্রায় সাত বৎসরকাল প্রূফ-রীডার, 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' ও 'ওয়েল্‌ফেয়ার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং সর্বশেষে ছাপাখানার ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর তারিখে চাকুরিতে ইস্তফা দিই। তখন আমার মাসিক বেতন ১৭০৲।

'প্রবাসী'র সম্পর্ক ত্যাগ করিবার কিছু দিনের মধ্যেই 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুপ্তভাবে 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় "সাময়িক প্রসঙ্গ" লেখার কাজে আমাকে নিযুক্ত করেন।

এই 'বসুমতী'র এক ২৬এ চৈত্র সংখ্যায় "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" লিখিয়াছিলাম। এই লেখাটি বঙ্গলক্ষ্মী মিলের স্বনামধন্য সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে। তিনি তখন 'উপাসনা'-প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করিয়া সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্নের সহিত বন্দোবস্তে 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিবার মতলব করিতেছেন। উক্ত "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে"র অধম লেখককে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই তিনি আমাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'উপাসনা'র সম্পাদক ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। 'উপাসনা'র নাম বদল করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখি এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ নভেম্বর হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর দুই মাস কাল ওই কার্য করিয়া শেষে মতান্তরের জন্য কাজ ছাড়িয়া দিই।

এইখানেই প্রকৃতপক্ষে আমার চাকুরি-জীবনের সমাপ্তি। ইহার পর শখের কাজ অনেক করিয়াছি, উপরি দক্ষিণাও মন্দ পাই নাই; কিন্তু পাকাপাকিরূপে চাকুরির যূপকাষ্ঠে আর বাঁধা পড়ি নাই। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। ১৯৩১ সনের ৭ই অক্টোবর তারিখে যখন 'প্রবাসী'র কাজ ছাড়ি, তখন 'শনিবারের চিঠি'র নবপর্যায় সবে এক মাস সম্পূর্ণ নিজ-দায়িত্বে বাহির করিয়াছি এবং কেবলমাত্র টাইপ খরিদ করিয়া 'চিঠি'র নিজস্ব ছাপাখানাও স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তী চাকুরি-জীবনের সমান্তরাল ভাবে 'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত চলিতেছে। এই 'শনিবারের চিঠি', 'শনিরঞ্জন প্রেস' ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে'র ইতিহাস আমার সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

বাল্যকালে স্কুল-জীবনের মাঝামাঝি পর্যায়ে বঙ্গভারতীর দরবারে প্রথম অর্ঘ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সতীর্থরাই সহযোগী ছিল। কলেজ-জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা সাহিত্যসেবীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম—অনেকের প্রীতি সহানুভূতি ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছি, কলহ ও বিরোধও বড় কম ঘনাইয়া উঠে নাই। এই সকল ঘটনার বিবরণ নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়, ইহার সহিত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসেরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। যথাকালে সে উল্লেখও করিব। 'আত্মস্মৃতি'র ভূমিকা হিসাবে আমার লৌকিক বাহ্য পরিচয় সংক্ষেপে ইহাই; কিন্তু ইহা আমার জীবনের কতটুকু? জীবন-জলধি তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, অতঃপর, নানা সময়ে কাব্যজালে তাহাই কি ভাবে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাই বলিব।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

উন্মেষ

মালদহে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া তখন জিলা-স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, বয়স নয় কি দশ হইবে। গ্রীষ্মাবকাশে কি করিয়া অবসর যাপন করিব তাহাই ছিল সমস্যা। বাবা সদরের দশটা-পাঁচটা চাকরি এবং প্রায়শই মফস্বলের সফর লইয়া ব্যস্ত, বড়দা সুদূর বাঁকুড়ায় মাতুলালয়ে থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, জিলা-স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র মেজদাই (অজপেন্দ্রনাথ) বলিতে গেলে আমাদের অভিভাবক। তিনি পেল্লায় পালোয়ান, ডন বৈঠক কুস্তি কুম্ভক লইয়াই মত্ত। লেখা-পড়াটা তাঁহার গৌণ-সাধনা। দাদা (সৌরীন্দ্রনাথ) ও আমি পিঠোপিঠি, মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধান। পড়াশুনায় আমরা এক রকম খেয়াল-খুশিতেই চলি। আজকালকার মত তখন গৃহ-শিক্ষকের রেওয়াজ ছিল না; নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হইত। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাতে ফল যে মন্দ হইয়াছে বলিতে পারি না। পাঠ্যের সঙ্গে অপাঠ্য পুস্তক পড়িবার প্রচুর সুবিধা আমাদের দেওয়া হইত। প্রচুরতম সুযোগ মিলিত গ্রীষ্মাবকাশে। স্কুল-জীবনের মধুরতম ছুটি এই গ্রীষ্মের ছুটি, কারণ অভিভাবকেরা চাকরিতে যূপবদ্ধ, ছেলেদের ছুটি। সমস্যা ছিল বই সংগ্রহের। এত লাইব্রেরির তখন প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সাধারণ গৃহস্থ-বাড়িতেও পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানি ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলা দেশের এই কালের ছেলেমেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতিপরায়ণ না হইলে তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলা দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্মিত হইত। আমরা প্রায়ই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বাহির হইতাম। যোগীন্দ্রনাথ সরকারেরই সঙ্কলিত

একখানি বই সংগৃহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। সামান্য একটি কবিতা, ধরন-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়, কথাগুলাও নূতন নয়—কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল। সেই দিন সেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে উঠানের ডালিম-গাছতলায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম—

"দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ ঠঙ।
ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা।
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান ॥"

এক সঙ্গে দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সুগভীর ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম। তেমনটি আর কখনও করি নাই। প্রখর রৌদ্রালোকে নিখিল ভুবন পুড়িয়া যাইতেছে, একটা অলস রুক্ষ ঔদাসীন্যে চারিদিক থম্‌থম্ করিতেছে। বিরলপথিক পথের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিলে মরীচিকাও যেন দেখা যায়। শুধু গৃহপারাবতের উদাস কূজন আর দূরে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা ডাক প্রকৃতির সজীবতার করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে অবোধ বালকের মনে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেই নিদাঘ-দিবাবসানের রমণীয়তা নামিয়া আসিল, মেদুর মেঘে যেন সারা আকাশটা ছাইয়া গেল, বুঝি এখনি বৃষ্টি নামিবে। পড়া আর অগ্রসর হইল না, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ দাদা আসিয়া ছোঁ মারিয়া বইখানা লইয়া অন্তর্ধান করিল। আমি প্রতিকারার্থ করুণ ভাবে মাকে ডাকিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা রান্নাঘরে বাবার জন্য

বৈকালিক জলখাবার প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি আমল দিলেন না। মামলা মুলতুবি রহিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত সজাগ রহিলাম। অসন্দিগ্ধ দাদা বইখানিকে ঘরের তাকের উঁপর জলের গেলাস চাপা দিয়া রাখিয়া মেঝেতেই ঘুমাইয়া পড়িল, আড়চোখে দেখিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া তাকের ধারে গিয়া ডিঙি মারিয়া বইখানিতে হাত দিলাম। তর সহিতেছিল না। অতি ব্যস্ততায় জলের গেলাসের কথা ভুল হইয়া গেল। বইটি টানিয়া লইতেই জলশুদ্ধ গেলাস মেঝেয় শায়িত দাদার বুকের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর যে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিল তাহা অনুমানসাপেক্ষ। পালোয়ান মেজদাদা আসিয়া আমার কানে ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন, মা দাদার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে বসিলেন। পাড়াপড়শিনীদের সমাগম হইল। আমার মনের সাহিত্য-ব্যাকুলতা সূচনাতেই ঘোর বাধাগ্রস্ত হইল। ব্যাপারটার জের অনেক দূর গড়াইয়াছিল বলিয়া আজও এমন স্পষ্ট মনে আছে। রাশভারি বাবা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কাছারি হইতে ফিরিয়া আসামী-ফরিয়াদী উভয়কেই ছাতা-পেটা করিয়া, নাই দেওয়ার অপরাধে মায়ের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গিয়া পড়াতে কয়েকটা লঘু ছত্রদণ্ডেই আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম।

দুর্ঘটনার পূর্বে বইখানি সেই যে সংগ্রহ করিয়াছিলাম আর ছাড়ি নাই। কোলাহল শান্ত হইলে খেলিতে যাইবার অছিলায় মহানন্দা নদীতীরবর্তী একটি কাঠের গোলার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির উপর একলা বসিয়া আবার পড়িলাম—

> "কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা,
> শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল কবেকার সে কথা।
> সেদিনো কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা,
> থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।

তিন কন্তে বিয়ে ক'রে কী হ'ল তার শেষে,
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে।
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।"

এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। তলায় নাম দেখিলাম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল।

আমার জীবনের বাণী-সাধনার এইখানেই সূত্রপাত। পরের জবানিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মন নিজের জবানিতে প্রকাশ খুঁজিতে লাগিল। আমরা প্রতিদিন যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা কল্পনা করি তাহারও যে একটা ছন্দোবদ্ধ বিচিত্র রূপ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা তুচ্ছ, যাহা সাময়িক তাহারও যে একটা বিরাট চিরন্তন মহিমা পর পর শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলা শব্দের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে তাহার অস্পষ্ট অনুভূতি সেই দিন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। এই অনুভূতির কথা পরবর্তী কালে 'রাজহংসে'র অন্তর্গত "তমসা-জাহ্নবী" কবিতায় এই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে—

কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ;
এপারে দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্র শিশু গণে জল-ঢেউ—
এক, দুই, তিন, চারি। কাঠের গোলার আশেপাশে,
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকাচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি' ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশরবিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি'
আছাড়ি' সাঁতারি' খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশু-মনে সহসা সে অপূর্ব প্রকাশ—
টাপুর টুপুর বিষ্টি, কোন্ সে নদীতে এল বান;
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।

এই আদি শিহরণই আমার জীবনকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। অন্য গুরুতর স্পন্দন যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু বাণীতরঙ্গের আঘাতে সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিশু যেমন অবোধ আগ্রহে মাকে খুঁজিয়া বেড়ায় আমার মনও তেমনি খুঁজিয়া ফিরিয়াছে সুর আর ছন্দ। আমার মায়ের সঙ্গে এই নবজীবন-উন্মেষের সম্পর্ক অতি গূঢ়। 'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্রে মায়ের কথা স্মরণ করিতে গিয়া এই উৎস-মুখের কথাই সর্বাগ্রে মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু সেই উৎস-মুখের সঠিক সন্ধান পাই নাই। আজ যে তাহা পাইয়া জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহা নয়। অ-ধরাকে ধরার প্রয়াসই সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে আমার কথা ছিল—

> যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
> কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে,
> থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
> হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার ?
> এপারে-ওপারে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীর গূঢ় ব্যথা
> বুঝিত কি নদী নদীজল-কলকলে ?
> বুঝিত না, তবু স্রোতোজলে পেত উৎসের পরিচয়।

প্রান্তরে ক্রমপ্রসারিত শীর্ণ গিরিনদী বার বার পিছন ফিরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু মাকে খুঁজিয়া পায় নাই। অবিচ্ছিন্ন গতিপথে তাহার সেই বেদনাই বিচিত্র মর্মরধ্বনিতে ছন্দায়িত হইয়াছে।

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"-এর পূর্বে প্রস্তুতির আরও একটু ইতিহাস আছে, যাহা এ-যুগের অভিভাবক ও ছাত্রদের পক্ষে শোনা দরকার। কোনও মানুষই বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না। তাহার বিকাশের পক্ষে পরিবেশের প্রভাব এবং জাতীয় সংস্কার—গাছের পক্ষে মাটি-জল-

বায়ুর মতই প্রয়োজন। আজকাল দেখিতে পাই, অনেক শিশুই সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' এবং 'হ য ব র ল' দিয়া কল্পনা-জীবন শুরু করে। তাহাতে ছন্দ ও সুর অধিগত হয় বটে, কিন্তু যে বহু পুরাতন ধারা ধরিয়া যুগে যুগে আমরা বহিয়া আসিয়াছি তাহার কোনও সন্ধান মিলে না। যে মহৎ আদর্শ ও বিরাট চরিত্র ভারতবর্ষের মানুষকে আদি কাল হইতে গঠন করিয়া আসিতেছে, দেহে রক্তমাংসের মত যাহা আমাদের জাতীয় চরিত্রে ওতপ্রোত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া কোনও শিশুই দেশের মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না। আমি ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের কথা বলিতেছি না। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের সার চুঁইয়া-গড়াইয়া যে দুইটি থালায় আশ্রয় লাভ করিয়া সর্বসাধারণের ভোজে পরিবেশিত হইয়াছে সেই রামায়ণ ও মহাভারতের কথা বলিতেছি। এই থালা দুইটিও স্থানভেদে ও কালভেদে স্থান ও যুগোপযোগী আহার্যের আধার হইয়াছে। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা দেশে হইয়াছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পশ্চিমে হইয়াছে তুলসীদাসী রামায়ণ; বাংলা দেশে বেদব্যাসের মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পরিবেশক হইয়াছেন কাশীরাম দাস। মধ্যে এই দুইটি মহাগ্রন্থেরই চর্চা উঠিয়া গিয়াছিল; ফলে এক ধরনের নিরাকার কল্পনারাজ্যে দেশের শিশুমন হাঁপাইয়া মরিতেছিল, থই পাইতেছিল না। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি ফিরিতেছে, শুধু আরব্য উপন্যাস এবং বৈদেশিক পরীকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসপ্রধান আজগুবি শিশু-কবিতা আওড়াইয়াই দেশের ছেলেমেয়েদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে না।

গ্রীষ্ম অথবা পূজা কোন এক অবকাশ মালদহে যাপন করিবার জন্য আমাদের প্রায় অপরিচিত বড়দাদা বাঁকুড়া হইতে আসিলেন। অপরিচয়ের দরুন আমাদের ভালবাসা ও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের

পর্যায় ছাড়ায় নাই। তিনি সকলের জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট গেলাম, আমার ভাগ্যে উঠিল—এক খণ্ড 'সরল কৃত্তিবাস'—কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. সম্পাদিত, বহু চিত্র সম্বলিত। বইখানি হাতে দিয়া বড়দাদা বলিলেন, যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, আগামী ছুটিতে একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত পুরস্কার মিলিবে। উৎফুল্ল হইয়া বই লইয়া মাতৃসন্নিধানে গিয়া বসিলাম। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল—

"অমৃত-মধুর এই সীতারাম-লীলা।
শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা॥"

অত্যল্পকালমধ্যে সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নিঃশেষে পড়িয়া ফেলিলাম এবং তাহা মর্মের মধ্যে এমনই গাঁথিয়া গেল যে, মাস ছয়েক যাইতে না যাইতেই বইখানি হাতে না লইয়াই

"গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় বৈসেন গদাধর॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ॥
শ্রীরাম, ভরত, আর শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥"

হইতে আরম্ভ করিয়া "এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড" পর্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিলাম। সুতরাং যথাকালে কাশীরাম দাসের মহাভারতও উপহার লাভ করিলাম। শুধু রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীই যে আয়ত্ত করিলাম তাহা নহে; পুরাতন পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের উপর দখল জন্মিল এবং অতি বাল্যকালেই আমার মনের অভিধান বহু শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহা হইল গৌণ লাভ, মুখ্য লাভ হইল—জীবনের জটিল দুর্গম পথে চলিতে চলিতে যেখানেই অপ্রত্যাশিত সমস্যা আসিয়া

পথরোধ করিত, সেখানেই সমাধানের ইঙ্গিতও এই রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র হইতে পাইতে লাগিলাম। ইহা যে কত বড় লাভ, লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না, এখনও প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথই আমার মনে সঞ্চারিত করিয়াছেন। 'সরল কৃত্তিবাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, সেই বৎসরেই তাহা আমার হস্তগত হয়। বইটির "ভূমিকা" লিখিয়াছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার সব কথা যে বুঝিয়াছিলাম তাহা নহে, তবু তাঁহার এই কয়টি কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল, রামায়ণের উদ্ধৃত পয়ারের মত সেই কথাগুলি আজও সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে তুলিয়া দিতে পারি—

> "এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল; এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মহানদী যেমন সকল দেশে নাই, তেমনি মহাকাব্য পৃথিবীর অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, সে দেশের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। এই সৌভাগ্যের ফল যে কত সুদূরবিস্তৃত, তাহা আমাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য বশতঃই আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। এ কথা আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিতেছে—কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামের মহাভারতও তেমনি করিয়া চিরদিন আমাদের মনের অন্ন-পানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে, আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।" (৩০ শ্রাবণ, ১৩১৪)

পয়ার-ত্রিপদীর ভাণ্ডারে "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"-এর ছন্দ একটা নূতনত্বের আমদানি করিল, এবং মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল

আবার এই "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নাম। অনুসন্ধিৎসু চিত্ত এই নামের সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। মেজদাদা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পালোয়ানী জবাব দিলেন—স্বদেশী গান লেখেন, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্" ওঁরই লেখা; রাখীবন্ধনের গান "বাংলার মাটি, বাংলার জল"ও তিনিই রচনা করিয়াছেন। বিস্মিত মন বিমুগ্ধ হইতে বিলম্ব হইল না এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতে পাইলাম বাল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার 'কথা ও কাহিনী,' ওই "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"-প্রণীত। "কথা কও, কথা কও"—এই বিচিত্র মর্মস্পর্শী আদেশ আমিও শুনিতে পাইলাম। কথা কহিতে হইবে। কবে, কখন, কোথায়, কাহাকে, কেমন করিয়া?—এ সকল অতি সমীচীন প্রশ্ন চপল অবোধ বালকের মনে ক্ষণিকের জন্য উদয় হইল না। শুধু হুকুম শুনিলাম, কথা কও, কথা কও।

শেষ পর্যন্ত হুকুম পালন করিলাম, কথা কহিলাম।

তৃতীয় তরঙ্গ

প্রস্তুতি (১)

কিন্তু কথা কহিতে হইলে কথা শোনা দরকার। শিশু চোখ কান নাক মুখ দিয়া অবিরত কথা শোনে, বহিঃপ্রকৃতি হইতে নিজের সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কথা আহরণ করিয়া লয়; দীর্ঘ দিন প্রস্তুতির কাজ চলে, তবে সে সুবোধ্য কথা বলিবার অধিকারী হয়। গোড়ার দিকে অস্পষ্ট কথা, আধ-আধ কথা, ইঙ্গিত-ক্রন্দন-চিৎকারের সঙ্গে কথা সে অনেক বলে, অতিশয় ভাগ্যবান দুই-চারিজন মানুষের বেলায় তাহার ইতিহাস লিখিত বা রক্ষিত হয়, এবং সে ইতিহাস তাঁহাদের পরবর্তী জীবনের খ্যাতির অনুপাতে মানুষ কৌতুক, কৌতূহল ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে। কিন্তু আসলে সকল ক্ষেত্রেই হাঁটি-হাঁটি-পা-পা-চলার কাহিনী এক, এবং তাহা পতনে ও হোঁচট-খাওয়ায় কণ্টকিত। আমার প্রথম কথা বলার প্রয়াস আর পাঁচজনের মতই অত্যন্ত সাধারণ, ঘটা করিয়া তাহার বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা কহিবার অধিকার লাভ করিয়াছি মনে করিয়া এই যে আমার সাহিত্য-জীবন-কথা সকলের সামনে মেলিয়া ধরিতেছি—নিতান্ত শিশুকাল হইতে যে সকল কথা শুনিয়া শুনিয়া সেই অধিকার-বোধ জন্মিয়াছে, তাহার তালিকা ও সামান্য বর্ণনা নূতন যুগের সাহিত্যকামীদের কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

শিল্পী বা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শিশুর কথা বলার তুলনা দিয়াছি। শিশুর কথা আহরণ ও সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন মা বা তাঁহার স্থানীয় কেহ; তাঁহার স্নেহ-রসধারায় সিঞ্চিত কথা শুধু ভাষাই জোগায় না, ধীরে ধীরে শিশুর মনে ভাবেরও সঞ্চার করে। যে সকল সাহিত্যসাধক মায়ের মুখ হইতে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ-জীবনের মনের খোরাকও সংগ্রহ করিতে পায়

তাহারা ভাগ্যবান। আমাদের শিশুকালে সে ভাগ্য কদাচিৎ ঘটিত, আমাদের মায়েরা শিক্ষায় দড় ছিলেন না, রান্না-বান্না গৃহস্থালী লইয়াই প্রত্যুষের প্রায়ান্ধকার হইতে নিশীথের নিষুতি পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন, হতভাগ্য শিশুদের কল্পনার আহার্য জোগাইবার অবসর তাঁহারা পাইতেন না। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বা অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, সে সৌভাগ্য তাঁহাদেরও হয় নাই; তাঁহারা প্রধানত দাসী ও দাস রাজ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন। এ যুগের শিক্ষিত মায়েরা ছেলেদের জুজুবুড়ির ভয় দেখাইয়া থাবড়াইয়া-থুবড়াইয়া না রাখিয়া হয়তো দেশ-বিদেশের রূপকথার রাজ্যে লইয়া যান, নানাভাবে মনের খোরাক জোগাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করিয়া তোলেন। আমাদের কালে নির্ভর ছিল ওই রামায়ণ আর মহাভারত। এই দুইটিই প্রধান। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্কলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' ও 'শিশু' অতি মনোরম ফাউ। আমার যখন ঠিক সাত বছর বয়স, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ঠাকুরমার ঝুলি' হাতে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বাংলার শিশুরাজ্যে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই অপরূপ দানের সহিত অনেক বিলম্বে অর্থাৎ সেয়ানাবয়সে আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল।

দুইটি স্বাভাবিক ধারার সাহায্যে সকল যুগের শিশুরাই ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠে। এক ধারা পাঠ্য পুস্তকের, অন্য ধারা অ-পাঠ্যের। সেকালের অনেক কড়া নীতিবাগীশ বাড়িতে প্রথমটিই প্রবাহিত হইত, বুদ্ধিমান ছেলের নিজের চেষ্টায় দ্বিতীয় ধারা বজায় থাকিলেও শুষ্ক মরুভূমির তলদেশে তাহা হইত ফল্গুধারা। আমাদের বাড়িতে বাবা একমাত্র প্রথম ধারাটিরই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সাহিত্যিক বড়দার কৃপায় দ্বিতীয় ধারাটি একেবারে মরু-বালুতলে বিলীন হইয়া যায় নাই। বাবাকে খুশি করিবার জন্য ধাপে ধাপে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় পার হইয়া

এক দিকে যখন চরিতাবলী ও আখ্যানমঞ্জরীতে হাত দিয়াছি, অন্য দিকে তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তিন ভাগ শিশুশিক্ষার কাব্যাংশ আয়ত্ত করিয়া যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের তিন ভাগ পদ্যপাঠ মুখস্থ করা চলিতেছে। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তিন ভাগও আয়ত্তের মধ্যে। দ্বিতীয় অর্থাৎ অ-পাঠ্য-ধারায় রামায়ণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন স্বাধিকারে কাশীরাম দাসের মহাভারত হস্তগত করিলাম, তখন আর একটি কারণে মহাভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পাঠ্য-অপাঠ্যের সীমারেখার ঠিক মাঝখানের একখানি পুরাতন ছেঁড়া পুস্তক হাতে আসিয়াছিল—তুলোট কাগজের মতন কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা, ফাঁপাফোলা পিচবোর্ডের মলাট। অতি চমৎকার খোদাই-চিত্র সমন্বিত। অন্তত সেই কালে চমৎকার মনে হইত। বইটির নাম 'শিশুবোধক'। ইহাতে অক্ষর পরিচয় বানান শতকিয়া কড়াকিয়া সইয়া দেড়িয়া পত্র লিখিবার ধারা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার বন্দনা গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন প্রহ্লাদ-চরিত্রে হিরণ্যকশিপুবধ চাণক্য শ্লোক পর্যন্ত অনেক কিছুই ছিল। পড়িতে খুবই ভাল লাগিত, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইতাম "দাতাকর্ণ বা কর্ণের দান পরীক্ষা" কাহিনী পড়িয়া। এই বিচিত্র বইখানি সম্বন্ধে পরবর্তী কালে বিস্তর গবেষণা করিয়া ইহার জন্মকাল নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে ইহা যে দুই শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি রেভারেণ্ড জে. লং-সঙ্কলিত বাংলা পুস্তক-তালিকা হইতে।* এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কাহার রচনা বা সঙ্কলন তাহাও

---

* লং-এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (১৮৫৫), ২৩৫ সংখ্যক বই 'শিশুবোধক,' বর্ণনা এইরূপ—"Child's Instructor, 1854, pp. 81, 2 as...This work, the Lindley Murray of Bengali, has passed through innumerable editions,...This book has been for centuries the key to

জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, এই "দাতাকর্ণ" কাহিনী পড়িয়া কর্ণকে আরও ভাল করিয়া জানিবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, মহাভারতে তাঁহার কথা আছে। মহাভারত পুরস্কার পাইয়াই কর্ণের রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত হইলাম।

কিন্তু 'শিশুবোধকে' দ্বিজ কবিচন্দ্র-রচিত বৃষকেতু উপাখ্যানে যে মহাবীর সর্বত্যাগী কর্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, কাশীরাম দাসের বৃহৎ মহাভারতে তাঁহাকে পাইলাম না। তৎপরিবর্তে বীর ধনঞ্জয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল। কবিচন্দ্রের পদ্মাবতী স্বামী কর্ণকে বলিতেছেন :—

"কান্দিয়া কান্দিয়া কয় শুন কর্ণ মহাশয়
পাষাণে বেন্ধেছ তুমি হিয়া।
করিলে দারুণ পণ কাটি দিলে বাছাধন
কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া ॥
দশমাস দশদিন উদর হইল ক্ষীণ
যতন করিনু এই হেতু।
ভাল মন্দ না জানিল বাছা মোর ছাড়ি গেল
আরে মোর প্রাণ বৃষকেতু ॥
পাইয়া অনেক দুখ দেখিয়া পুত্রের মুখ
কেন বিধি করিলে এমন।
রাণী বলে আহা মরি ফুকারে কান্দিতে নারি
শুন শুন প্রভু নারায়ণ ॥
পুত্রমাথা হাতে করে দু' নয়নে বারি ঝরে
আনি দিল দ্বিজ বিদ্যমানে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ধন্য কর্ণ মহাশয়
দানশীল বিখ্যাত ভুবনে ॥"

Bengali reading." বইখানির এখনও যথেষ্ট প্রচার আছে। বটতলার বহু দোকানেই বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক বিভিন্ন লেখকের নামে এই একই 'শিশুবোধক' বিক্রয় করা হয়। মূল 'শিশুবোধকে'র উপর কোনও কোনও সংস্করণে একটি আধটি কবিতা সংযোজিত দেখা যায়।

নারায়ণ স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দাতা নামে খ্যাত কর্ণের গৃহে অতিথি হইয়া মনুষ্যমাংস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং নির্দেশ দিয়াছেন, কর্ণ ও রাণী পদ্মাবতীর একমাত্র পুত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক

"বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন।
তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন ॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে কাটিয়া করাতে।
রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে ॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর।
এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর ॥"

মহাবীর কর্ণ রোরুদ্যমানা পত্নীকে বুঝাইয়া তাহাই করিলেন। নারায়ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃষকেতুকে ফিরাইয়া দিলেন। পৃথিবীতে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন যে কর্ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতে তিনি অনেক হীনবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন। মহাভারতখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া কর্ণের কারণে খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু শিশুমনে বিষাদ-যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাহা ছাড়া তাহারা একনিষ্ঠার জন্যও বিখ্যাত নহে। অচিরাৎ এই মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে আমার দ্বিতীয় মনের মানুষ মহাবীর ফাল্গুনী বাহির হইয়া আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় বিপ্রগণের উক্তি মনে গাঁথিয়া গেল—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখি চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তচ্ছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য ধরে কোথা কে কামিনী॥"

আমি কামিনী না হইয়াও গভীর প্রেমে পড়িয়া গেলাম। বিরাট-পর্বের গোধন-হরণ অধ্যায়ে যখন বিস্মিত কৌরবদের দৃষ্টিতে কুরুসৈন্যের বিপুলতায় ভীত ও পলাতক যুবরাজ উত্তরের পশ্চাতে ধাবমান বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে দেখিলাম

"পাছে ধায় রড়ে দীর্ঘ বেণী নড়ে
পৃষ্ঠোপরি শোভে চারু।
লোহিত বসন অঙ্গে বিভূষণ
যেন করিবর-উরু॥
আজানুলম্বিত অঙ্গদ-মণ্ডিত
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম।
দেখিয়া কৌরব নেহালয়ে সব
মনেতে পাইয়া ভ্রম॥
এক জন আগে পলাইছে বেগে
আর জন পাছে ধায়।
একি বিপরীত না বুঝি চরিত
কেবা যে আগে পলায়॥
পাছুতে যে জন নহে সাধারণ
বেশধারী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে অগ্নি হীনতেজে
সিংহ যেন ধায় মৃগে॥"

তখন আমার শিশুমনের জগৎ সম্পূর্ণ অর্জুনময় হইয়া গেল। দীর্ঘকাল পরে মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" পড়িয়াছি, কর্ণের মহত্ত্ব বারংবার উপলব্ধি করিয়াছি—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মুখে শুনিয়াছি,

তাঁহার মতে কর্ণের তুল্য মহৎ চরিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে আর সৃষ্ট হয় নাই; তথাপি কেন জানি না, আমি অর্জুনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজও পর্যন্ত তিনিই আদর্শ পুরুষ হইয়া আমার মনে বিরাজ করিতেছেন।

মহাভারত ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অতুলনীয় সম্পদ। যাঁহারা মূল মহাভারত অনুবাদেও পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই গল্পটি: দেবতারা একদিন, ওজন করিয়া বেদ মহাভারত প্রভৃতির গুরুত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা দাঁড়িপাল্লা লইয়া এক দিকে চারি বেদ এবং অন্য দিকে ভারত-সংহিতা অর্থাৎ মহাভারতকে স্থাপন করিলেন। ভারত-সংহিতার কাছে চতুর্বেদ অত্যন্ত লঘু প্রমাণিত হইল। আমি যখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক তখন ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশের জন্য বাংলা দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের বাল্যকালে কোন্ কোন্ পুস্তকের প্রভাব তাঁহারা সর্বাধিক অনুভব করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারতকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:

> "বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্ত ভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন-উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বার বার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখিয়া দিতে পারেন নাই, আমাকে মুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে উপনিষৎ ও রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা চিরস্থায়ী হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারত দিয়া যে

বাঙালীর ছেলের বাল্যশিক্ষার পত্তন হয় নাই, সে যে অতিশয় দুর্ভাগ্য তাহাই বুঝাইবার জন্য জগদীশচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

নররক্তের আস্বাদ পাইলে সাধারণ বাঘই মারাত্মক নরখাদক ব্যাঘ্রে পরিণত হয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং 'কথা ও কাহিনী'র গল্পের মধুর আস্বাদ পাইয়া আমিও সাংঘাতিক গল্পখাদক হইয়া উঠিলাম। বই পাইলেই হইল, তাহাতে যদি গল্পের অংশমাত্র থাকিত লোলুপভাবে তাহা নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিতাম, হয়তো প্রয়োজনীয় অংশই তখন ছিবড়া-জ্ঞানে বর্জন করিতাম। যাহা দুর্বোধ্য, যাহা নাগালের বাহিরে, বামনের চাঁদ ধরার মত তাহাও ধরিবার চেষ্টা করিতাম, রুচি ও নীতির দিক দিয়া যে-সব উপন্যাস বা কাহিনীর বালকরাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তাহাও গোপনে সংগ্রহ করিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতাম। স্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম, দৈনিক পাঠ্যপাঠে কখনই অবহেলা করি নাই; কিন্তু সে বয়সে যাহা অবশ্যকর্তব্য ছিল সেই খেলাধূলা-ব্যায়ামচর্চার মূল্যবান সময় চুরি করিয়া সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতির কাজে লাগাইতে লাগিলাম। বামনদের প্রাংশুলভ্য ফল জোগাইবার ভার সেকালে লইয়াছিলেন বটতলা ছাড়া তিনটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান—বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতী। ইঁহাদের উপহার-গ্রন্থাবলী দরিদ্র বাঙালী-মনের বিশুষ্কতা কি পরিমাণে দূর করিয়াছে, তাহার ইতিহাস কোনও দিন সঠিক ভাবে লিখিত হইলে এ যুগের ভাল ছাপাই-বাঁধাই-দামী-কাগজে অভ্যস্ত মানুষেরা বিস্ময় বোধ করিবেন। সস্তা বই, পত্রিকার ফাউ বা উপহারের বই বলিয়া অভিভাবকেরা এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে ততটা সাবধান ছিলেন না, অন্তঃপুরে বইগুলির অবাধ গতিবিধি ছিল। ফলে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতেই এইরূপ বইয়ের এক-আধখানার সন্ধান মিলিত। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত ও বৈষ্ণবমহাজনপদাবলী, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, দাশু রায়ের পাঁচালী এবং রামায়ণ ও মহাভারতের

ভাষা-সংস্করণ ইঁহারা নামমাত্র মূল্যে অবাধে বিতরণ করিয়া এক দিকে যেমন সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে জীর্ণ পুরুষগুলাকে সঞ্জীবিত রাখিতেন, অন্য দিকে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচারে বাংলার অর্ধ বা সিকি শিক্ষিত অন্তঃপুর সুনিদ্রার সুযোগ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাঁহারা সত্যকার চিন্তার খোরাক পাইতেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' 'যুগান্তর' হইতে। নদীপ্রবাহের পাশে পাশে একটি অপেক্ষাকৃত মলিন নালাও কাটা হইয়াছিল, তাহার ধারা সরবরাহ করিতেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায়, এবং পরে দীনেন্দ্রকুমার রায় ও পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি,' বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত,' 'আনন্দমঠ' এবং রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতির সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত' (১৮৮০) ও 'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০) দেশব্যাপী আর এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদী'-কার্যালয়ের উপহার-গ্রন্থাবলী-রূপে যোগেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসও সুলভ হইল।

আমার ভাগ্যে সর্বপ্রথম উঠিল বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর 'রাজসিংহ'-খণ্ড, রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও 'সমাজ' এবং "হিতবাদীর উপহার"—'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' (আগস্ট ১৯০৪)। তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' ও দামোদর-গ্রন্থাবলীর 'সোনার কমল'-খণ্ডও কেমন করিয়া যোগাড় হইয়া গেল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'সতী' 'জড়ভরত' ও 'বেহুলা' সদ্য সদ্য হাতে পাইলাম। এইগুলি সম্বন্ধে বিশদ করিয়া কিছু বলিবার পূর্বে দুইটি তত্ত্বকথা শুনাইতে চাই।

এই যে অতি বাল্যকালে এই সকল কঠিন কঠিন বই আমি পড়িতেছিলাম, কিছু আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলাম কি? শব্দ-

সম্পদ ও ভাষা-সম্পদের কথা অবশ্য প্রথমেই বিবেচ্য। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'পল্লীশ্রী' পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় আমি লিখিয়াছিলাম—

> আমি আবাল্য সময় পাইলেই পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই পড়িতাম, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্বেই বাংলা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা এবং সাময়িক পত্রিকা যে কত পড়িয়াছিলাম, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দামোদর কেহই আমার অনধীত ছিলেন না; একাধিক সহস্র রজনী, ইহার-উহার গুপ্তকথা, বটতলার চটকদার প্রেমের ও রহস্যের উপন্যাস, রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং অসংখ্য তথাকথিত উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া মনে মনে এক অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেখানে অনন্ত কৌতূহল এবং অনন্ত বৈচিত্র্য, আমার উচ্চতর বিজ্ঞান-বুদ্ধিও সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। নির্বিচারে এই সকল কুপাঠ্য-অপাঠ্য পড়িবার ফলে ভাষা ও শব্দ-সম্পদে আমি বাল্যকাল হইতেই সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলাম।

বোঝা-না-বোঝার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবাবদিহি আজ আমারও জবাবদিহি। আমার কথা এমন চমৎকার করিয়া বলিতে পারিব না বলিয়া তাঁহার জবানিতেই এই প্রশ্নের জবাব দিতেছি—

> "নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড় বড় কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমা-খরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না! বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার

> সুখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না-বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট-বাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।"

আমিও এই না-বোঝা পাঠকদের দল ভারী করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ও আনন্দ দুই দিক দিয়াই ফাঁকিতে পড়ি নাই। আজিকার দিনে যাঁহারা একান্তভাবে শিশুদের জন্য সাহিত্য-রচনায় তৎপর তাঁহাদের প্রচেষ্টার সমবেত পরিণাম দেখিয়া সময় সময় ইহাই মনে হয়, এই জ'লো নীতিসঙ্গত গল্প উপন্যাস পরিবেশন করিয়া ইঁহারা ভাল কাজ করেন নাই। কি ক্ষতি হইত বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ খণ্ডিত না করিয়া সম্পূর্ণভাবে শিশুদের পড়িতে দিলে? ইংলণ্ডে রবিন্‌সন ক্রুশো গালিভার্স ট্র্যাভল্‌স-এর পর ছেলেদের জন্য বিশুদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী অনেক রচিত হইয়াছে, কিন্তু কালের দরবারে কোনটিই ওই দুইটির পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ, ডানিয়েল ডিফো বা জোনাথান সুইফটের সাহিত্যবুদ্ধি এপিক বা মহাকাব্যের পর্যায়ের ছিল। ক্যারোল বা স্টিভেন্‌সন গীতিকাব্যের মানদণ্ড বজায় রাখিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারতের পর শিশুদের জন্য কোনও কাহিনীই রচিত হয় নাই; তাহার প্রয়োজনও ছিল না। তাই সেই আশ্রয় ত্যাগ করিলে এখন আমাদের ভুল হইবে। বিদেশী সস্তা অ্যাডভেঞ্চারের অনুকরণে বাংলায় যে-সব গল্প লিখিত হইয়াছে সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়া সেগুলি অক্ষম। তাই শিশু-ভারতীর দরবারে এখানে আবর্জনাই জমা হইয়া চলিয়াছে, শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার মত অর্ঘ্য প্রস্তুত হয় নাই। এই কারণেই আমাদের ছেলেমেয়েদের নীতির অজুহাতে মূল বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ হইতে বঞ্চিত করা আরও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

আমি ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারতের পক্ষপাতী নহি। তাহারা কৃত্তিবাস কাশীদাস মূলে পড়ুক, পরে অনুবাদে হউক, মূলেই হউক বাল্মীকি ও বেদব্যাসের দ্বারস্থ হউক, গোড়ায় বা মাঝখানে অন্য কোনও দালাল বা এজেন্টের সাহায্য লইবার দুর্ভাগ্য যেন তাহাদের না হয়।

কথা শোনা বা প্রস্তুতির কাল যদিও জীবন-ভোরই চলিতেছে, তথাপি প্রথম পরিষ্কার কথা বলার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রস্তুতির কাল ধরিয়াছি। চোখে গোগ্রাসে কথা গিলিতেছিলাম, কানে শুনিবার ধৈর্য ছিল না। স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া মাঠে খেলিতে যাইবার অছিলায় বাহির হইয়া যাইতাম এবং প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ির খোলা ছাদে আলিসা আড়াল দিয়া বই পড়িতে বসিতাম। আলো যত স্তিমিত হইয়া আসিত ততই সরিয়া সরিয়া আলোর দিকে আগাইতে থাকিতাম। জ্বালা করিয়া চোখে জল আসিত—সে বাদশাজাদী জেব-উন্নিসার দুঃখে, না, দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিতাম না; বই বা গল্প যতক্ষণ শেষ না হইত, ততক্ষণ মনের জ্বালা যাইত না। এই ভাবে কথা শোনার কাজে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় বাবা মালদহ হইতে পাবনায় বদলি হইলেন। অব্যবহিত পূর্বে অতিরিক্ত পালোয়ানির মূল্যস্বরূপ মেজদাদা মালদহেই দেহরক্ষা করিলেন। মা ও আমাদের তিন ভাই তিন বোনকে বাবা রাইপুর হইয়া মাতুলালয় বেতালবনে লইয়া গেলেন। বাবার পূজার ছুটি ফুরাইলে দাদা ও আমি তাঁহার সঙ্গেই মালদহে ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে খবর আসিল, আমার কনিষ্ঠা কমলা মানকরে ছোট মামার বাড়িতে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাবা আবার আমাদের দুই জনকে ন'মামার কর্মস্থল বাঁকুড়ায় পৌঁছাইয়া দিলেন। মানকর হইতে মা আমার অবশিষ্ট দুই বোন ও ছোট ভাইকে লইয়া আগেই সেখানে পৌঁছিয়াছেন। মাকে দেখিলাম। আর চেনা যায় না। পর পর দুইটি ধাক্কা তিনি সহিতে

পারিলেন না, মূর্ছাব্যাধি ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিল। আগুনে পুড়িবার ও জলে ডুবিবার ভয়ে সামাল সামাল পড়িয়া গেল। বাবা এই অবস্থায় চাকরির খাতিরে পাবনা চলিয়া গেলেন। মাকে লইয়া আমরা মামার বাড়িতেই বড় দাদার অভিভাবকত্বে রহিয়া গেলাম। এখানে স্কুলের বালাই ছিল না, আমার মামাতো বউদি ছিলেন বাংলা সস্তা উপন্যাসের ঘুণ, তাঁহাকে পান দোক্তা জোগাইয়া এবং বিন্তি-খেলায় সঙ্গ দিয়া আমারও কথা শোনার পালা অব্যাহত রহিল। ছয় মাসের মধ্যেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবা আসিয়া আমাদিগকে পাবনায় লইয়া গেলেন। নদীগত ভাবে এই বারংবার স্থান-পরিবর্তন ও বহিঃপ্রকৃতির কথা শোনার ইতিহাস এইরূপ :

সে গানের রেশ টানি এল শীর্ণ অজয়ের তীরে
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোট গ্রামখানি,
পূর্বপুরুষের ভিটা ; গিরিনদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া ওঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল।
এঁলোমেলো কত গান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নান্নুর গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের মায়া আবার ঘনায়ে এল নভে।
গুচ্ছে গুচ্ছে থরে থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল,
শীর্ণ হ'ল জলধারা, বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

বালুচরে পদচিহ্ন মুছে গেছে ; সে কিশোর কবি
দেখা দিল, হুড়ি ছুঁয়ে যেথা ধীরে বহে গন্ধেশ্বরী,
পৌষ-সংক্রান্তির উষা, মেশে আসি দ্বারকা-ঈশ্বরে।
দূরে আকাশের গায় কালোছায়া বৃদ্ধ শুশুনিয়া—
কিশোর কবির মনে ঘনাইল পাহাড়ের মায়া,
শাল ও পলাশবন, ধু-ধু মাঠ দিগন্তপ্রসারী।

নেশা না কাটিতে তার, বসন্তের সায়াহ্নে একদা
বিশাল পদ্মার তীরে এল যেথা কাঁপে ঝাউবন ;

সুপক্ক কুলের লোভে গুটি গুটি খরগোশ-দল
চমকিয়া পদশব্দে ছোটে দীর্ঘ কান খাড়া করি।
সেখানে পাড়ের গায়ে, ক্ষণে ধ'সে-পড়া খাড়া পাড়—
গর্তে গর্তে উঁকি মারে লাল-ঠোঁট পাখিদের ছানা;
ইলিশ ধরার নৌকা সার বাঁধি চলে জাল ফেলে,
বহুদূরগামী যত স্টীমারেরা যায় ধোঁয়া ছেড়ে,
পাশে পাশে উড়ে চলে জলচর পাখি সারি সারি।

—"তমসা-জাহ্নবী," 'রাজহংস'

ঘরের ও বাহিরের, মানুষের ও প্রকৃতির কথা মন দিয়া শুনিতে লাগিলাম। বাংলার সাহিত্যগগনে তখন শরৎচন্দ্র পূর্ণ গরিমায় প্রকাশ পাইবার জন্য পূর্ব দিগন্ত হইতে সবে উঁকি দিয়াছেন।

চতুর্থ তরঙ্গ

প্রস্তুতি (২)

মায়ের মুখে শোনা কাহিনী এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের কথা বাদ দিলে ছাপার অক্ষরে প্রথম কোন্ গল্প আমার শিশুমনকে আলোড়িত ও অস্ফুট কল্পনাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল—দুস্তর স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহারই সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই আমার ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন শৈশবের স্বচ্ছ নির্ঝর-ধারা আজিকার বাত্যাহত তরঙ্গক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল আবিল জলস্রোত হইতে বহু দূরে পিছনে পড়িয়া আছে। কালের বিপুল ব্যবধানে প্রায় সকল ছাপার অক্ষরই সেই নির্ঝর-ধারার স্নিগ্ধচপল নৃত্যপ্রবাহে উপলখণ্ডের মত হারাইয়া গিয়াছে। হাতড়াইতে হাতড়াইতে অকস্মাৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছবি ও গল্প' আমার বিলীয়মান স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। ভুলিয়া গিয়াছিলাম এই 'ছবি ও গল্পে'-সঙ্কলিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটিই আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রথম উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, গ্রীষ্মাবকাশের দ্বিপ্রহরে একদিন এই মহার্ঘ রত্ন-সম্বলিত বইখানি সংগ্রহ করিতে গিয়াই দাদাকে আহত করিয়া মায়ের কান্নার কারণ হইয়াছিলাম। বইখানির নাম স্মরণে উদিত হওয়া মাত্রই আমার অস্ফুট শৈশবকালকে ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া পাইলাম, বিচিত্র-চিত্রশোভিত সেই 'ছবি ও গল্পে'র পাতায় পাতায় আবার সেই শিশুমনের অনন্ত কৌতূহল ও অসীম আগ্রহ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল—"আমাদের গোবর্ধন, ওরফে গোব্‌রা"র "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ", সহৃদয় "কেনারামে"র অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ, বুদ্ধিমান "রামধনে"র মুক্তিলাভ এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া পাড়ার বকাটে ছেলেদের সেই ছড়া—

"বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধ'রে রেখো।"

এবং সর্বোপরি চারি ভাগে বিভক্ত চার পরিচ্ছেদের বড় গল্প "জয়-পরাজয়ে" (আমার জীবনের প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস) নানা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া গল্পের নায়ক মোহনলালের শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানলাভ—"দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত।" এই চারিটি গল্পের সাহায্যেই বাংলা ছোট ও বড় গল্পের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়। এই চারিটির মধ্যেই ভৌতিক, আধি-ভৌতিক, লৌকিক, পারমার্থিক, অদ্ভুত, আজগুবি, হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক, গম্ভীর—এমন কি, আজকাল-বহুলব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক রসের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম। শুধু অধিকাংশ বাংলা গল্পের যাহা প্রাণ—সেই নারীপুরুষ-ঘটিত প্রেম বা যৌন আবেদনের কোনও সন্ধান এইগুলিতে মিলে নাই। পূর্বে 'বর্ণপরিচয়' 'কথামালা' প্রভৃতিতে অনেক গল্প পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলির কোনটিতেই মনে গল্প-রসের সঞ্চার হয় নাই, বানান এবং অর্থের গহনে গল্পের মাধুর্য ও আকর্ষণ হারাইয়া গিয়াছিল। এই প্রথম ছাপার অক্ষরে এমন একটি বস্তুর খোঁজ পাইলাম যাহা পাঠ্য পুস্তকে ছিল না, যাহা কাব্য না হইয়াও বাস্তব লোক হইতে কল্পনার অবাস্তব রাজ্যে আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। "জয়-পরাজয়" ছোট হইলেও আজিকার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিতেছি, ইহাতে উপন্যাসের বাঁধন অতি চমৎকার; বাঙালী ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনার সমষ্টি হইলেও ইহা সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখে, ইহার উদ্দেশ্য—অন্যায়ের সহিত সংগ্রামে ন্যায়ের জয়লাভ—অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠ্য পুস্তকের গল্পের যাহা দোষ পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া "মরাল" প্রকট করিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে বাড়ি বগুলায় মায়ের কাছে যাইবার কালে নায়ক স্বপ্নে চিরশত্রু নেপালের সহিত

সংঘর্ষে আহত ও মূর্ছিত হইয়া যখন "বগুলা, বগুলা" শব্দ শুনিয়া আত্মস্থ হইল, তাহার তখনকার সেই অচেতন-বিহ্বলতা আমি আজও পর্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি; পূর্ববঙ্গ রেলপথে বগুলা স্টেশনটি যতবার পারাপার করিয়াছি ততবারই এক জাগ্রত জীবন্ত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়াছে। এই স্বপ্নদর্শন অধ্যায়ের প্রভাব পরবর্তী সাহিত্য-সাধনায় বহুবার অনুভব করিয়াছি। আমার প্রথম গল্পও এই স্বপ্নদর্শনমূলক—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জিলা-স্কুলের হস্তলিখিত পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। পরে আমার বহু গল্পে বাস্তবের সহিত স্বপ্ন জড়াইয়া গিয়াছে। 'মধু ও হুল' ও 'কলিকালে' অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আমার—তথা সেকালের ছেলেমেয়েদের ঋণের পরিমাণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার ছানা পাকাইয়া গোল্লা প্রস্তুত করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহা রসে ফেলিয়া রসগোল্লা করিয়া ছাড়িলেন; প্রথম দল পাঠ্য পুস্তকেই ভিয়ানের সূত্রপাত করিয়া বিদায় লইলেন, দ্বিতীয় দল তাহারই ক্রমপরিণতিতে অপাঠ্য পুস্তকে রসের সঞ্চার করিলেন। মাঝখানে ভাষা ভাব ও বিষয়বস্তুর যোগান দিয়া মনস্বী রাজেন্দ্রলাল, আলালী প্যারীচাঁদ ও হুতোমী কালীপ্রসন্ন যোগাযোগ বজায় রাখিলেন। 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে'র কৃষ্ণকমল ও 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূদেবকেও এই যোগাযোগের দলে ফেলিতে পারি। শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে এই ক্রমপরিণতির ধারায় অভ্যস্ত হইতে হইতে অকস্মাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আসিয়া যে বিস্ময়ের সম্মুখীন হইলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র বঙ্কিম ও 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথ সেই বিস্ময়কেই স্থায়ী আনন্দে পরিণত করিলেন। এই গেল মূল ধারা। শিশু-ধারায় রস-ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সদর-দরজা দিয়া রসের এই দুই ধারা ছাড়া জঙ্গল-ডোবা-আঁস্তাকুড়-লাঞ্ছিত

খিড়কি-পথেও বহু সাহিত্যসেবী বিশুদ্ধ ও নিষিদ্ধ রসের সংমিশ্রিত ধারা প্রবাহিত করিলেন। শিক্ষিত বাঙালী তাঁহাদিগকে সরাসরি গ্রহণ করেন নাই। সেকালের রুচিবাগীশদের বিচারে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও গোড়ায় এই শেষের দলে পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে বলিতেছি। আপাতত, যোগীন্দ্রনাথ আমাকে রসরাজ্যের যে নমুনা দিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

অব্যবহিত পরেই যে উপন্যাস আমাকে কল্পনারাজ্যের ঠিক মধ্যগগনে উড়াইয়া লইয়া গেল তাহা হইতেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র বর্ধিত সংস্করণ। ছোট 'রাজসিংহ' পরে পড়িয়াছি; বড়র কল্পনা-বিলাস ও বর্ণনা-নৈপুণ্য তাহাতে নাই। "চতুর্থ সংস্করণের [১৮৯৩] বিজ্ঞাপনে"র উক্তি "এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম" তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম কিনা মনে নাই; কিন্তু 'রাজসিংহে'র কাহিনীকে সত্য বিবেচনা করিয়া হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিগৌরব অনুভব করিয়াছিলাম স্মরণ আছে। বইখানিতে অসংখ্য চরিত্র, মহৎ চরিত্রেরও অভাব নাই। কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল দস্যু মাণিকলালকে। মহারাণা রাজসিংহের হস্তে ধৃত হইয়া সে ভবিষ্যতে দস্যুতা পরিহারের শপথ করিয়া পূর্বপাপের শাস্তি নিজ হাতে যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহাতে আমার বালক-চিত্ত বিমোহিত হইয়া গেল:

> "এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, 'মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।'
>
> রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, 'ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?'

দস্যু বলিল, 'এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুত-কুলের কলঙ্ক।' "

এই রাজপুতকুলকলঙ্ক অধম মাণিকলালকে শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিলাম। সে যখন রূপনগরের পানওয়ালীর সহায়তায় মোগল-সৈনিক প্রেমিক নুর মহম্মদ খাঁকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করিয়া তাহারই পোশাক ও হাতিয়ারে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিল এবং যথাকালে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোগল-রক্ষীরূপে দুর্গম পর্বতের রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল, তখন নিতান্ত বালক হইলেও আমিও তাহার সঙ্গে ছিলাম; রন্ধ্রমধ্যে রাজকুমারীর শিবিকা নিরাপদে রাখিয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগর-গড় হইতে কৌশলে সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই রন্ধ্রমুখে ফিরিলাম। "পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল।"—স্ত্রীলাভ। চঞ্চলকুমারী সখী নির্মলকুমারীকে তাঁহার সঙ্গে দিল্লী লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, নির্মলকুমারী একাই দিল্লী চলিয়াছিল। মাণিকলালের সহিত তাহার এই আকস্মিক সাক্ষাতের এবং ব্লিৎজ্‌ক্রিগ-বিবাহের অনুরূপ রোমান্টিক ঘটনা আমি আর কখনও কোথাও পড়ি নাই। অসহায় বাঙালী-মনের অ্যাডভেঞ্চার-পিপাসা এই মাণিকলাল অনেকখানি প্রশমিত করিয়াছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মোগল-আমলের খণ্ডকালের ইতিহাস ও চিরন্তন মানব-মনের ইতিহাসকে জড়াইয়া যে দ্রুততালের কাহিনী রচনা করিয়াছেন, নিয়তির অমোঘ নিয়মে আতরওয়ালী দরিয়া ও বাদশাজাদী জেব-উন্নিসা উভয়কেই এক টানে যে শোচনীয় পরিণামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মুনশীয়ানা কতটুকু, সে বিচার করিবার শক্তি বালকের ছিল না। তবু সে মুগ্ধ-পুলকিত হইয়াছিল এই কারণে যে, সামান্য এক রাজপুত-ভূস্বামীর সুন্দরী কন্যার অবিমৃষ্যতাপ্রসূত অভিমান বা

অহঙ্কারকে সম্মান করিবার জন্য মহারাণা রাজসিংহ সর্বস্ব পণ করিয়া প্রবল প্রতাপশালী মোগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধেও সমরাভিযান করিতে ইতস্তত করেন নাই, স্বজাতীয় নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সৈন্যসামন্তপরিজন সহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার বীরত্বের এবং স্বাজাত্যবোধের দিকটা আমাকে মোহিত করিয়াছিল। যুগে যুগে সর্বত্র লাঞ্ছিত কলঙ্কিত ভারত-ইতিহাসের মধ্যে এই যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে নিঃশঙ্ক ও আত্মস্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহার আবেদন অন্তত আমার কাছে বিফল হয় নাই। তাই 'রাজসিংহে'র মহিমা আজও অটল হইয়া আমার মনে বিরাজ করিতেছে। পরবর্তী জীবনে বহু গল্প-উপন্যাসে মহৎ ত্যাগের বহু আদর্শকে জয়যুক্ত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু 'রাজসিংহে'র আদর্শ তুলনায় ম্লান না হইয়া দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্বগামী হইলেও আমি উক্ত আন্দোলনের চরমতম সংঘাতের মধ্যে উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছিলাম। আমার মনে মোগলে এবং ইংরেজে একাকার হইয়া গিয়াছিল, স্বদেশী-যজ্ঞের হোতারা রাজসিংহ-মাণিকলালের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

রাজধানী দিল্লীর আম-দরবারের অত্যুত্তপ্ত সামরিক পরিবেশ এবং খাস অন্তঃপুরের প্রেমবিলাসের বিষাক্ত জটিল আবহাওয়া হইতে সেদিনের সেই বিস্মিত উদ্‌ভ্রান্ত বালককে উদ্ধার করিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ 'রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন "প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বসুমতী অফিস।" এক খণ্ড কি করিয়া হস্তগত হইল আজ মনে নাই, কিন্তু সেই জীর্ণ গ্রন্থাবলীখানি আজিও আমার অধিকারে আছে। ৬৫৮ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ বই—'বঙ্গবিজেতা,' 'মাধবীকঙ্কণ,' 'জীবন-প্রভাত,' 'জীবন-সন্ধ্যা' পড়া হইয়া গেল। সেই উত্তাপ,

সেই সংঘর্ষ, সেই কুটিল-জটিল চক্রান্ত—রাজধানী আর পার্বত্য সমরক্ষেত্র। বিষণ্ণ কম্পিত চিত্তে 'সংসারে' আসিয়া প্রবেশ করিলাম। সর্বাঙ্গ, শুধু সর্বাঙ্গ কেন, দেহ ও মন একসঙ্গে জুড়াইয়া গেল। এক নিমেষে প্রজ্বলন্ত মার্তণ্ডলোক হইতে জ্যোৎস্নাশীতল চন্দ্রলোকে অবতীর্ণ হইলাম। কোথায় দিল্লী রাজপুতানা আরাবল্লী সিতারা, আর কোথায় বর্ধমান জেলার কাটোয়াগামী রাস্তার উপর ক্ষুদ্র তালপুকুর গ্রাম! কোথায় জেবউন্নিসা-মহাশ্বেতা আর কোথায়ই বা বিন্দুবাসিনী-সুধাহাসিনী! বাংলার গ্রামের যে চিত্র দেখিলাম, যদিও বাংলা দেশের মানচিত্র হইতে আজ একে একে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছে, তথাপি তালপুকুরের স্মৃতি আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। দেশপ্রেমিক সহৃদয় কবি রমেশচন্দ্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইলেন—আমি দেখিলাম :—

> "তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারি দিকের ক্ষেত্রে চাষ দিয়াছে। গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই একজন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ি হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারি দিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারি দিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মনসা প্রভৃতি কাঁটাগাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্যপথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটগাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে,

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায়ে নীরব হইয়া রহিয়াছে। কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।”

বাংলার পতনোন্মুখ গ্রামাঞ্চলে এই দৃশ্য হয়তো আজিও অপ্রতুল নয়। কিন্তু ইহার পরেই রমেশচন্দ্র অতি সাধারণ দরিদ্রের যে কুটীরের ছবি আঁকিয়াছেন, কালের করাল কবলে পড়িয়া তাহা বিধ্বস্তপ্রায় হইতেছে। আমার মনে সেই আদর্শ-ছবি এখনও জ্বলজ্বল করিতেছে—

“সেই তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারি দিকে বাঁশঝাড় ও আমকাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটি ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫।৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর-বাড়ির উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটি মাচানের উপর লাউগাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটি রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটি গোয়ালঘরে একটি মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ির লোকদের খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই একখানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটি তক্তপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে।...”

আমাদের একান্ত পরিচিত পরিবেশে আমাদেরই আত্মীয়-পরিজনকে অবলম্বন করিয়া যে উপন্যাস লেখা যায় সেই প্রথম অনুভব করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ‘সংসার’ ও ‘সমাজে’ একটা অতি মনোরম হৃদয়গ্রাহী স্নিগ্ধতা ও শান্তি যেন ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। আমার বালক-মনও তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হইল। সামাজিক যে গুরুতর সমস্যার অত্যন্ত সহজ সমাধান রমেশচন্দ্র করিয়া দিলেন, পুনর্বিবাহিতা বিধবাকে সুখী করিয়া ছাড়িলেন—সেই সব কৃতিত্ব তলাইয়া বুঝিবার বয়স তখন আমার হয় নাই, তথাপি

ভাল লাগিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনীকে বধ করিবার জন্য চারি দিকে আটঘাট বাঁধিয়া ঘোরালো আয়োজন করিয়াছিলেন, সুধাহাসিনীকে রক্ষা করিবার জন্য রমেশচন্দ্র কোনই উত্তেজনা প্রকাশ করেন নাই, অতি নীরবে সন্দেহাতীত ভাবে কাজ সারিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয় সমাধানের কৃতিত্ব পরে অনুধাবন করিয়াছি। এ যুগেও যাঁহারা রমেশচন্দ্রের 'সংসার' 'সমাজ' অনধীত রাখিয়াছেন তাঁহারা যে অত্যন্ত ঠকিয়াছেন—তাহাই বুঝাইবার জন্য বালক-আমির এই প্রিয় বই দুইখানির উল্লেখ করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এবং রমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক নির্মল হাস্য অতি বাল্যকালেই আমাকে সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' তখনও পড়ি নাই, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সহিত পরিচয় হয় নাই। সেই নির্মল অথচ নিষ্করুণ হাসি পরে আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু 'সংসার'-'সমাজে'র শান্ত সুশীতল পরিবেশে পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্বেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' হাতে পাইলাম। বাংলার নাট্যমঞ্চ—আরও খুলিয়া বলিতে গেলে রসরাজ অমৃতলালের 'সরলা' নাটক 'স্বর্ণলতা'র প্রথমার্ধের বিষয়বস্তুকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, কিন্তু আজকাল পাঠ্যপাঠের বাধ্যতা ছাড়া 'স্বর্ণলতা' পঠিত হয় না। তবে প্রকাশের যুগে ইহা যে আলোড়ন তুলিয়াছিল তাহার জোরেই তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা'র নাম বাংলার সাহিত্য-সমাজে অত্যন্ত পরিচিত হইয়া আছে। আমি যখন ইহা সাগ্রহে গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম, তখন গদাধরচন্দ্রের "ডুচও খাই টামাকও-খাই" ও "ঐ চরলে ডিডি" রঙ্গমঞ্চের কৃপায় প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়াছে। নীলকমলের "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে" পথের ইয়ার-ছোকরারাও গাহিয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবত 'স্বর্ণলতা'র করুণ অশ্রুসজল দিকটি অর্থাৎ মূল কাহিনীটি আমাকে ততটা অভিভূত করে নাই, যতটা করিয়াছিল নীলকমলের মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত ও

গদাধরচন্দ্রের উচ্চারণবিকৃতিজনিত হাস্যকর পরিবেশ। বিধুভূষণ ও সরলার বিয়োগান্ত কাহিনী অথবা গোপাল-স্বর্ণলতার মিলনান্ত প্রেমকাহিনী কোনও দিনই আমার মনের উপর চাপিয়া বসে নাই, গল্পপিপাসু এবং হাস্যরসপ্রিয় আমার মনে চিরজীবী হইয়া আছে নীলকমল ও গদাধরচন্দ্র। যাঁহারা 'স্বর্ণলতা' পড়িয়াছেন তাঁহারা নীলকমলের "বাছা হনুমান" চিত্রটি নিশ্চয়ই ভুলেন নাই।—অনাবিল হাস্যরসের নিদর্শনরূপে 'স্বর্ণলতা'র এই দুইটি চরিত্র দীর্ঘ আশি বৎসর আমাদিগকে শুধু আনন্দ দেয় নাই, আমাদের সাহিত্যিক সমাজকে অনুপ্রাণিতও করিয়াছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে বলিয়াই হয়তো আমরা ইহাকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ঠেলিয়া দিয়াছি, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রথম সামাজিক উপন্যাস হিসাবে ইহার মূল্য অব্যাহত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র ইহা প্রায় সমসাময়িক। ইহার প্রথমার্ধ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ১২৭৯ সালের আশ্বিন হইতে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত বাহির হয়; 'বিষবৃক্ষ' বাহির হয় 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-ফাল্গুনে। 'স্বর্ণলতা'র পুস্তকাকারে প্রকাশের কাল ১৮৭৪ এপ্রিল, 'বিষবৃক্ষে'র ১৮৭৩ জুন। যে বড় গল্প আমাকে প্রথম উপন্যাসের আস্বাদ দেয়, 'স্বর্ণলতা' নীতির দিক দিয়া সেই "জয়-পরাজয়ে"রই বৃহৎ সংস্করণ; ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় যে পরিণামে অবশ্যম্ভাবী, স্বর্ণলতার প্রতিপাদ্যও তাহাই।

বাংলা-সাহিত্যের তৎকাল-প্রচলিত যে যে জারক রসে আমার বালক-মন জীর্ণ হইয়া সাহিত্য-ভোজে আপনাকে নিবেদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, নাম করিয়া করিয়া তাহার প্রধানগুলির উল্লেখ করিলাম। গল্পের বিচিত্র ও অনন্ত প্রবাহ তো বহিয়া চলিয়াছিলই। সেই প্রবাহের কোনটি স্বচ্ছ, কোনটি আবিল কর্দমাক্ত, কোনটি শান্ত, কোনটি আবর্তসঙ্কুল উত্তেজক। গ্রন্থ এবং

উপহার-গ্রন্থাবলী পড়িয়াই চলিয়াছিলাম। মাসিক-পত্রিকার গহনে তখনও ঢুকি নাই, বাড়িতে তাহার আমদানিও ছিল না। বীরভূমের একজন অধিবাসী হিসাবে বাবা আমার জন্মকালে নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বীরভূমি' নামক একটি ক্ষীণকায় মাসিক-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, অনেক পরে তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। যে সাময়িক-পত্র সর্বপ্রথম আমার আয়ত্তে আসে বলিয়া আমার স্মরণ আছে—তাহার নাম 'সাধনা,' সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই খণ্ডে বাঁধানো তৃতীয় বর্ষ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। মালদহের ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীর কোন্ গৃহস্থ-গৃহে আমার সাধনার বীজ লুক্কায়িত বা সংগৃহীত ছিল সে খবর হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই 'সাধনা'র বাঁধানো খণ্ড দুইটি দীর্ঘ তেতাল্লিশ বর্ষকাল সযত্নে বহন করিয়া ফিরিতেছি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'হিতবাদী'র উপহার-গ্রন্থাবলী মারফৎ আমার অতি পরিচিত। সেই বিরাট গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ দখলে না আসিলেও 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট,' 'রাজর্ষি' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' পড়িয়া ফেলিয়াছি, গল্পগুলিও চাখিয়া চাখিয়া দেখিতেছি। ১৩০০ সালের বাঁধানো 'সাধনা'র প্রথম খণ্ডে (আষাঢ়, ১৩০০) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অসম্ভব কথা" আমার নিরঙ্কুশ গল্প-গলাধঃকরণকে চিন্তাকণ্টকিত করিয়া তুলিল। এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছিলাম, "এক যে ছিল রাজা।" এই নিছক গল্প শোনার সমর্থন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বালকটির মনে কঠিন প্রশ্ন জাগাইয়া দিলেন, কে ছিল সে রাজা, কোথাকার রাজা, কবে তিনি ছিলেন, তিনি সত্য সত্যই ছিলেন কি না—এই সব অতি সমীচীন প্রশ্ন। এতদিন এই সব প্রশ্ন ছিল অবান্তর, বালকের মনে যুক্তির আবির্ভাব ঘটাতে বিহ্বল অসন্দিগ্ধ বালকই সচেতন তৎপর হইল, বিচারের বীজ বালক-মনে অঙ্কুরিত হইল। এই নবজাগ্রত বুদ্ধি লইয়া, বিচারের নখরদন্ত শানাইয়া মালদহ হইতে বাঁকুড়া হইয়া

পাবনা পৌঁছিলাম। পূর্বেই শরৎচন্দ্রোদয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। পাবনায় প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে সহপাঠী বন্ধু তারাপদ লাহিড়ীর ফরাসপাতা বৈঠকখানায় সে-যুগের বিচিত্র আবিষ্কার ক্যারম-বোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিল এবং পূজার অবকাশে সেইখানেই 'যমুনা' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২০) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' প্রথম কিস্তি পড়িয়া ফেলিলাম। প্রথমটা অভিভূত হইলাম বটে, কিন্তু নবলব্ধ বিচারবুদ্ধির জোরে ভাসিয়া গেলাম না।

পঞ্চম তরঙ্গ

উপোদ্ঘাত—কাকলি

প্রস্তুতির কাল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, কারণ সজীব মানুষ প্রতিদিবসের ভাণ্ডার হইতেই তাহার আহার্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে, চাল-ডাল-নুন-তেলের ভাণ্ডার রুদ্ধ হইলেও আলো-বাতাস-জলের ভাণ্ডার খোলাই থাকে; বাস্তব জীবন যখন রসদ সরবরাহ বন্ধ করে, শিল্পী তখন কল্পনা-জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কল্পনা-জীবনের প্রধান উপকরণ আদিমতম কাল হইতে এখন পর্যন্ত রচিত বইগুলি। এই বই সেই অস্ফুট শৈশব হইতে আজও আমার মনের রসের জোগান দিয়া চলিয়াছে। সুতরাং বইয়ের সাহায্যে প্রস্তুতি আর কোনও সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে ফেলিতে পারিব না, আমার জীবনের অন্যান্য কর্মসাধনার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ইহা চলিয়া আসিয়াছে।

'যমুনা'য় মাসে মাসে প্রকাশিত 'চরিত্রহীনে'র অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে সর্বপ্রথম এক দেহাশ্রিত অনুভূতি আমার মনকে নাড়া দিল। এই অনুভূতি অতিশয় তীব্র, কিশোর-মনের পক্ষে ক্ষতিকর। রামায়ণ-মহাভারতে বহু কাহিনী পূর্বেই পড়িয়াছিলাম, যেগুলি আজকাল অশ্লীল বলিয়া বর্জিত হয়; রাবণরম্ভা-সংবাদ অথবা অষ্টাবক্রের জন্ম প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। যোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রকাশিত রামায়ণ-মহাভারতে এইগুলি না থাকিলেও রামায়ণ-মহাভারত পাইলেই পড়িতাম এবং অধিকাংশ বাড়িতে বটতলার সংস্করণই পাইতাম। এই গল্পগুলি নিছক গল্প হিসাবেই পড়িয়াছিলাম, ইহারা মনে অন্য কোনও আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আরও বিস্ময়ের কথা, এ যুগের পাঠক হয়তো বিশ্বাসই করিবেন না, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' বাল্যকালেই মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল অথচ "নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া" "খেলে রে সুন্দর সুন্দরী

রঙ্গে" "একদিন দিবাভাগে কবি বিদ্যা-অনুরাগে" প্রভৃতি অংশ মন ও দেহের উপর কিছুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই। 'চরিত্রহীন' পড়িতে পড়িতে দেহে নূতনের জাগরণ অনুভব করিলাম। এই উন্মেষ আনন্দদায়ক নয়, পীড়াদায়ক। সেই বাল্যকালে যে জায়গাটি আমাকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়াছিল, তাহা এখনও মুখস্থ আছে। মোক্ষদা বাড়ীউলির বাসায় সতীশ উপস্থিত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে সাবিত্রীর ঘরে তাহারই ধবধবে পরিষ্কার বিছানায় সে বসিয়াছে এবং রাত্রির আহারও তাহাকে সেখানে সমাধা করিতে হইয়াছে। "আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিবা ভরিয়া পান আনিয়া দিল, এবং বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া, পায়ের নীচে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া একটুখানি হাসিয়াই নিঃশব্দে মুখ নীচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। নাভিস্থ সমস্ত নাড়িগুলা ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া সর্বদেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার হুঁকা টানিবার সামর্থ্যটুকুও রহিল না।" পুরুষ মাত্রেরই যৌবনে ও পরে এই অস্বস্তিকর দেহ-সংস্কারের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় হয়, সেদিক দিয়া ইহা বাস্তব সুতরাং দোষাবহ নহে। কিন্তু এই অনুভূতির প্রতি এইভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পূর্বে আর কাহাকেও দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারকনাথ এবং আমার অধীত আরও বহু গ্রন্থাবলী ও বই, (ইহার মধ্যে 'বঙ্গবাসী'-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নিন্দিত উপন্যাসগুলিও ছিল)—কুত্রাপি এই-জাতীয় বর্ণনায় এইরূপ বিচিত্র লিপিকুশলতা প্রযুক্ত হয় নাই। ভাল সর্বদাই মন্দকে চাবুক মারিয়াছে। 'যমুনা'য় এই "চরিত্রহীন" খণ্ডশ পড়িতে পড়িতে সাবিত্রীর ঘরে সতীশের সেই দৈহিক নিগ্রহ বালক হইয়াও আমি উত্তরোত্তর প্রবলভাবে ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার এত দিনের আদর্শ বিপর্যস্ত হওয়াতে স্বভাবতই

লেখকের প্রতি মন এক দিকে যেমন বিরূপ হইল অন্য দিকে অজগর-কবলিত হরিণের মত একটা মূঢ় আকর্ষণ আমাকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব আমাকে পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধ-সমালোচক করিয়াছিল, নীতি-বাগীশতা আমার শিল্পবোধকে খণ্ডিত করিয়াছিল। বাল্যকালের এই ঘটনাটির উল্লেখ না করিলে শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার সাময়িক বিরূপতার আসল কারণ অজ্ঞাত থাকিত। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আমি আত্মস্থ হইয়াছি এবং তাঁহার বিপুল প্রতিভার প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে।

কার্তিক ১৩২০ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দের প্রথম কয়েক মাস 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'য় বাহির হইতে হইতে বন্ধ হইয়া আমার আকর্ষণ-বিকর্ষণ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। পাবনা হইতে ১৯১৪ জুলাই মাসের গোড়ায় বাবার নূতন চাকুরি-স্থান দিনাজপুরে যাইতে হয়। তৎপূর্বেই 'চরিত্রহীন' বন্ধ হইয়াছিল কি-না স্মরণ নাই; তবে পাবনাতে 'চরিত্রহীনে'র সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর বাঁকুড়ায় মামার বাড়ির চারতলার ছাদে তাহার সহিত পুনর্মিলন হয়, ইহা মনে আছে। 'চরিত্রহীন' তখন সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'যমুনা' হাতে পড়িবার পূর্বে শরৎচন্দ্রের কোনও রচনা পড়ি নাই, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুস্তকাকারে 'চরিত্রহীন' পড়িবার পর তাঁহার কোনও রচনাই অপঠিত রাখি নাই,—মাঝখানে পুরা চার বছরের অসহযোগ ঘটিয়াছিল।

"কথা কও, কথা কও" আহ্বান সেই যে শুনিয়াছিলাম, এতকাল তাহাতে সাড়া দিবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু শ্রবণযোগ্য স্বর কণ্ঠে ফুটে নাই। মালদহ পরিত্যাগ করিয়া পাবনা যাইবার পথে বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে স্বরচিত একটি কবিতা মাতুল-বন্ধুদের ও মামাত-মাসতুত দাদাদের (ন'মামার

উদার আশ্রয়ে তখন সংখ্যায় অনেকগুলি ছিলেন) প্রায়ই শুনাইতে হইত ; সেটি কোকিল-বিষয়ক এইটুকু মাত্র মনে আছে। সে কবিতা কণ্ঠেই ছিল, কণ্ঠেই হারাইয়া গিয়াছে। পাবনায় আসিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার লোভে সাবধান হইলাম। একটি কালো-মলাট-দেওয়া এক্‌সারসাইজ বুককে ভেলা করিয়া দুস্তর কালসমুদ্রে পাড়ি দিবার সুচিন্তিত চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ আজিও সযত্নে বহন করিতেছি। হিজিবিজি লেখায় পূর্ণ সেই খাতাটি হারাইয়া গেলে ভাল হইত, কিন্তু সব-কিছু সঞ্চয়ের বাতিকগ্রস্ত বালক এক নম্বর সম্পত্তি হিসাবে সেটিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই "মূল্যবান" খাতার মলাটে কাগজ আঁটিয়া লেখা আছে "আমার শৈশব কবিতাবলী", দেশপ্রেম-পরিচায়ক ঠিকানা আছে—রাইপুর, বীরভূম। প্রথম কবিতাটি "ব্যাস-বন্দনা"—

প্রণমে তোমার পদে কবিচূড়ামণি,
করপুটে ভক্তিভরে এ অভাগা দেব!
চাহ কৃপা ক'রে তুমি সত্যবতীসুত ;
অমিয় পীযূষধারা দেহ এ সন্তানে।
রচিয়া ভারতাখ্যান শিক্ষা দিলে সবে
যে মধুর ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিতৃ-স্নেহজ্ঞান—
দেখাও আমারে সেই কল্পনা-লেখনী
শিখাও আমারে তব ভগবদ্‌জ্ঞান।

দেখিতেছি খাতার উপরে অনেক সংশোধনের চিহ্ন রহিয়াছে ; কিন্তু এখানে প্রাথমিক রূপটিই হুবহু প্রকাশ করিলাম। ইহাই আমার সর্বপ্রথম সংরক্ষিত রচনা, তারিখ দেওয়া আছে—৬ই বৈশাখ ১৩২০।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি, ঈশ্বরভক্তিতে এবং বন্ধুপ্রীতিতে সমাচ্ছন্ন এই খাতাখানি ; অদেখা যমুনা হইতে আরম্ভ করিয়া সাক্ষাৎদৃষ্ট অজয়-পদ্মার প্রশস্তি-কবিতাও অনেক আছে ; "ক্ষমার জয়" নামে একটি গাথা-কাব্যও ইহাতে আছে। কোনটিই

উল্লেখযোগ্য নয়, শুধু একটি অপটু কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিয়া স্বগ্রামের প্রতি আমার তদানীন্তন আকর্ষণের বহর দেখাইব। আজ সে আকর্ষণ নাই, ইহা শুধুই বিস্মৃত কাহিনী মাত্র। এমন ভাবে ভালবাসিবার মত করিয়া কবে যে সেখানে ছিলাম, তাহাও মনে পড়ে না। কবিতাটি এই—"মনে পড়ে"—

মনে পড়ে আধ আধ শৈশবকালের খেলা,
মনে পড়ে জন্মভূমে উত্তপ্ত দুপুরবেলা
বাগানের ছায়ামাখা গাছতলে ঝাপাঝাপি
মনে পড়ে আমাদের ছেলেখেলা দাপাদাপি।
মনে পড়ে অজয়ের শীতল ধবল জল
মনে পড়ে স্নানকালে তীরে তার কোলাহল,
সৈকতভূমিতে তার মনে পড়ে সাঁঝবেলা
সবে মিলি খেলিয়াছি কত রকমের খেলা।
ভীষণ গর্জন করি আসিত অজয়ে বান
মনে পড়ে সেকালীন দুখীদের দুখতান।
মনে পড়ে যবে আসি বৈশাখী নবীন মেঘে
গগন আঁধার করি ছুটিত গো মহাবেগে,
সে সময় আমগাছে উঠিয়া সকলে কত
নিত্যই নূতন খেলা খেলিয়াছি শত শত।
মনে পড়ে শীতকালে কাঁথা গায়ে দিয়ে সবে
ঠাকুমার কাছে মোরা গল্প শুনিতাম যবে—
কোন্ সে অজানা দেশে চলিয়া যেতাম আমি
সে গল্পের সাথে সাথে ভুলিয়া জনমভূমি।
সেই সে মধুর দেশে আবার যাইতে চাই,
সহরের কোলাহল ভাল তো লাগে না ছাই।
স্নেহের জনমভূমি মোর সেই রাইপুর,
এ মরতে স্বর্গতুল্য আজ হায় কত দূর!

দিনাজপুরে ১৯১৪ হইতে ১৯১৮—এই চারি বৎসরে মনে স্বদেশ-প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে

রক্তাক্ত ও বিপ্লবাত্মক স্বাধীনতা-আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। প্রকাশ্য সভা-সমিতি গোপনীয় নিষিদ্ধ ষড়যন্ত্রে পর্যবসিত। অন্তর্বৃত্ত বহির্বৃত্ত প্রভৃতি দলভাগে ব্যাপারটি রোমাঞ্চকর ও ঘোরালো হইয়াছে, বিশেষত আমাদের কিশোর-মনে এই গোপনীয়তাই অশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। আমি বহির্বৃত্তে স্থান পাইয়াছিলাম। হুকুম পালন করিতাম, ভোর রাত্রে বাড়ি হইতে পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলের এক প'ড়ো বাড়িতে ছোরা-লাঠি অভ্যাস করিতাম, কিন্তু কি কেন কোথায় কবে—এ সকল প্রশ্নের জবাব পাইতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত আমাদের নিত্যসঙ্গী। লক্ষ্য যাহাই হউক, উপলক্ষ চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য। মাঝে মাঝে দুই-একজন অপরিচিত যুবক আসিয়া আমাদিগকে কাঞ্চন নদীর নির্জন তীরে লইয়া গিয়া দেশপ্রেম সম্বন্ধে খুব ভাল ভাল পাঠ দিতেন, তাঁহাদের নাম পর্যন্ত জানিতাম না। মানুষের সংখ্যাবাচক পরিচয় সমস্ত ব্যাপারটিকে আরও গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আমি কবিতা লিখি জানিয়া নম্বরী "দাদা"রা আমাকে স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। আমি খাতার পর খাতা ভরাইতাম, পড়িয়া শুনাইতাম এবং সকলের প্রশংসায় পরিতৃপ্ত হইতাম। এই কাব্যচর্চা-সংবাদ যে গোপন থাকে নাই, তাহার প্রমাণ পাইতে দেরি হইল না। একদিন আমাদের প্রতিবেশী এবং পিতৃব্যস্থানীয় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির গৃহে আমার ডাক পড়িল এবং বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে তাঁহারই চোখের সামনে তাঁহাদের বাগানের নিভৃত অংশে আমার বিবেকানন্দ-গ্রন্থগুলির সঙ্গে আমার দেশপ্রেমের কবিতার খাতাগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া দিলাম। কবিতাগুলির একটি পংক্তিও কাগজে অথবা মনে অবশিষ্ট রহিল না। এই ঘটনার পশ্চাতে সরকারী চাকুরিজীবী পিতার গোপন ইঙ্গিত ছিল, তিনি সরাসরি আমাকে কিছু বলেন নাই। আমি আমার সেই বিপুল কাব্যসম্ভার বিসর্জন দিয়া সংসারের সকলের

উপর বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িলাম, এমন কি পড়াশুনাও একরূপ ছাড়িয়া দিলাম।

এই চরম নৈরাশ্যের মধ্যে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট-পিতার বদলি-উপলক্ষে দিনাজপুরে নবাগত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় সেকেণ্ড ক্লাসে আমার সহপাঠী হইলেন। হেয়ার স্কুলের নাম-করা ভাল ছেলে, সুতরাং ক্লাসের ফাস্ট´ বয় আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। পরিচয় হইল এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। তিনি সেই সময়েই অনর্গল ইংরেজীতে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইলাম, তাঁহাদের বাড়িতে ক্যারম ও ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি অন্য আকর্ষণও ছিল। নিয়মিত আড্ডা জমিতে লাগিল। মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'প্রগ্রেস' নামে একটি ইংরেজী চটি পত্রিকা সে বাড়িতে মাসে মাসে আসিত। ছাত্রদের বহু শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবিষ্ট থাকিত। সত্যেন ইংরেজীতে অনুরূপ রচনা করিতে পারিতেন। এই 'প্রগ্রেস' লইয়া আলোচনার ফলে আমাদের দিনাজপুর-জিলা-স্কুল হইতে একটি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশের মতলব আমাদের উভয়ের মনে জাগে। আমি সহপাঠীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তাহারা আমাকে জোর করিয়া স্পোর্ট্‌স্, ম্যাগাজিন সকল বিভাগেরই সম্পাদক নির্বাচিত করিয়াছিল। সুতরাং আমারই সম্পাদকতায় পত্রিকা প্রকাশিত হইল, সত্যেন হইলেন প্রধান পরামর্শদাতা ও লেখক। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ কবিতা ও "স্বপ্নভঙ্গ" নামে একটি গল্প লিখিলাম। ইহাই আমার হাতের লেখায় প্রথম বাহিরে আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাখানির আর সন্ধান করিতে পারি নাই, কিন্তু সেই শুভারম্ভ হইতে আমি হইয়াছি সাহিত্যসেবী। সত্যেন চাকুরির দিকে ঝোঁক দিয়া উত্তরোত্তর উন্নতি করিতে করিতে আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারি হইয়াছেন, সরকারী নথিপত্রেই তাঁহার বাগ্দেবী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

খাতা পুড়াইয়া সেই যে আশাভঙ্গ হইয়াছিল, পড়াশুনার দিক দিয়া আর আত্মস্থ হইতে পারি নাই। সেই খাতায় নিবদ্ধ মতবাদের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়াও বাঁকুড়ায় চালান হইলাম। শীতল নিরাপদ জায়গা, কিন্তু আমি পড়াশুনা করিবার মত শৈত্য আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। দল বাঁধিয়া কলেজ-হস্টেলেই নানা কসরৎ দেখাইতে লাগিলাম। মিশনরী কলেজ ও হস্টেলের শান্ত আবহাওয়া গরম হইয়া উঠিল এবং কর্তৃপক্ষের ধমক খাইতে খাইতে দলগতভাবে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

দিনাজপুর-জিলা-স্কুল-ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা বাহির করিয়াই আমার লেখার দিকটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পিতার বদলি হওয়ার ফলে সত্যেনের দিনাজপুর ত্যাগও আমার সাহিত্যচর্চা বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ। বাঁকুড়ায় খাই-দাই, আড্ডা দিই, মোড়লি করি এবং সুর করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি। দিনাজপুরে থাকিতেই জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া 'প্রবাসী'র গ্রাহক হইয়াছিলাম। সাহিত্যচর্চায় বাবার সমর্থন ছিল না, সুতরাং বই কেনার সঙ্গতিও ছিল না। চাহিয়া চিন্তিয়া কিছু কিছু বই সংগ্রহ হইত, অন্য ভাবেও যে না হইত তাহা আজ হলফ করিয়া বলিতে পারিব না ; আমার লাইব্রেরির বহু বইই সেই সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু নানা ভাবে সংগৃহীত বইয়ের মধ্যে নিজের মনোমত বই কদাচিৎ স্থান পাইত। সরকারী কাগজের খাতা বাঁধাইয়া গোটা গোটা বই নকল করিতাম। শুধু রবীন্দ্রনাথের বই। 'গীতাঞ্জলি' ইংরাজী ও বাংলা, 'গোরা,' 'চিত্রাঙ্গদা,' 'বিদায় অভিশাপ,' 'রাজা ও রাণী,' 'বিসর্জন' সম্পূর্ণ নকল করিয়া লইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরে যখন পরিচয় হয় তখন তাঁহাকে খাতাগুলি দেখাইয়াছিলাম, তিনি সস্নেহ বিস্ময়ে সেগুলি আমার নিকট হইতে সম্ভবত একলব্য-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বঙ্গবাণীসাধক, যাঁহার রচনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এবং

তিনিই সর্বপ্রথম কবি যাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সে কাহিনী যথাসময়ে বলিব।

বাঁকুড়াতে এই খাতাগুলিই আমার সম্বল ছিল। স্কলারশিপের টাকা হইতে দুই-একখানি করিয়া বইও কিনিতে লাগিলাম, প্রথম কিস্তিতে 'বলাকা' ও 'পলাতকা,' পরে পরে খণ্ড খণ্ড অন্যান্য কবিতার বই। খাতা এবং বই লইয়া আসর সরগরম রাখিতাম, তর্ক করিতাম, মারামারি করিতাম। নিজে লিখিতাম না। হঠাৎ একদিন আমাদের হস্টেলের পাচকের এক আত্মীয়কে সাপে কামড়াইল। ওঝা বা ডাক্তার কাহার সাহায্য লওয়া হইবে—ইহা লইয়া দুই দল হইল। ডাক্তার আসিল। হতভাগ্যের জীবন রক্ষা হইল না। ওঝার দল রটাইতে লাগিল, ডাক্তার-সমর্থকেরাই লোকটিকে হত্যা করিল। সাংঘাতিক দলাদলি। আমি শেষোক্ত দলে। এই দ্বন্দ্বে আমার মা-সরস্বতী আবার কৃপা করিলেন। আমি ভাবাবেগে একটি আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিয়া নোটিশ-বোর্ডে টাঙাইয়া দিলাম। ঝ'ড়ো হাওয়ায় তাহা উড়িয়া যাইবার কথা, গিয়াছিলও নিশ্চয় ; কিন্তু আমার এক সহপাঠী বন্ধু, অধুনা বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও লেখক শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস, বি. এ., বি. এল. সেদিন প্রীতিবশেই কবিতাটিকে মুখস্থ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ; সম্প্রতি-প্রকাশিত (১৩৫৮) তাঁহার 'মৃত্যুর পর কি হয় ও কোথায় যায়' পুস্তকে তিনি কবিতাটিকে স্থান দিয়াছেন এবং আমাকে এক খণ্ড উপহার দিয়াছেন। হারানো কবিতাটিকে আমার সাহিত্যিক নবজীবনের প্রথম অভিব্যক্তি বলিতে পারি। কবিতাটি এই—

মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায় ?
না-হারানোর বাণী যে ভাই আছে সবার মাঝে
রবি শশী তারায়।

বিধাতার এই মধুর বাণী রটাও ভুবন ভ'রে—
মিথ্যা কান্না-হাসি
জগৎ জুড়ে জীবন-মরণ, আছে যাওয়া-আসা।
শুকায় ফুলের রাশি—
আবার মধুর প্রভাত-বায়ে ফুল যে উঠে ফুটে
দোলে সমীর-ভরে ;
যুগান্তরের এমনি ধারা, ধরার জিনিস কভু
হারায় কি আর ওরে ?
ধরা যেদিন সৃষ্টি হ'ল সেদিন হতে আজও
যা ছিল তাই আছে।
বিধির মধুর দৃষ্টি যে ভাই সেদিন হতে আজও
আছে তাহার পাছে।

বন্ধুর প্রীতি সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল যাহাকে রক্ষা করিয়াছে, আমিও তাহাকে অক্ষম জানিয়াও রক্ষা করিলাম। আমার মনের আগল এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলিয়া গেল এবং রুদ্ধ বন্যাস্রোত দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিতে লাগিল। বন্যার জলের মতই তাহা আবর্জনা-পঙ্কিল হইলেও প্রবাহটা আমাকে সাগর-লক্ষ্যের দিকে ঠেলিয়া দিল। মৃত্যুর মুখামুখি হইয়াও আমি বাঁচিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

দিনাজপুরের স্মৃতি

সদ্য-লব্ধ বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কাব্য-কল্পনার মোহে বাঁকুড়া কলেজ-হস্টেলের নোটিশ-বোর্ডে তো জাহির করিলাম—

মিথ্যা কথা, কে বলে যে হারিয়ে গেছে
কিছু কি আর হারায় ?

কিন্তু হিসাব খতাইতে গিয়া দেখিতেছি, মহাকালের তরঙ্গাঘাতে বহু অমূল্য সম্পদই হারাইয়া গিয়াছে, বর্তমানের বিচিত্র মহিমায় আরও অনেক হারাইতে বসিয়াছি। মালদহের মহানন্দা ও দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা এবং পাবনার দিগন্তবিস্তার পদ্মা মাত্র স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া আছে, বাকি কথা অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্য হইতে বহু কষ্টে আহরণ করিতেছি। কিন্তু পরিণত কৈশোরে যে দিনাজপুরের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, সাহিত্য-জীবন-জলতরঙ্গের প্রঘাতে তাহার কথা সাময়িক ভাবেও হারাইয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। পুস্তকগত বিদ্যা ছাড়া সাহিত্যের বাস্তব জীবনগত পাথেয় এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম—বিশেষ করিয়া দুইটি মানুষের কাছ হইতে। তাঁহাদের কথা এইখানেই বলিয়া রাখি।

বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর অর্থাৎ বালুরঘাটের উকিল শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন ওরফে রতন আমার স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্য-জীবনের আদি-অকৃত্রিম সঙ্গী ও সমঝদার। পরে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি, কিন্তু সেই অপরিপক্ক ছাত্রাবস্থা হইতেই এমন গভীর চিন্তাশীল মানুষ আমার নজরে পড়ে নাই। এমন নির্ভীক স্বাধীনচেতা পুরুষও আমি কম দেখিয়াছিলাম। এই কারণে তাঁহাকে বহু দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে, পৈতৃক পরিবার হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন এবং চিরজীবন-অনুসৃত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতবাদকেও পরিত্যাগ করিয়া শেষ পর্যন্ত বামপন্থা অবলম্বন

করিয়াছেন। গান্ধীজীর খাঁটি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া এবং আগস্ট-বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়া যিনি বার বার কারাবরণ করিয়াছেন, তিনি যে কেন আজ সে-পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার অনমনীয় স্বাধীন মতকে শ্রদ্ধা করিতাম বলিয়াই তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

পাবনা হইতে দিনাজপুর পৌঁছিয়াই বালুবাড়িতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দিনাজপুরের সরকারী উকিল রায়সাহেব যতীন্দ্র-মোহন সেনের (সম্প্রতি মৃত, শেষ-জীবনে কলিকাতা কালীঘাট-নিবাসী) জ্যেষ্ঠপুত্র আমার সহপাঠী এই নরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচিত হইলাম। অত্যল্পকাল মধ্যে পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে, পাড়ার প্রবীণারা আমাদিগকে রাম-লক্ষ্মণ দুই সহোদরের মত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পড়াশুনায় তাঁহার খ্যাতি ছিল না, কিন্তু তার্কিক বলিয়া নাম ছিল। সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি বিষয়ক নানা আলোচনায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও একান্ত অনুগত হইয়া পড়িলাম। বাড়িতে অভিভাবকদের দৃষ্টি ছিল প্রখর, সুতরাং বিশ্রব্ধ আলাপের নিভৃত স্থান বাছিয়া লইতে হইয়াছিল আমাদের পল্লীর পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত দিগন্ত-প্রসারিত আম-জাম-কুরচি-সোঁদাল (কর্ণিকার) এবং বিবিধ কণ্টকগুল্মলতার জঙ্গলে—অরণ্য বলিলেও ভুল হইবে না। পরিবেশ ও পটভূমি ছিল একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র—এই অরণ্যস্থিত একটি প'ড়ো বাড়িতেই আমাদের পূর্বোল্লিখিত সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া বসিত। স্কুলের অবকাশদিনে পক্ষীকূজন-মুখর উদাস দ্বিপ্রহরে আমরা দুইজন বালক সেই বনভূমির নির্জন তৃণাস্তৃত প্রান্তরে বসিয়া বা দেহ এলাইয়া দিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাব্য ও সমাজ-রাজনীতি চর্চা করিতাম, চিন্তা ও কল্পনার মুক্ত অবাধ গতি আমাদিগকে দূর বিদেশে লইয়া যাইত। অপরিণত বুদ্ধিতে রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য নানা বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার মক্স করিতে করিতে একান্ত নিজস্ব এক ধরনের

মতবাদ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। নরেনের তখন লেখা আসিত না। পরে কারা-জীবনের নির্জন অবকাশে তিনি মাতৃভাষায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এবং ইংরেজী ভাষায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ অনেক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যে তাঁহার বাণী সম্পূর্ণ মূক ছিলেন। আমি অনর্গল কবিতা লিখিতাম, রতন ছিলেন আমার অনুরাগী পাঠক ও শ্রোতা। যে জ্বালাময়ী স্বদেশী কবিতাগুলি একদিন তাঁহাদেরই গৃহোদ্যানে হুতাশনসাৎ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, একমাত্র তিনিই তাহার সবগুলির সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কৈশোরের শিক্ষা ও প্রস্তুতির কালে আমরা পরস্পর পরিপূরক ছিলাম, একে অন্যের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে উভয়েই উভয়কে যুক্তি সরবরাহ করিতাম; অন্য সহপাঠীদের কাছ হইতে আমরা একটু স্বতন্ত্র থাকিতাম। দিনাজপুরে যখন প্রথম পদার্পণ করি, তখন সবে ইয়োরোপীয় প্রথম মহাসমর বাধিয়াছে, যুদ্ধশেষ বা শান্তিচুক্তি হয় আমি যখন বাঁকুড়ায়, ১১ই নবেম্বর ১৯১৮। সুতরাং সমগ্র সামরিক উত্তেজনার কাল দিনাজপুরে উভয়ে একত্র ছিলাম, আলাপ-আলোচনা তর্কাতর্কি হাতাহাতির কারণের অভাব কোনও দিনই হইত না। এই যুদ্ধ লইয়া আমাদের দুইজনের জীবনে একটু বিপর্যয়ও ঘটিয়াছিল, যাহার উল্লেখ আবশ্যক। সাহিত্যিক খাণ্ডবদহনের পর আমি তখন প্রায় দেওয়ানা, লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, ইংরেজকে এ দেশ হইতে উৎখাত করিতে না পারিলে কিছুতেই শান্তি নাই—মনের এইরূপ অবস্থা। এমন সময় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতার সাহায্যে দিনাজপুরের তরুণ সম্প্রদায়কে ইংরেজের পক্ষে সৈন্যদলে যোগদানে উৎসাহিত করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। পক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে তুমুল সোরগোল পড়িয়া গেল, আমরা বিপক্ষে। কিন্তু বক্তৃতা শুনিয়া ব্যুমেরাঙের বিচিত্র রীতি অনুযায়ী হঠাৎ অক্ষ

প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইলাম। স্থির করিয়া ফেলিলাম, ইংরেজের হইয়াই লড়িতে যাইব। দিনাজপুরের সরকারী চাকুরিয়া অভিভাবকদের নাকের উপর নাম লেখানো সম্ভব নয়। সুতরাং পলাইয়া কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল। ভাড়ার চিন্তা মাথাতেই আসিল না, ইংরেজের পক্ষ সমর্থনে যুদ্ধ করিতে যাইব, আমাদের আবার ট্রেনের ভাড়া কি! বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমরা বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য ধৃত হইয়া পার্বতীপুর জংশনের ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারের কাছে নীত হইলাম। সেই স্নেহপরায়ণ বৈদেশিক বৃদ্ধ কি বুঝিলেন জানি না, তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নানা হিতোপদেশ দিয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। সেদিন এই দুর্বিপাক না ঘটিলে বঙ্গভারতীর দরবারে যে আর একজন হাবিলদার কবির আবির্ভাব ঘটিত, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

যুদ্ধে গেলাম না বটে, কিন্তু সামরিক প্রবৃত্তিটা কেমন করিয়া মনের মধ্যে আসন গাড়িয়া বসিল। অতি তুচ্ছ কারণে পাড়ার ছেলেদের এবং সহপাঠীদের সহিত মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। নালিশে নালিশে জর্জরিত পিতা আমাকে মারিতে মারিতে এলাইয়া পড়িলেন। আমার ভ্রূক্ষেপ নাই, আমি তখন উদাসীন এবং মরীয়া। একদিন দিনাজপুরের পরবর্তী স্টেশন কাউগাঁর একটি মেলায় স্বদলবলে গিয়া লুঠতরাজ পর্যন্ত করিয়া আসিলাম। ধরা পড়িয়া লেখাপড়ায় দক্ষতার গুণে হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে রেহাই পাইলাম। ঠিক এই সময়ে সত্যেনের আবির্ভাবে আমার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল এবং নূতন বন্ধুত্বের মোহে সাময়িকভাবে রতনের সহিতও বিচ্ছেদ ঘটিল। আগেই বলিয়াছি, তখনই আমার সম্পাদক-জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নূতন বিদায় লইতেই দুই পুরাতন বন্ধুতে দ্বিগুণ আবেগে পুনর্মিলিত হইলাম। মিলনের স্থান পরিবর্তিত হইল। সত্যেনদের বাড়ি ছিল কাঞ্চন নদীর তীরে এক উদ্যানের মধ্যে।

অভ্যাসের আকর্ষণে কাঞ্চন নদীকে আর ছাড়িতে পারিলাম না। নির্জন কাঞ্চন নদীতীরে প্রত্যহ বৈকালে আবার আমাদের সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতির আসর বসিতে লাগিল, সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি অবধি নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে দুই বন্ধুর কল্পনাবিলাস চলিত। 'রাজহংসে'র "তমসা-জাহ্নবী" কবিতায় সেই যুগের এই পরিচয় আছে—

> মিলাল পদ্মার ছায়া, স্বচ্ছজল চপল কাঞ্চন,
> কিশোরীর বেণী যেন, হাঁটুজল শহরের ধারে;
> ভুলে-যাওয়া কবিতার অকস্মাৎ আবৃত্তির মত—
> গান গেয়ে ওঠে প্রাণ, কৈশোর যৌবনে আসি মেলে।
> রেল-লাইনের সাঁকো, প'ড়ো বাড়ি, আমের বাগান,
> নির্জন সন্ধ্যায় যেথা মেঘে মেঘে রঙের বিলাস,
> গানে গানে উন্মাদনা। স্নান করি শান্ত নদীজলে
> দেবতা-মন্দিরে যেন দেখা দিল তরুণ পূজারী।

দিনাজপুর-জিলা-স্কুল ছাড়িয়া আমি গেলাম বাঁকুড়ায়; রতন কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিলেন। ছুটির সময় দিনাজপুরে আবার মিলিতাম বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে। আমি বি. এস-সি. পড়িতে কলিকাতায় আসিলে আবার দীর্ঘস্থায়ী মিলন হইয়াছিল। তাহার পর আমাদের জীবনের গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে। আমি সাহিত্য এবং নরেন রাজনীতিকে মুখ্য অবলম্বন করিয়া জীবন-নদীতে পাড়ি দিয়া চলিয়াছি, মাঝে মাঝে তরণী পরস্পর সংলগ্ন হইলেও বিচ্ছেদের পারাবারই অপার। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনিও সাহিত্যিক হইবার সাধনা করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের আসামীরূপে জেলে গিয়া 'বিক্ষোভ' নামে এক সুবৃহৎ উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, আমিই তাহা দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের দুইজনেরই কৈশোর ও যৌবনের কাহিনী উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বালুবাড়িতে সেই কালে একজন মহাপুরুষ বাস করিতেন, দিনাজপুরে পৌঁছিবা মাত্রই সর্বাগ্রে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি সেখানে 'পণ্ডিত মশায়' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার আসল নাম ভুবনমোহন কর, পরে মহর্ষি ভুবনমোহন নামে সর্বত্র খ্যাত হন। আমি যখন তাঁহাকে দেখি, তখনই (১৯১৪) তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ, শ্মশ্রুগুম্ফ এক হইয়া আবক্ষ প্রসারিত, সাদা ধবধব করিতেছে। সৌম্যদর্শন প্রশান্তমূর্তি মুখখানি আরও সুন্দর, করুণায় মণ্ডিত, কপালের আব তাঁহার মুখ-সৌন্দর্যকে কেমন যেন প্রশান্ততর করিয়াছিল। ঢাকার কোন্ স্কুলের হেড পণ্ডিতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কোনও সূত্রে দিনাজপুর আসেন, সেও প্রায় পঁচিশ বৎসর হইতে চলিয়াছে। তিনি ধর্মবিশ্বাসে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচার তাঁহার শেষ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বালুবাড়ির চৌমাথাস্থিত বটতলায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাসগৃহের সংলগ্ন ছিল তাঁহার দাতব্য ঔষধালয়। বটতলায় খেলিতে গিয়া প্রত্যহ প্রাতে এই ঋষিতুল্য মানুষটিকে দেখিতাম। দেখিতাম, দলে দলে বিচিত্র ধরনের স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকটে দৈহিক দুঃখ নিবেদন করিয়া নিরাময় হইবার ঔষধ ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে; সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একাদিক্রমে এই কার্য চলিতেছে—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরক্তি নাই। মুখে সস্নেহ ও সহাস্য বরাভয়, কম্পমান হাত প্রেসকৃপশনের পর প্রেসকৃপশন লিখিয়া চলিয়াছে; পাঁচ-সাতজন স্বেচ্ছাসেবক কম্পাউণ্ডারি করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই অপরূপ দৃশ্য প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে কৌতূহলী বালকের মন ভক্তি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। দেখিয়া ভরসা হইত—মুচি মুদ্দফরাস চামার মেথর, এমন কি, গলিত-কুষ্ঠরোগী—কেহই তাঁহার নিকট অস্পৃশ্য বা অপাংক্তেয় ছিল না, শিশু বালক কিশোরদের তো অবাধ গতি ছিল। নরেন দিনাজপুরেরই

ছেলে, পণ্ডিত মশাই তিন পুরুষে তাঁহাদের চিনিতেন। নরেনকে পুরোভাগে রাখিয়া একদিন গুটি গুটি তাঁহার কাছে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দেখিলাম আমার পরিচয় জানিতেন, সস্নেহ আশীর্বাদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া, অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি বাংলা চিঠিপত্র লিখতে পার? তোমার হাতের লেখা কেমন? বানানজ্ঞান আছে তো? সেই সহৃদয় প্রশ্নগুলি আমার কানে এখনও বাজিতেছে। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল না—এখনও ভাল নয়, তাই সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করিলাম, বাংলা লিখতে পারি, কিন্তু হাতের লেখা ভাল নয়। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, ছুটির দিনে দুপুরে অবসরমত এসো। বাহির হইতে নিত্য দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দৈনন্দিন রুটিন আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল, অনুমানে বুঝিতে পারিলাম, কাজের মানুষ তিনি, এই বালককেও কাজে লাগাইতে চান—রোগীদের চিঠিপত্রের জবাব দিবার কাজে আমাকে যোগ দিতে হইবে। তাঁহার নিজের হাতে জড়তা আসিয়াছিল, লিখিতে গেলে হাত কাঁপিত। মহতের কাজে আমারও স্থান হইবে জানিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম।

পণ্ডিত মহাশয়কে সঠিক জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের তালিকাটি জানা প্রয়োজন। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া কিয়ৎকাল উপাসনায় বসিতেন, মৃদু মৃদু ভগবদ্‌প্রসঙ্গের গান গাহিতেন—রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র গান তাঁহার মুখে অনেক শুনিয়াছি, ধর্মগ্রন্থ পড়িতেন। তাহার পর সমাহিত হইয়া বসিয়া আগের দিন যে সকল কঠিন রোগী দেখিয়া আসিয়াছেন, হোমিওপ্যাথির পুস্তক ঘাঁটিয়া উপসর্গানুযায়ী তাহাদের ঔষধ নির্ণয় করিতেন। যাহারা দূর হইতে অথবা মুখামুখি সাক্ষাতের লজ্জা বাঁচাইবার জন্য নিকট হইতেও অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাধির ঔষধ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিত, নিজে বহু কষ্টে তাহাদের জবাব লিখিতেন। ধীরে ধীরে ভোর

হইয়া আসিত, বিচিত্র পাখীদের কলকাকলীতে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের সুনিবৃত্ত শাখা-প্রশাখা মুখর হইয়া উঠিত, রাজপথে একটি দুইটি করিয়া পথিক-চলাচল শুরু হইত, তিনি খোলা ডিস্‌পেন্‌সারির গদিহীন শুষ্ক কাঠের চেয়ারে আসিয়া বসিতেন; অধীর রোগীরা ততক্ষণ এক এক করিয়া জমায়েত হইয়াছে, নিদ্রা-কাতর তরুণ কম্পাউণ্ডারদের শুধু আসিবার অপেক্ষা। তাহাদের জন্য অবশ্য কখনই আটকাইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপায় পাড়ার ছেলেরা প্রায় সকলেই এই কাজে অল্পবিস্তর দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, আমিও শুধু সামনের রাস্তায় পায়চারি করিতে করিতে ইউপেটোরিয়াম পারফিউলা, বেল, ইপিকাক, চায়না, নাক্স, কার্বোভেজ, আর্নিকা, সালফার, মায় রাস্‌টক্‌স্‌ পর্যন্ত ঔষধের যথাযথ প্রয়োগ অধিগত করিয়াছিলাম। উত্তরবঙ্গের বহু শহরে ও গণ্ডগ্রামে হোমিওপ্যাথির বর্তমান (পার্টিশন পর্যন্ত) ব্যাপক প্রসার পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণেই ঘটিয়াছে, তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বহু স্থলে বহু গরিবের মা-বাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহা হউক, প্রেসক্রপশন ও ডিস্‌পেন্‌সিং-এর কাজ অচিরাৎ আরম্ভ হইত এবং বেলা বারোটা পর্যন্ত সমানে চলিতে থাকিত। গড়পড়তা প্রত্যহ প্রায় দুই শত রোগীর পরীক্ষা ও ঔষধ-ব্যবস্থা হইত, প্রত্যেককে নিজ নিজ শিশি লইয়া আসিতে হইত। ঠিক মধ্যাহ্নে পণ্ডিত মহাশয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেন এবং পাশে রক্ষিত লাঠিটি অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিতেন। পাড়ার বা কাছাকাছি অন্য পাড়ার যে সকল বৃদ্ধ, শিশু বা মহিলা রোগী ডিস্‌পেন্‌সারিতে আসিতে অপারগ হইতেন, তখন হইতে বেলা একটা পর্যন্ত তিনি স্বয়ং পদব্রজে গিয়া তাঁহাদের দেখিতেন। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিয়া বটতলায় ছোট্ট একটি মাদুর পাতিয়া বসিয়া তিনি প্রথমটা কাঁধের গামছা ঘুরাইয়া শ্রান্তি দূর করিতেন। জামা বা পিরহান তিনি কখনই ব্যবহার করিতেন না, খাটো মোটা ধুতি এবং

একখানি গামছা তিনি উত্তরীয়-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। বাড়ির ভিতর হইতে এক বাটি সরিষার তেল আসিত, তিনি বসিয়া বসিয়া নিজেই সর্বাঙ্গে তাহা মাখিতেন। এই সময়ে তাঁহার আশেপাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বহু শাস্ত্রীয় সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে পাইত। বেলা দুইটা নাগাদ স্নান সমাধা করিয়া তিনি বাড়ির উঠানে আহারে বসিতেন, বৃষ্টির দিনে বসিতেন ভিতরের বারান্দায়। আয়োজনের মধ্যে পাত্রের আয়োজনই একটু বিশেষ—থালা, বাটি, গেলাস, সমস্তই পাথরের, আমিষের ছোঁওয়া তিনি একেবারেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না তাই এই স্বাতন্ত্র্য। নিরামিষ আহার্যের আয়োজন যৎসামান্য—মোটা ভাত, একটা ডাল, একটা শাকডাঁটার তরকারি, কখনও বা অম্বল। আহারের পরিমাণ বিপুল; আশী বছর বয়সেও তিনি যাহা আহার করিতেন, জোয়ান পুরুষদেরও তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। তিনি একাহারী ছিলেন, তাঁহার হাতের সঙ্গে মুখের সাক্ষাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার ঘটিত। পাথরের বাসন ও নিরামিষ ব্যবহার করিলেও অন্য কোনও সংস্কার তাঁহার ছিল না। অতি নিম্নশ্রেণীর পতিত অন্ত্যজদের নিমন্ত্রণ তিনি সানন্দে গ্রহণ করিতেন। পাথরের পাত্রগুলি লইয়া বহুদিন তাঁহাকে ডোম-মেথরদের পাড়ায় নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইতে দেখিয়াছি। আহারের পর বটতলায় আর একটু দীর্ঘায়তন মাদুর বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেন, নিদ্রাকর্ষণও হইত, তিনি বলিতেন—ভাতঘুম। অবশ্য বর্ষাকালে বিশ্রামের স্থান-পরিবর্তন হইত। ঘড়িতে যখন ঠিক টং টং করিয়া তিনটা বাজিত, তিনি উঠিয়া পড়িতেন। চিঠিপত্র দোয়াত কলম কাগজ আসিত, সেদিনকার সংবাদপত্র হাতে লইয়া তিনি বসিতেন, মুন্সী যে থাকিত সে একটির পর একটি পত্র পড়িত এবং তাঁহার নির্দেশ-মত জবাব লিখিত। তাঁহার একটি এক-ঘোড়ার পাল্‌কিগাড়ি ছিল, কোচোয়ান ততক্ষণে সেটিকে প্রস্তুত করিয়া সামনে হাজির করিত, ঘোড়ার সম্মুখে ঘাসের আঁটি মেলিয়া ধরিয়া সে ঘোড়ার পিঠে সাদর

সশব্দ চাপড় মারিয়া প্রভুকে জানান দিত—যান প্রস্তুত। চিঠিপত্রের দপ্তর বন্ধ হইত, তিনি শহরের দূরপ্রান্তে রোগী দেখিতে বাহির হইতেন। ঘোড়াটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সুযোগ পাইলেই তাহাকে আদর করিতেন, প্রখর রৌদ্রের সময় তাহাকে গাছের ছায়ায় দাঁড় করাইয়া নিজে হাঁটিয়া যাইতেন, ঝড়-বাদলে ঘোড়াকে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিতে না পারিলে স্বস্তি পাইতেন না। ঘোড়াটিও প্রভুর কম অনুগত ছিল না। তাহার প্রভুভক্তির প্রমাণস্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রভুর দেহরক্ষার পরেই এই অবলা জীবটি আহার্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এবং অচিরকালমধ্যে প্রভুর অনুগামী হয়। রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি ফিরিতেন, সদ্য-দৃষ্ট রোগীদের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডিস্‌পেন্‌সারির চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। একে একে ছাত্রেরা আসিয়া জুটিত, তিনি হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দিতেন। রাত্রি আটটা পর্যন্ত ক্লাস চলিত। তাহার পর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রিয় গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ। যতদিন দিনাজপুরে ছিলাম ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাঁহাকে অসুস্থ বা অক্ষমও কখনও দেখি নাই। আমি যখন পাকাপাকি রকম দিনাজপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় বি. এস-সি. পড়িতেছি, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অগিল্‌ভি হস্টেলে আছি, তখন তাঁহার দেহ ভাঙিয়া পড়ে। বয়স তখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। তাঁহাকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনা হয়, কিন্তু কোনও ফল হয় না। তিনি নিজে আগ্রহ করিয়া দিনাজপুরে ফিরিয়া যান এবং সেখানেই চিরশান্তি লাভ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি চিরকুমার ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদের সংসারে আজীবন বাস করিলেও তিনি তাঁহাদেরই নিজস্ব ছিলেন না, সকলের আত্মীয় ও প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সেবাকার্যের ব্যয়ভার বহন করিতেন গবর্মেণ্ট, মিউনিসিপালিটি এবং

স্থানীয় সহৃদয় জনসাধারণ। সকলের সাহায্যে তাঁহার সেবাকার্য একদিনের জন্যও ব্যাহত হয় নাই।

আমি সময় পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রনবিসি করিবার জন্য অপরাহ্নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। এই কাজ নরেনের পছন্দমাফিক ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়কে এই প্রত্যক্ষ সেবা পরোক্ষে আমার সাহিত্য-সাধনার সহায়ক হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক চিঠিগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম, তিনি মোদ্দা জবাবটা সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিতেন, আমি বানাইয়া গুছাইয়া জবাব লিখিতাম। পথ্য ও ঔষধের নাম লাঞ্ছিত হইলেও তাহা ছিল রীতিমত বিদ্যালয়ের কম্পোজিশন ও এসে-রাইটিং-এর সাধনা। এই সময়ে পণ্ডিত মহাশয় বহু বিচিত্র ঘটনার কথা, সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের কথা অতি সরসভাবে বলিতে থাকিতেন। ছাপা পুস্তকের অতিরিক্ত এই শিক্ষা আমার সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক জীবনে বহু উপকারে লাগিয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকটে কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা প্রচারকেরা আসিতেন, তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু অন্য সাধু ব্যক্তিদেরও সমাগম হইত। বহু সৎপ্রসঙ্গ আলোচিত হইত, আমরা শুনিতাম। মেথরাণীদের তিনি সর্বদা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী মা বলিতেন; কুৎসিত-ব্যাধিগ্রস্ত দুশ্চরিত্র পুরুষেরও চারিত্রিক সংযমের তারিফ করিয়া বলিতেন, ইনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষাও তো খারাপ হইতে পারিতেন! শুনিয়া আমরা কখনও হাসিতাম, কখনও বিস্মিত হইতাম। তাঁহাকে কখনও ক্রুদ্ধ ও ধৈর্যহীন হইতে দেখি নাই, জোরে কথা বলিতেও শুনি নাই। তাঁহার চিত্তের প্রশান্তি ও স্থৈর্য কিছুতেই বিচলিত হইত না, চরমতম দৈহিক ক্লেশও তাঁহার মুখে রেখাপাতমাত্র করিতে পারিত না। যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, যে সাধনা ও তপশ্চর্যা তাঁহার জীবনকে এই ভাবে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ

করিয়াছিল, তাহার বিশদ ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করে নাই। যে অসাবধানী অথচ সৌভাগ্যবান মানুষদের সংসর্গে তিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার কথামৃত ধরিয়া রাখিতে যত্নবান হন নাই, কালের বিপুল প্রবাহে সে সকলই আজ হারাইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শে তাঁহারা সকলেই কিছু না কিছু অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এই সৌভাগ্যশালীদের একজন। আমি সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরে নিতান্ত অপটু হাতে একটি প্রশস্তি লিখিয়াছিলাম। ছন্দ ও রবীন্দ্র-প্রভাবের দোষ যাঁহারা ধরিবেন না, তাঁহারা ইহার মধ্যেই অবোধ বালকের দৃষ্টিতে সেই মহৎ মানুষটিকে দেখিতে পাইবেন।—

ভুবন মোহন কর তোমরাই হে মহাপুরুষ,
নহে তারা স্বর্ণ-কিরীটী শোভে মস্তকে যাদের।
ভুবনমোহন তুমি, নাহি জানি কোন্ মহাক্ষণে
কোন্ স্বর্গলোক হতে পাপতাপ-ভরা এ ধরায়
অবতীর্ণ হ'লে আসি, বিতরিলে করুণা অপার
অভাগা পতিত দলে। কর্মযোগী তুমি, ডুবে আছ
মহাকর্ম-সমুদ্রের মাঝে, উর্ধ্বে দেবতার পানে
আছে তবু চিত্ত স্থির তব। শুনি নাই কভু, তুমি
কর্মমাঝে আত্মহারা হয়ে তাঁহারে করেছ হেলা
কর্ম যাঁর অভিপ্রেত, সুখে-দুঃখে আহারে-বিহারে
প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তেতে জপিতেছ
মুখে প্রিয় নাম, কর্মফলস্পৃহা ত্যজি, অবিরাম
তাঁরি পদে স'পিতেছ জীবনের অর্জিত গৌরব।
আপনার শান্তিসুখ হে সন্ন্যাসী, দিলে বিসর্জন
নিবারিতে দুঃখশোক তাপিত জনের। না করিলে
ভীষ্মসম দারপরিগ্রহ। পূজিলে আজন্মকাল
মাতৃজ্ঞানে রমণী জাতিরে। তুমি চাও পারে যেন

এই ভ্রষ্টজাতি ধর্মরূপ বর্মমাঝে লভিবারে
পরম আশ্রয়। ঘৃণা নাহি করি' পতিত-অন্ত্যজে
বুঝে যেন এরা সায়—মানুষের কর্তব্য মহান
স্নেহ করা তাপিতেরে, প্রেম করা দীনহীনজনে।
ভুবনমোহন তুমি, যশ চাহ নাই এ ভুবনে
একাকী নীরবে শুধু করিয়াছ দুঃস্থজনসেবা,
তোমারে প্রণমি' করি এ প্রার্থনা দেবতার কাছে—
তোমার আদর্শ যেন ঠাঁই পায় প্রতি ঘরে ঘরে।

আমার এই সামান্য জীবনে মানুষের মহত্তম প্রকাশ আমি তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে পাইয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। নরেন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন এই দুইজনের মোহন স্মৃতি দিনাজপুরে আমার বাল্য ও যৌবনপ্রবাসকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, আমার সাহিত্য-জীবনের সঙ্গেও এই স্মৃতি কম জড়িত নয়।

সপ্তম তরঙ্গ

আলো-আঁধারি

কোনও পাকাপোক্ত গৃহিণীকে যদি সামান্য কয়েক ঘণ্টার নোটিশে দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশে যাইতে হয়, তাঁহার অভ্যস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও সেখানে গিয়া তিনি যেমন নারকেল-কুরুনি বঁটি, ফুলবড়ি অথবা মুড়িতে মাখিয়া খাইবার গোটা-ভাজার অভাবে করাঘাত করিয়া আপন ললাটকে স্মৃতিভ্রংশ-দোষে ধিক্কার দিতে থাকেন, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। আসলে উভয় ক্ষেত্রে দোষ স্মৃতির নয়, দোষ তাড়াহুড়া করার। যথোপযুক্ত প্রস্তুত হইয়া পথে বাহির হওয়া হয় নাই, স্মৃতিশক্তি মাঝে মাঝে অসহযোগ করিয়াছে, ফলে অনেক অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ কাজের কথাও ফেলিয়া যাইতে হইয়াছে। একে একে তাহা মনে পড়িতেছে। ভুল-ভ্রান্তিও ঘটিয়া যাইতেছে। ফেলিয়া-আসা একটা কথা স্মরণে তুলিয়া ধরিলেন আমার প্রায় চল্লিশ বছর আগের হারানো বাল্যবন্ধু—পাবনা-জিলা-স্কুলের ক্লাস সিক্স-সেভেনের সহপাঠী অয়স্কান্ত বক্সী, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহু-প্রশংসিত নাটক 'ভোলা মাস্টারে'র লেখক। সেদিন পথে হঠাৎ দেখা। তিনি বলিলেন, দিনাজপুর-জিলা-স্কুল-ম্যাগাজিনেই তোমার সম্পাদক-কাজের হাতেখড়ি—এ কথা সত্য নয়। তুমি পাবনা-জিলা-স্কুলেই একটি ম্যাগাজিন সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলে, আগাগোড়া তোমারই হাতের লেখায়। ঘটনাটা মনে পড়িল বটে, কিন্তু সে সেলেটের লেখা কালের ফুৎকারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। এইরূপ তথ্যের ভুল সংশোধন করিতে আমি বাধ্য।

'জীবন-জলতরঙ্গ' বা 'আত্মস্মৃতি' প্রথম "পরিচয়"-অধ্যায় লেখার পর, ৪ঠা জানুয়ারির (১৯৫২) "দিনলিপি"তে লিখিয়াছিলাম—

"দ্বিতীয় তরঙ্গ কোথা হইতে আরম্ভ করিব? নানা রকমের চিন্তা মাথায় আসিতেছে। যদি আমার সম্পূর্ণ অন্তর্জীবন ভবিষ্যৎ কালের জন্য তুলিয়া রাখিয়া যাই অর্থাৎ আমি না থাকিলে তাহা যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি ও মনের বিকাশের সঙ্গে দেহধর্মেরও ক্রমপরিণতি দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানেই মাসে মাসে ধারাবাহিক ভাবে যদি এই জীবন সাধারণের গোচরে আসে তাহা হইলে এই শেষের ইতিহাস গোপন রাখিতে হইবে। শুধু কাব্যজীবন, কেমন করিয়া আমার জীবন-বীণার তারে বাহিরের আঘাত লাগিয়া সুরের ব্যঞ্জনা জাগিল, ধীরে ধীরে ছন্দায়িত হইল আমার মনের ভাব—সেইটুকুই লিখিতে পারিব। আমার মনে হয়, তাহা করাই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবিরা আগাগোড়া সমস্ত উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন—যৌনজীবন ও সাহিত্যজীবনকে তাঁহারা তফাত করেন নাই। আমি যখন 'অজয়' লিখি (১৯২৭-২৮) তখন সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু 'অজয়' উপন্যাসের আকার লইয়াছিল, সত্য ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং তাহা আরম্ভেই খণ্ডিত হইয়াছিল, ইঙ্গিতমাত্র দিয়া আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। আজ পঁচিশ বৎসর পরে আবার সেই সমস্যাই উঠিতেছে। যৌবনের বিপুল প্রাণধর্ম সত্ত্বেও তখন যাহা সত্যের মুখ চাহিয়াও করিতে পারি নাই, আজ তাহা করিব কেমন করিয়া? সুতরাং কাব্য ও জীবন দুই ভাগে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। একটি আপাতত প্রকাশিতব্য, অন্যটির প্রকাশ মুলতুবি থাকিবে।"

তবে একটা কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আদি-রস বা "লিবিডো"র উত্তাপ বা ভাবনা ছাড়া পৃথিবীর কোনও শিল্পীর জীবন সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সাহিত্য-শিল্পীর জীবন তো নয়ই। ইহার প্রকাশ কোথাও উদ্দাম, কোথাও সংহত; সংহতি যত বেশি,

শিল্পীর সাহিত্য-জীবনের প্রভাব ও পরিমাণ তত বেশি। সুতরাং সাহিত্যিকের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন যৌনজীবন কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। যাঁহাদের হাতে লেখনী, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই নিজেদের ক্যাসানোভা অথবা শুকদেব করিয়া তুলিতে পারেন, সকল কাহিনীর তথ্যগত মর্যাদা আমরা ইচ্ছা করিলে না দিতেও পারি; কিন্তু এ কথা না মানিয়া উপায় নাই—একজন কালিদাস, একজন শেক্সপীয়র, একজন গ্যেটে অথবা একজন শেলী, একজন কীট্‌স, একজন রবীন্দ্রনাথ—প্রত্যেকেরই সাহিত্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরালে রক্তে-মাংসে-গড়া মোহিনী—এক বা একাধিক আছেনই, জীবনদেবতা বা "ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটি" থাকুন আর নাই থাকুন। বায়রন, অমরু, ভর্তৃহরি এবং আরও অনেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেন বলিয়াই স্থূল; এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রীশ্চিনা রসেটির মত বহু মুখচোরা পুরুষ-কবি আত্মগত থাকিয়াই সূক্ষ্ম। স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহারা যাহাই হউন, যৌনপ্রেমের অপবিত্র অথবা পবিত্র স্পর্শ সর্বত্রই বিদ্যমান—কোথাও চেতন, কোথাও অবচেতন। মোট কথা, রূপান্তরিত "লিবিডো"ই শুধু সাহিত্যের নয়, সকল শিল্পসৃষ্টিরই প্রাণ।

সাহিত্যিকের গর্ব লইয়া আমি যখন আত্মস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি, এই একান্ত দেহসংস্কার বা প্রাণধর্মের অতীত আমি নহি তাহা বলাই বাহুল্য। ফলাও করিয়া লেখার মত কাহিনীও আমার জীবনে অনেক আছে, কিন্তু তাহা আমার সাহিত্য-জীবন-জলতরঙ্গের ঊর্ধ্ব বা দৃশ্যমান সমতলের সামগ্রী নহে, অতি গভীর নিম্নস্তরে তাহা আজ সুধীরে প্রবাহিত। উদ্দাম আবর্তের কাল কাটিয়া গিয়াছে, এখন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে উপরে টানিয়া তুলিবার প্রয়োজনও অনুভব করিতেছি না। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যিক-শিল্পী-সমাজে এই আদিম জৈবসংস্কারকে সামঞ্জস্যহীন বা বি-সম ভাবে অর্থাৎ

অত্যন্ত মোটা করিয়া ধ্যাবড়া রঙে প্রকট করিবার একটা দুষ্প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছিল। তাহার ঢেউ যথাকালে আমাদের বাংলা-সাহিত্যেও লাগিয়াছিল। ফলে যে রূঢ় তাল-ঠোকা বিকৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদেই আমি বিজ্ঞানের ছাত্রজীবন হইতে সাহিত্যের ভোজপুরী জীবনে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলাম, তাহার জন্যই কালধর্মকে অর্থাৎ যৌনপ্রবণ আত্মপ্রকাশ-পদ্ধতিকে অতিক্রম করিতে পরিয়াছিলাম। সুতরাং সেদিন যাহা প্রকাশ করিবার স্বাভাবিক সুযোগ ছিল, তাহা জীবনের গভীরে তলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানুষের জীবন-সংস্কার বা প্রাণধর্ম যে তাহার যুক্তি-আদর্শ অপেক্ষাও প্রবলতর ও শক্তিশালী, তাহা প্রমাণ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে কবিতার আকারে মাঝে মাঝে দেহধর্ম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'রাজহংসে'র "পান্থ-পাদপ" কবিতাটি এই জাতীয় নানা ইঙ্গিতে পূর্ণ। দিনাজপুরের স্মৃতির সঙ্গে আমার যৌন-জীবনের উন্মেষ-কাহিনী জড়িত। আমার স্মৃতির ছায়াছবি-পর্দায় সেদিনের সেই অবোধ কিশোরের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নবজাগরণ কি মূর্তি ধরিয়াছে, "পান্থ-পাদপ" হইতে সেইটুকু মাত্র দেখাইয়া আমি এই নিষিদ্ধ কথা বন্ধ করিব। সাহিত্য ও শিল্পজীবনের রসদ বহু নিষিদ্ধ স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, বহু সহৃদয় ব্যক্তি বহুভাবে আমার প্রাণধারাকে পুষ্ট করিয়াছেন, দেওয়া-নেওয়ার সেই বিচিত্র ও ব্যাপক কাহিনী আপাতত মুলতুবি রাখিয়া আরম্ভের নমুনাটুকু মাত্র পরিবেশন করিতেছি—আজ ইহা নিতান্ত হাস্যকর ছেলেমানুষির মত শুনাইলেও আমার অন্তর্জীবনের উন্মেষে এই ঘটনা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই :

> মনটারে সাদা পরদা বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি,
> কত ছায়াছবি ভেসে ওঠে পর্দায়—
> মনের কবরে একটি একটি চলিয়াছে শবাধার,
> জীবনে তাহারা থাকে নাই বেশি দিন।

স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তারা বিলম্ব নাহি করে।
কারো সাথে কারো নাহি কোনো যোগ, শুধু চলে সারি সারি—
আমারই খেয়ালে দ্রুত কি বিলম্বিত।
প্রখর রৌদ্রে মধ্যদিনের দাহে—
প্রভাতে যখন দিবসের কাজ শুরু,
সে স্মৃতি-খেলায় নাহি মোর অবকাশ।
রজনী যখন আঁধারিয়া আসে, গগনে ঘনায় কালো,
দূরে কোথা শুধু প্রহরী পেচক জাগে,
মেঘে মেঘে যবে ধূসর আকাশ আলো আবছায়া হয়,
অবিরল ধারে আকাশের ধারা ঝরে ;
একাকী আমার বাতায়নে বসি—মন-বাতায়নে সখী,
স্তব্ধ পুলকে দেখি চলিয়াছ সবে—
কারো চেনা শুধু সিঁথির সিঁদুর, কারো গুণ্ঠনখানি,
কারো চেনা শুধু কণ্ঠের কালো তিল,
শাড়ি পরিবার ভঙ্গিটি শুধু কারো লাগে চেনা-চেনা,
কেহ ধরা দাও পিছন ফিরিয়া চেয়ে—
পথে যেতে যেতে ক্ষ'য়ে মুছে গেছে চরণে অলক্তক।
চেয়ে চেয়ে মোর ঝাপসা হয় যে আঁখি।

সব চ'লে যায়, তুমি শুধু সখী, দাঁড়াও কি যেন ছলে,
তোমারে দেখেছি কাঞ্চন-নদীতীরে।
ফুলের ফসলে ভরা সাজিখানি ছিল না দখিন হাতে,
বাম হাতে নাহি ছিল লীলা-শতদল।
তুমি ছিলে আর ছিল বালুচর, মাছরাঙা উড়ে উড়ে
খরদৃষ্টিতে দেখে আর দেখে শিশু-মৎস্যের খেলা ;
ওপারের বন ঝাপসা হইয়া আসে।
কিছু মনে নাই, মনে আছে শুধু সীমাহীন পটভূমি,
সাঁকোর উপরে চলে আলোকিত ট্রেন।
তুমি আর আমি—তারপরে ছবি, নগরীর ধূলি-ধোঁয়া,

বালিগঞ্জের পথে ছুটে চলে ভাড়াগাড়ি একখানা,
রঙিন-শাড়ির বিজলি-ঝলক-রেখা,
অতি সুমধুর কলহাস্যের ধ্বনি,
তারপরে মনে নাই।
তবু আজো সখী, কেন নাহি জানি রয়েছি প্রতীক্ষায়,
কিশোর মনের তুমিই প্রথম প্রেম।

প্রথম প্রেমের সেই শীতল স্নিগ্ধতা কবে যে ধূমায়িত হইয়া অগ্নিদহন-জ্বালায় লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, চপলচটুল গিরি-নির্ঝরিণীই কখন যে খরমরু-বালুতাপে শুকাইয়া গিয়া নিষ্ঠুর মরীচিকার রূপ ধরিয়া অসহায় পথিককে ছলনা করিয়াছে, সে কাহিনী যেমন কৌতূহলপ্রদ তেমনই চমকপ্রদ। কিন্তু বাহিরের কৌতূহল ও চমক ছাড়াও অন্তর-গভীরে ইহারা কম সুফলপ্রদও হয় নাই—আমার কাব্যজীবন সেই ফলভারে আনত হইয়া পড়িয়াছে। আমি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছি—

ভাটায় যখন টানছে আমায়
সাতসাগরের পাকে,
জোয়ার এসে হাতছানিতে
বাঁকে বাঁকেই ডাকে।
মরণ বলে, দিন ফুরালো,
জ্বাল্ রে এবার মনের আলো;
জীবন বলে, চাঁদ উঠেছে
দেখ্ রে বনের ফাঁকে।
বিবাগী কয়, জড়াস নে আর
এ সংসারের জালে;
ভোগী দেখায়, ফুটেছে ফুল
কৃষ্ণচূড়ার ডালে।
সন্ধ্যা হ'ল সন্ধ্যা হ'ল,
হাঁকছে মরণ, তল্পি তোল;

জীবন বলে, পাত্‌ রে আবার
বাসর-শয্যাটাকে

এই ছায়ান্ধকার প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত।

বাঁকুড়া-কলেজ-হস্টেলের নোটিশবোর্ড-কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ বহুদিনের মানসিক নিষ্ক্রিয়তা-ব্যাধি যেন মায়ামন্ত্রবলে দূর হইল; যৎসামান্য খ্যাতির সুযোগও মিলিয়া গেল। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে নিদারুণ ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত উদ্বাস্তু ও উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের আর্তনাদ উঠিল—রিলিফ চাই। সমগ্র ওয়েস্‌লিয়ান মিশনরী কলেজ ভিক্ষায় বাহির হইবে, গান চাই। সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধিয়া দিলাম। প্রথম কয়েকটি লাইন মনে আছে—

ওঠ জাগো ভাই, শোন হাহাকার
ফাটিছে গগন পূব-বাংলার—
ঘরদোর গেছে, জোটে না আহার,
ডুবিল তাহারা ডুবিল।
এল কি ঝঞ্ঝা করাল ভীষণ
গৃহহারা হ'ল কত গৃহীজন……

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত থার্ড ইয়ারের শ্রীবিনয়কুমার সেন (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিবহন-সহসচিব) কর্তৃক সুর যোজিত হইল; হারমোনিয়ম সহযোগে কলেজের ফোর্থ-ইয়ার থার্ড-ইয়ারের ধাড়ী-ধাড়ী ছেলেরাও আমার সেই গান উচ্চকণ্ঠে প্র্যাকটিস করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। কলেজের প্রিন্সিপাল আর্থার এডওয়ার্ড ব্রাউন সঙ্গে চলিলেন। তিনি বাঙালীর মত বাংলা বলিতে পারিতেন। তিনিও গান ধরিলেন। সত্ত-কলেজ-প্রবিষ্ট আমি, আমার মনের বিচিত্র অনুভূতি অনুমেয়। আত্মপ্রত্যয় চট্‌ করিয়া বাড়িয়া গেল, নিজের লেখা গান উচ্চকণ্ঠে সকলের সঙ্গে গাহিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। হস্টেল-সংলগ্ন দীঘিতে সোল্লাসে সকলে মিলিয়া সাঁতার কাটিয়া স্নান করিলাম।

পূতপবিত্র মনে ঘরে আসিয়া প্রায় গীতা-ভাগবৎ পাঠের ভঙ্গিতে 'বলাকা' হইতে পাঠ করিলাম—

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—"

কিন্তু সুদূর ইউরোপের রণক্ষেত্র অথবা বাংলার প্রত্যন্ত কুমিল্লা-নোয়াখালি হইতে ভাসিয়া-আসা মৃত্যুর গর্জন নয়, এক বিচিত্র মুক্তপক্ষ ছন্দের ঝঙ্কার আমার চিত্তকে আবিষ্ট করিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের চরণে চরণে নিগড়বদ্ধ একঘেয়ে পয়ারের পর মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলমুক্ত মেঘগর্জন আমার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নাই, কারণ অতি শৈশব হইতে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত সে ছন্দ আমার অধিগত ছিল, প্রায় সহজাতও বলিতে পারি। ঈশ্বর গুপ্তের যুগের কাব্যপাঠকদের চিত্তে মধুসূদন হঠাৎ আবির্ভাবের যে চমক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতি-পরিচয়ের দরুন সে চমকভোগের সুযোগ ও অবকাশ আমাদের কালের পাঠকদের ছিল না; চৌদ্দ অক্ষরের চরণ ডিঙাইয়া আমরা অতি সহজেই ভিন্ন চরণে পদপাত করিতে শিখিয়াছিলাম, মিলও আর আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যদিও 'রাজা ও রাণী,' 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'য় মধুসূদনের নাগাল ধরিতে পারেন নাই, সুকৌশলী সেনাপতির মত তিনি চরণ-উপচানো পয়ারে মিলের বন্ধন যোজনা করিয়া "বিদায়-অভিশাপ," "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ," "গান্ধারীর আবেদন" প্রভৃতি কবিতাকে যে ভাবে ব্যূহবদ্ধ করিলেন, তাহাতে মধুসূদনের মহত্ত্বা

লওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইল; এই পদ্ধতির চরম করিয়া ছাড়িলেন 'বলাকা'য়, মিল বজায় রাখিয়া চৌদ্দ অক্ষরের খাঁচাটা তিনি ভাঙিয়া দিলেন। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবগাহন-স্নানান্তে আমি যেন সহসা ছন্দবোধের বরলাভ করিলাম। আমার কাছে—

"মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ,
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।"

অর্থের বা ভাবের দিক দিয়া এই সুবিখ্যাত পংক্তিগুলি সেদিন ততখানি পুলকের সৃষ্টি করিতে পারিল না, যতখানি করিল ছন্দের দিক দিয়া। আমি এক পরম রহস্যের সম্মুখীন হইলাম। অবিলম্বে রহস্য গভীরতর হইল 'পলাতকা'য়—যখন পড়িলাম:

"বয়স ছিল আট
পড়ার ঘরে ব'সে ব'সে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি প'ড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।"

এই আকস্মিক আবিষ্কারই আমার জীবনে অপ্রত্যাশিত বরলাভের সামিল হইল, যাহার পূর্ণ প্রকাশ 'রাজহংসে' এবং 'মানস-সরোবরে'। সূত্রপাত সেই দিন সেই সন্ধ্যায়। ছিন্ন বসনের মত লঘু মেঘখণ্ডের অন্তরাল হইতে চন্দ্রমা সেদিন নিখিল বিশ্বের মনোহরণ করিবার জন্য জ্যোৎস্নার জাল বিস্তার করিতেছিল। আমাদের হস্টেল-সংলগ্ন

দীঘির জলে তাহার প্রতিবিম্ব যে মায়া বিস্তার করিয়াছিল, বিজ্ঞানের ছাত্র হইলেও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি আমার ছিল না। সঙ্গীরা অনেকেই একে একে আড্ডা দিবার লোভে আমার ঘরে ঢুকিয়া "আমার ভাব লাগিয়াছে" দেখিয়া আমাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। আমি খাতা-পেন্সিল লইয়া লিখিতে বসিলাম। কি লিখিয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া না গেলেও আজ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই কবিতাটি সম্বন্ধে এই কথাটিই সত্য যে, একটি সুবৃহৎ রবীন্দ্র-বন্দনারূপে 'বলাকা'র ছন্দে ইহা আমার নব কাব্যাভিযানের প্রথম পদক্ষেপ—বাঁকুড়া-কলেজ-হস্টেলের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরে আমি নিভৃতে অসমসাহসিকতার সঙ্গে এই পদক্ষেপ করিয়াছিলাম ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ধাক্কায় পর-বৎসরেই বহু ছোট বড় গীতিকবিতার সঙ্গে "বর্ষাযাপন" নামক একটি দীর্ঘ গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম, ইহার কেন্দ্রগত চরিত্র কবি—আমি স্বয়ং। আমার সাহিত্য-খ্যাতি যদি কোনদিন আমার রচিত আবর্জনাকেও মূল্যবান করিয়া তুলিতে পারে, সেদিন "বর্ষাযাপনে"র রস বাঙালী পাঠক উপভোগ করিবেন। আজ তাহা যাপ্য হইয়াই থাক্।

ঠিক এই সময়েই একটি উদ্দেশ্যমূলক গীতি-নাট্য আমাকে রচনা করিতে হইয়াছিল, কলেজ-হস্টেলের এক ভোজে ডাইনিং-হলে অভিনীত হইবার জন্য। অষ্টাশি জন বোর্ডার একসঙ্গে বসিয়া খাইতে পারে এত বড় হল। অভিনেতা ও গায়ক আমরাই। হস্টেলে তখন দুই দল, প্রকাশ্যে বাচনিক এবং গোপনে চোরাগোপ্তা লড়াই চলিতেছে। বিবাদের মূল কারণ এক দল টিকিওয়ালার ছুঁৎমার্গ ও গোঁড়ামি, ডাইনিং হলেই যাহা সর্বাধিক প্রকট। আমরা উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী—দলে ভারী। নাটিকাটির নাম দিয়াছিলাম "টিকি ও টাকা"—'বলাকা'র ছন্দে ন্যারেশন বা বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে গান, গানই সংখ্যায় প্রচুর। সামান্য রিহার্সাল দিয়া আমরা

ভোজের রাত্রে প্রায় অ্যাটম বোমার মত ফাটিয়া পড়িলাম। অভিনয় ও গানের চাইতে হল্লা এত বেশি হইল যে, প্রিন্সিপাল ব্রাউন পর্যন্ত তাঁহার অদূরবর্তী কুঠি হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, হস্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্পুনার তো তৎপূর্বেই চেঁচাইয়া গালি দিয়া ঘায়েল হইয়াছিলেন। তিনি মিনমিনে মেয়েলী প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু ব্রাউন—একেবারে সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ। গাঁক গাঁক করিয়া এমন ধমক দিলেন যে, এক নিমেষে সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়া গেল, আমরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত গাণ্ডেপিণ্ডে পোলাও-মাংস সাবাড় করিয়া দিলাম, মাঝরাত্রে আবার রান্না চড়াইতে হইল।

যদিও মিস্‌ফায়ার হইয়া গেল, এই "টিকি ও টাকা" হইতেই আমি প্রথম অনুভব করিলাম যে, ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে আমি মর্মান্তিক হইতে পারি। অর্থাৎ আর একটা অস্ত্র যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ইহার প্রয়োগ যদিও আরও পাঁচ-ছয় বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'তে সার্থকভাবে শুরু হইয়াছিল, অস্ত্রটি হাতে পাওয়া মাত্র তাহাতে গোপনে গোপনে শান দিতে থাকিলাম এবং কোনও উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই আই. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া চিরদিনের জন্য বাঁকুড়া ত্যাগ করিলাম।

অষ্টম তরঙ্গ

কলিকাতা

পরীক্ষা দেওয়া এবং পাসের খবর পাইয়া কলিকাতার স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভর্তি হওয়ার মধ্যে পিতার কর্মস্থল দিনাজপুরে দীর্ঘ চারি মাসের নিশ্চিন্ত অবকাশ মিলিল। পণ্ডিত মশায়ের সেবা এবং রতনের সাহচর্য এই কালকে ভরিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সরস্বতীর শরণাপন্ন হইতে হইল। নকলে এবং ছাপায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপন্যাস অনেকগুলি অধিকারে আসিয়াছিল। দিনাজপুরের বন্ধু অবনীকান্ত বসুর (এখন মৃত) কৃপায় এইবারে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' প্রথম সংস্করণ (প্রকাশকাল যথাক্রমে ২৫ ও ২৮ জুলাই ১৯১২) আয়ত্তে আসিল। আয়ত্ত সকল অর্থে। অপূর্ব বিস্ময়-পুলকে চিত্ত ভরিয়া গেল। এতাবৎকাল মাতৃভাষায় বহু সদসৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু একজন লেখকের জীবন ও অলস চিন্তাধারা এমন সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে, তাহার আভাসমাত্রও তৎপূর্বে পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' মনে সাহিত্য-অতিরিক্ত অন্য ভাবের সঞ্চার করিত, চার্লস ল্যাম্বের আত্মগত কথার মর্মগ্রহণ তখনও পুরাপুরি করিতে পারিতাম না। 'জীবনস্মৃতিতে'ই সর্বপ্রথম দেখিতে পাইলাম, একজন সাহিত্যিকের জীবন কোরক-অবস্থা হইতে কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার ছন্দস্বরময় বাণী উন্মেষ লাভ করিয়া কেমন করিয়া লহরে লহরে সঙ্গীততরঙ্গে বিশ্বভুবন ছাইয়া ফেলিতেছে; কি তাহার আয়োজন, কত দিক হইতে কত ভাবে তাহার ক্রমপরিপুষ্টি। যে অগ্নি একদা প্রদীপ্ত তেজে প্রজ্বলিত হইবে, তাহার সমিধ্-সংগ্রহেরই বা কি বিচিত্র সাধনা। কবির অস্ফুট কলগুঞ্জনই 'কড়ি ও কোমলে' শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়া কি ভাবে অর্থময় হইয়া উঠিয়াছে—'জীবন-স্মৃতি' তাহারই অপরূপ কাহিনী; 'ছিন্নপত্র' টুকরা টুকরা কথায়

কবির অন্তর্গূঢ় জীবনের সরস ইঙ্গিত। নবরহস্যলোকের দ্বার এই দুইখানি গ্রন্থ এই সাহিত্যপথযাত্রীর মনের সম্মুখে খুলিয়া দিল। শুধু [illegible] দিক দিয়া নয়, কাগজ-ছাপাই-বাঁধাই-ছবিও অভিনবত্বের পরিচয় বহন করিয়া আনিল; বই দুইখানি আমার মন ও গ্রন্থ-ভাণ্ডারের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করিল।

কিন্তু ইহারাও আমার দীর্ঘ অবকাশ-রঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট হইল না। যৌবনের উদগ্র কামনাতুর মন তখন অন্য খাদ্যের জন্য লালায়িত। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র তারকনাথ শিবনাথ রবীন্দ্রনাথ নয়, কাব্যে মধুসূদন রঙ্গলাল বিহারীলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও নয়, মহাজনপদাবলী মঙ্গলকাব্য ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তও নয়,—আরও কিছু, অন্য কিছু। হুতোমের 'নক্শা' পড়া হইয়া গিয়াছে, দীনবন্ধুও পড়িয়াছি, 'কামিনীকুমার' 'চন্দ্রনাথ'ও পড়া; 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' 'মডেল-ভগিনী' 'এই এক নূতন' এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র মধ্যেও আর রস পাই না, বটতলার 'চুম্বনে খুন', 'বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন'ও নীরস মনে হয়—এই অবস্থায় বিলাতী বটতলার দিকে স্বতই লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। সন্ধানী উপদেষ্টারও অভাব হইল না। রেনল্ডস্-এর 'মিস্ট্রিজ' হইতে আরম্ভ করিয়া কত যে কদর্য কাগজে ও খুদে-খুদে হরফে প্যারিস-মাদ্রাজ-লাহোর-চন্দননগর হইতে ছাপা বই পড়িলাম, তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া এ যুগের মার্ক্স-মুগ্ধ তরুণদের মাথা খাইব না। মোটের উপর, দুষ্টা সরস্বতীর কৃপায় ছাপার অক্ষরের পথে 'অনঙ্গ-রঙ্গে' পারঙ্গম হইয়া উঠিলাম। আমার বাণী-সাধনার তিন নম্বর খাতা আগাগোড়া আষ্টেপৃষ্ঠে নানা ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতায় এই কালের আদর্শ-বিপর্যয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। নমুনা-স্বরূপ একটি বড় কবিতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমার মনের সেই সময়কার অবস্থাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এই কথা যদি আজ বলি, সেই সময় আমার সহচারী এবং পরে কলিকাতায়

আমার সহাধ্যায়ী ও সহবাসী হস্টেল-বন্ধুরা এবং আরও পরবর্তী কালে মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা এই আদিরসাত্মক কবিতাটিকে সবিশেষ তারিফ করিয়াছিলেন, আশা করি আমার অহমিকাকে সহৃদয় পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। কবিতাটি অতিশয় দীর্ঘ, আমার হাতের লেখায় নয় পাতা, সমগ্রটি আইনের চোখে নিরাপদও নহে। কয়েক পংক্তি তুলিয়া দিলেই ভাষা ও ছন্দে আমার ক্রমোন্নতির কথঞ্চিৎ পরিচয় সম্ভবত মিলিবে :

কলস কাঁখে বকুলবীথির পথে
বধূ যেথায় আনতে চলে জল,
সাঁঝের কোলে রয় না কেহ সেথা,
আঁধার বিজন বকুলগাছের তল।
আমি রহি সেই আঁধারের মাঝে
দেখি বধূ আপন মনে চলে
ঘোমটা মুখে দেয় না সে তো লাজে
কলসখানি ভাসায় দীঘির জলে।
বসে গিয়ে বাঁধাঘাটের 'পরে,
আঁচল পড়ে জলের তলে লুটি,
বুকের পিঠের কাপড় পড়ে খ'সে,
যত্নে মাজে ছোট্ট চরণ দুটি।
আঁধার হতে বাহির হয়ে এসে
আমি ধীরে দাঁড়াই ঘাটের পাশে ;
বধূ করে আপন মনে গান,
কলসীটি তার দীঘির জলে ভাসে।
একটি চরণ স্বচ্ছ জলতলে
জানুর 'পরে আরেকটি পা তুলে
গামছা ল'য়ে ঘষে আপন মনে,
বিশ্বজগৎ সব গেছে সে ভুলে।
কেশের রাশি বাঁধা মাথার 'পর,
স্রস্ত হয়ে বুকের আবরণ

কটিতটে লুটিয়ে এসে পড়ে,
নিরাবরণ দুইটি শ্রীচরণ।
সাঁঝের বাতাস বইতেছিল ধীরে,
কলসীটি তাই ঢেউয়ের তালে নাচে,
বকুল-ডালে একটি কোকিল শুধু
ডেকে কেবল প্রিয়ার দেখা যাচে।
আমি হঠাৎ শুধাই, "ওগো বধূ,
খুলে ফেল তোমার কেশপাশ,
দেহের বসন যাক না গেছে স'রে,
চুল এলিয়ে কর গায়ের বাস।"
চমকে উঠে লজ্জা পেয়ে বধূ
জলের মাঝে চকিতে দেয় ঝাঁপ,
পাষাণঘাটে বসন মরে কেঁদে,
কাটল বুঝি জলের মনস্তাপ!
আবার বলি, "লজ্জা তোমার কেন,
আঁধার দেখ এল নিবিড় হয়ে,
হেরি শুধু চোখের আলো তব—
তাতে তোমার কিই বা গেল ব'য়ে!"
বধূ তখন ক্ষণিক হেসে কয়,
পূবগগনে মৃণাল বাহু তুলে,
"জ্যোৎস্না উঠে আঁধার হবে ক্ষয়
এ কথা কি গেছই তুমি ভুলে?
থেকো না আর ঘাটের পথ জুড়ে,
পথিক, তুমি যাও না আপন কাজে,
রাত্রি ক্রমে ঘনিয়ে আসে ওই
যেতে হবে বকুলবনের মাঝে।"

ইহার পর আরও অনেক আছে, কিন্তু আর নয়; ছন্দ আর কাব্যকৌশল অনুমান করিতে না পারিলেও রসিকজন এই "বকুলবন" কবিতার বিষয়-বস্তু সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন

এবং তাহা হইতে আমার তৎকালীন অজ্ঞাতকান্তাবিরহী মনের সকরুণ গুরুবেদনা অনুভব করিবেন।

এই অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ বেদনা লইয়া পাঠ্য-জীবনের শেষকালটুকু যাপন করিবার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করিলাম। ডাকযোগে স্কটিশ চার্চেস কলেজে তৎপূর্বেই ভর্তি হইয়াছিলাম। আসিয়া পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হইল, সুতরাং টমরি-অগিল্‌ভি-ওয়ান-ডান্‌ডাস প্রভৃতি সাধারণ হস্টেলগুলিতে স্থান হইল না; খ্রীষ্টীয়ান-ছাত্র-অধ্যুষিত অগতির গতি ডাফ হস্টেলই আমাকে আশ্রয় দিল। সেকালের ডাফ হস্টেল একটা বিরাট দৈত্যের মত বিডন স্ট্রীটের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রাসাদোপম অট্টালিকা তেমনই আছে, কিন্তু সামনে-পিছনে নূতন সংযোজনের ফলে ইহার ভয়াবহতা অনেকখানি দূর হইয়াছে। আমি দিনাজপুর হইতে মনসিজ-লাঞ্ছিত সরস সাহিত্যে পঙ্ক-স্নান করিয়া শুষ্ক ও তৃষিত ক্ষুধিত মাশুল-কালেক্টরের মত পাষাণনগরীর বেগম-বাদশাজাদীদের চটুলচপল হাসি নয়—ভূতের অট্টহাস্যমুখর সেই বিপুলায়তন হর্ম্যের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলাম। যে ঘরে আমাকে থাকিতে দেওয়া হইল, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় তাহাকে বিরাট বলা চলে, পাশা-পাশি পাতা চৌকিতে আমরা কয়েকজন শয়ন করিতাম। আমাদের একজন একদিন নিশীথ রাত্রে ভূত দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—মেয়ে-ভূত। কড়িকাঠে গলায় দড়িবাঁধা অবস্থায় সে নাকি ঝুলিতেছিল। আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রীমজার সাহেব সংবাদ পাইলেন, আমাদের নিত্যখাদ্যভাগাপহারক তাঁহার সহকারী হেলিতে-দুলিতে অবিলম্বে দর্শন দিলেন। পুরাতন ইতিহাস শুনিতে শুনিতে আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বহুদিন পূর্বে উহা মেয়েদের বোর্ডিং ছিল। এক হতভাগিনী প্রেমে ব্যর্থ হইয়া ওই ভাবে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে। সে-ই মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। ভয় পাইবার কিছু

নাই। নানা অজুহাত দেখাইয়া এক এক করিয়া আমার নির্ভীক কক্ষসঙ্গীরা কক্ষান্তরে যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত আমি একা সেই পেল্লায় ঘরে রহিয়া গেলাম। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বহুদিন অন্ধকারে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া ভূত দেখিবার প্রবল চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু একদিন একটি কালো বিড়াল ছাড়া ভয় পাইবার মত আর কিছু প্রত্যক্ষ করি নাই। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরেই পরবর্তী কালে ভূতবিশ্বাসী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া প্রবল তর্ক করিয়াছি; বলিয়াছি, তেমন সুবর্ণ-সুযোগে যে-প্রেমাতুরা আমাকে একা পাইয়াও দেখা দেয় নাই তাহার জন্ম অলস এবং ভীত মানুষের কল্পনা হইতে। বিভূতিভূষণ ঘোরতর আপত্তি করিতেন, আমাদের আসর জমিয়া উঠিত। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

সেই প্রাচীন ইষ্টকপ্রাসাদ যে এই ক্ষুধিত-পাষাণবৎ তরুণটিকে এমনিই নিষ্কৃতি দিল তাহা নয়। ডাফ হস্টেলের পূর্বার্ধে আমরা থাকিতাম। পশ্চিমার্ধের দ্বিতল দীর্ঘকাল হইতেই তালাবদ্ধ ছিল। কলেজেরই একজন সাহেব অধ্যাপক প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিতে গিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই। তাঁহার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সেই দ্বিতলে রক্ষিত ছিল। একেলা দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে পার্টিশনের পরপারে দ্বিতলের ঘরগুলি সম্বন্ধে মনে উগ্র কৌতূহল জাগিত। কি আছে সেখানে, কি যে রহস্য সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে জানিতে হইবে। রহস্যভেদ করিব। একদিন নির্জনতার সুযোগ লইয়া রেলিং টপকাইয়া রহস্যলোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। খড়খড়ির ফাঁক দিয়া হাত গলাইয়া ছিটকিনি খুলিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। হঠাৎ যে ধূলিজঞ্জালের মধ্যে গিয়া পড়িলাম তাহার ধাক্কা সামলাইতেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, অধ্যাপকটি অবিবাহিত ছিলেন। তাহার প্রমাণ মিলিল আসবাবের

অপ্রতুলতা দেখিয়া। ধূলিমলিন খানকয়েক বই, একটি বেতের বাক্সে কিছু কাগজপত্র, ফুটবল খেলার বুট, একান্ত পুরুষের ব্যবহার্য টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস। রহস্যের কণামাত্র বাহিরের কোথাও নাই—বহুদিনের পুরাতন অসংস্কৃত ধূলিজঞ্জাল ছাড়া। ধূলির আবরণ সরাইয়া বইগুলি দেখিতে দেখিতে চারি খণ্ডে সমাপ্ত রল্যাঁর 'জন ক্রিস্টোফার' আবিষ্কৃত হইল। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিব, অলস কৌতূহলবশে বেতের বাক্সটি একবার খুলিয়া দেখিলাম। প্রথমেই অতি চমৎকার সিল্কের ফিতায় বাঁধা একতাড়া চিঠি নজরে পড়িল, সেগুলি তুলিয়া লইতেই কয়েকটি ফোটোগ্রাফ ও এক্সমাস গ্রীটিংস কার্ড, প্রত্যেকটিতে পরিষ্কার নারী-হস্তাক্ষরে একটি ইউরোপীয় রমণীর সুমধুর সংক্ষিপ্ত নাম। দেওয়ালের অপর পার হইতে এতকাল যে রহস্যের আভাস পাইতেছিলাম, সহসা তাহার সহিত মুখামুখি হইয়া গেল। স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া চিঠিগুলি পড়িতে বসিলাম।

আমার সদ্য-অধীত 'মিস্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লণ্ডন'-এর লেখক রেনল্ডস্ ইংলণ্ডের কোনও শহরের পোস্টমাস্টার ছিলেন এইরূপ শুনিয়াছিলাম; সন্দেহজনক যাবতীয় চিঠিপত্রের রহস্য বেআইনী ভাবে ভেদ করিয়া তিনি তাঁহার গল্প-উপন্যাসের রসদ সংগ্রহ করিতেন; কি জাতীয় চিঠিপত্র সচরাচর তাঁহার ভাগ্যে জুটিত তাহার মোটামুটি আভাস তাঁহার রহস্য-গ্রন্থগুলিতেই পাওয়া যায়। তাঁহার পোস্ট-অফিসকে মধ্যস্থ রাখিয়া যাঁহারা হৃদয়ের কারবার চালাইতেন তাঁহারা নূতন মহাদেশের নূতন মানুষ, আপাতত সভ্য হইলেও রক্তে মাংসে গড়া অতি জীবন্ত দেহসচেতন জীব, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে আনিলেও স্বভাবসুলভ দেহধর্মকে প্রাচ্যবাসীর মত বুদ্ধ-প্রভাবিত নিবৃত্তিমার্গে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। সুতরাং রেনল্ডস্‌কে কখনও গরম-মসল্লাদার উপকরণের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। আমিও সেই-দেশীয় এবং সেই-

জাতীয় একজন স্বাধিকারপ্রমত্তা কুমারীর প্রেমপত্র ঘাঁটিতেছিলাম, উত্তাপে আমার হাত পুড়িয়া গেল, দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কয়েকটি পত্র এখনও আমার সংগ্রহে আছে। সর্বাপেক্ষা নির্দোষ অংশ যাহা উদ্ধৃত করিতে পারি, তাহা হইতেছে এই :

> "Can you imagine me sitting at a small table in the bedroom in my nightgown and my hair down and my bare feet halfway in slippers writing to my darling little love in old Calcutta ? Why aren't you here now to kiss and cuddle me and to hold me as tight as possible to you, so that our lips meet, our chests, our knees and our feet. Would there be space for my old nightgown ? And your pyjamas ?"

বেতের বাক্সটি এবং চার খণ্ড 'জন ক্রিস্টোফার'সহ পলাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। সেই উদগ্র কামনা-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া শেষ পর্বে একটি সকরুণ বিচ্ছেদ-কাহিনী আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আঘাত দিল। মহাযুদ্ধের তরঙ্গাভিঘাতে একটি পরিপূর্ণ আকাশ-প্রাসাদ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। আমি রেনল্ডসের মত উদ্যোগী হইলে এই পত্রগুলির সাহায্যে একটি মনোরম কাহিনী রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতাম। আমার দুর্ভাগ্যবশে এগুলি সুফলপ্রসূ হইল না, আমার দেহটাকে নাড়া দিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া দুমড়াইয়া একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এই বিপর্যয় আমাকে প্রায় সর্বনাশের মুখামুখি আনিয়া ফেলিল।

ঠিক এই সময়ে একদিন টেবিলে আহার্য-পরিবেশনের ব্যাপার লইয়া হস্টেলের মুসলমান 'বয়'কে বেদম প্রহার করিয়া বসিলাম। মামলা খোদ প্রিন্সিপাল ওয়াট সাহেবের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিল, এবং আমি নিরুপদ্রব আশ্রম-সদৃশ ডাফ হস্টেলকে নিষ্কৃতি দিয়া সেখানকার ভয়াবহ নির্জনতা-প্রসূত কামনাকূপ হইতে নিজেও নিস্তার পাইলাম। অগিলভি হস্টেলের সুস্থ স্বাভাবিক কোলাহলমুখর যৌবনচঞ্চল পরিবেশে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। 'জন ক্রিস্টোফার'

আমাকে দূরবিসর্পী পথের সন্ধান দিল ; গোপাল হালদার, পরিমল রায় (এক নং ও দুই নং), বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত সরকার, গিরিধর চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র ঘোষ, অনুকূল লাহিড়ী, উপেন্দ্র রায়, সুধানলিনীকান্ত দে প্রভৃতি সহবাসী বন্ধুজন তাঁহাদের সাহিত্য-মজলিসে স্থান দিয়া পথভ্রষ্টকে আবার পথের সন্ধান দিলেন।

ডাফ হস্টেলের নিষিদ্ধ দুর্গে রক্ষিত বেতের পেটিকার অভ্যন্তরে সেই দিন যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের হঠাৎ অধঃপাতের কারণ বুঝিতে তাহা আমার সহায়ক হইয়াছিল। জেম্‌স্‌ জয়েস, ডি. এইচ. লরেন্স, আল্‌ডুস হাক্সলি, কামিংস, স্পেণ্ডার, অডেন প্রভৃতি নব্যপন্থী সাহিত্যিকেরা দেহধর্মের বিকৃতিকে প্রাধান্য দিয়া পরবর্তী কালে যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে তৎপর হইয়াছিলেন, তাহার আদিম প্রেরণার সন্ধান আমি অত্যাশ্চর্যভাবে পাইয়াছিলাম। পশ্চিমের বুভুক্ষু মানবীদের নিদারুণ অতৃপ্তিজনিত লালসার উদগ্রতা-বৃদ্ধি এবং যুদ্ধসংক্রান্ত নানা বিক্ষোভে ও বিক্ষেপে পৌরুষের শোচনীয় পতন—ইহাই নানা ভাবে এই কালে ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কন্টিনেণ্টেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ঘটে নাই। স্যানিন, ব্রেকিং পয়েণ্ট, এ রুম ইন বার্লিন, উওম্যান অ্যাণ্ড মঙ্ক প্রভৃতি পুস্তকে ইউরোপের এই অধঃপতনের পরিচয় মিলিবে। মোটের উপর মহাযুদ্ধসঞ্জাত যে ভয়াবহ মহামারী ব্যাধি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল, তাহার প্রারম্ভিক সূচনা আমি পত্রাকারে দেখিয়া শুধু লুব্ধ হই নাই, আতঙ্কিতও হইয়াছিলাম। শোচনীয় পরিণাম হইতে আমাকে অংশত রক্ষা করিলেন মনীষী রম্যা রলঁ্যা 'জন ক্রিস্টোফারে'র গঙ্গাস্নান করাইয়া, অংশত রক্ষা করিলেন অগিল্‌ভি হস্টেলের সাহিত্যরসিক বন্ধুরা, এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ।

ইতিমধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় (ভাদ্র ১৩২৭) কলিকাতার

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিল। সত্যেনের সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের যুবকদের সঙ্গে তখন আমি একাত্ম হইয়াছি। ওয়েলিংটন স্কোয়ার অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রধানত সে-যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীরা লাভ করিলেও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। জ্যোতির্ময়ী গাঙুলীর নেতৃত্বে মহিলা-বিভাগের তদ্বির-তদারকের কাজে আমিও নিযুক্ত হইলাম। আমি মফস্বল হইতে সদ্য আগত এবং কলিকাতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক সাধারণ ছাত্র মাত্র। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেবকের কাজের সুযোগ লাভ করিয়া আমি সপ্তাহকালের মধ্যেই শুধু রাজনৈতিক মহলেই নয়, তদানীন্তন কলিকাতার অভিজাত ও বিদগ্ধ মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়া উঠিলাম। মহাত্মা গান্ধী, অ্যানি বেসান্ট, চিত্তরঞ্জন দাশ ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ দেশনেতাদের সেবা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক সভাবহির্ভূত রূপ দেখিলাম, স্বেচ্ছাসেবক-নেতা-উপনেতাদের ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি এবং গোপন ও প্রকাশ্য প্রেমের দ্বন্দ্বে অশোভন ঈর্ষা-হানাহানি দেখিলাম, অতি সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া কার্যক্ষেত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে বিশেষ ও অসাধারণ হইয়া উঠিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম; মোটের উপর সেই সাত দিনের মধ্যেই সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আমি লায়েক হইয়া উঠিলাম। কলিকাতা-মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বাহিরের লোক হইয়াও আমি যাহা দেখিবার ও শুনিবার সুযোগ পাইলাম, বাহিরের ছেলেদের কদাচিৎ সে সুযোগ ঘটে। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গেল। একটা মহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার গর্ব লইয়া আমি আবার হস্টেলের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলাম, ঠিক আবুহোসেনের মত। হস্টেলের বন্ধুদের কয়েকদিন অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মনে হইল আমার বাদশাহী ন্যায্য আসন হইতে কে যেন আমাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া

পথে বসাইয়া দিল। কয়েক দিন খুব মনমরা হইয়া রহিলাম। যখন আবার আত্মস্থ হইয়া কাছের মানুষদের বন্ধু ও প্রিয়জন বলিয়া চিনিতে পারিলাম, তখন ডাক হস্টেলের ভূত আমার কাঁধ হইতে সম্পূর্ণ নামিয়া গিয়াছে, অলস মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা চূরমার হইয়াছে এবং আমি আবার সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারিয়াছি। ঠিক সেই অবস্থায় একটা নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততাও মনের মধ্যে যে অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ একটি চতুর্দশপদী কবিতায় রক্ষিত আছে দেখিতেছি। আমি সেই মুহূর্তে আর পথের ধুলার, হাটের কোলাহলের মানুষ নই—উচ্চ বাতায়ন হইতে বিশাল সংসারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি :

বাতায়নিক

সংসারের বহু ঊর্ধ্বে বাতায়ন হতে
বিশাল সংসার পানে শান্ত চক্ষে চাহি—
দেখি চলে মানব-প্রবাহ কত মতে
কত পথে, কোথাও বিরাম তার নাহি।
দলিয়া পিষিয়া এরা চলে পরস্পরে,
যন্ত্রণার আর্তস্বর ঢাকে কলরব—
নাহি শান্তি শ্রান্ত-ক্লান্ত বিশ্বচরাচরে
বন্ধনের বেদনায় ব্যথিত মানব।
স্বার্থের জঞ্জালে বদ্ধ পথ দেবতার,
খর্ব ক্ষুদ্র আজ প্রেম স্নেহ ভালবাসা—
প্রতিঘাতে খুলিবে কি হৃদয়ের দ্বার,
রুদ্ধবায়ু প্রবাহিয়া দিবে কভু আশা ?
মুক্তির আশায় আজ ধরা কম্পমান,
বেদনা-বন্ধন হতে লভিবে কি ত্রাণ ?

দেখিতে দেখিতে ১৯২১ আসিয়া গেল। কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং তিন মাস পরে ডিসেম্বরের শেষে (পৌষ

১৩২৭) নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর যে অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাকে কার্যকরী রূপ দিবার জন্য তোড়জোড় চলিতে লাগিল। আমি তখন সংস্পর্শ-সঞ্জাত উচ্চপদবী-আরূঢ়, অন্তরে অন্তরে নেতৃত্বের মহড়া দিতেছি। কলেজের পড়াশুনা প্রায় শিকায় উঠিয়াছে। দুষ্টামি বুদ্ধির নিত্য নব নব উদ্ভাবনা কলেজে পরীক্ষিত হইতেছে। কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আর কিছু লাভ না হউক, নারী সম্বন্ধে মফস্বলের ছেলের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও সমীহা ছিল তাহা দূর হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে স্বতই আর মাথা নত হয় না, বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসে না; যথেষ্ট সাহস লাভ করিয়াছি, তাহাদের মুখামুখি দাঁড়াইয়া চটপট উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে পারি, চপল-চটুলতা প্রকাশেও বাধে না। আমাদের সময়েই সর্বপ্রথম স্কটিশ চার্চেস কলেজে ছাত্রী-সমাগম আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে সিটি ও অন্যান্য কলেজে অধ্যাপকদের অন্তরালে খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম-ছাত্রীরা কিছুদিন পড়িয়াছিলেন, শুনিয়াছিলাম। তাহার পর আমাদের সময়েই কলিকাতার কলেজের ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। আমাদের বি. এস-সি. ক্লাসে অঙ্কে অনার্স লইয়া একজন—বর্মী মাতা ও বাঙালী পিতার সন্তান, এবং আই. এ. ক্লাসে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—দুইজন ছাত্রীকে লইয়া পাঁচ শত তরুণের কৌতূহল-কৌতুকপূর্ণ মাতামাতি শুরু হইল। অর্ধবর্মিনী অতিশয় শান্ত ধীর প্রকৃতির, তাঁহার সহাস্য ধৈর্যের কাছে আমরা পরাজিত হইলাম। বেচারা ইঙ্গ-ভারতীয়া হইল সারা কলেজের টার্গেট। তখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় কক্ষবদলের রীতি ছিল, কোনও নির্দিষ্ট কক্ষে একই শ্রেণীর বরাবর ক্লাস বসিত না। উক্ত মেয়েটির জন্য কলেজের যাবতীয় ছাত্র রুটিন মুখস্থ করিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে লইয়া একটা গান বাঁধিয়া বসিলাম। কেমিস্ট্রি ক্লাসে অধ্যাপক বরুণ দত্তের উদারতার সুযোগ লইয়া হাতে হাতে দশ-বারোটি নকল হইয়া গেল। ল্যাবরেটরি ঘরে সুর যোজনা ও

প্র্যাকটিস হইল এবং অকস্মাৎ অপরাহ্নে একটি সঙ্কটত্রাণ-ধাঁচের গানের শোভাযাত্রা ক্লাস-পরিবর্তনশীলা বেণী-দোলানো মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারা হেহুয়া অঞ্চল সচকিত করিয়া দিল। গানটির প্রথমাংশ মনে আছে।—

হঠাৎ আমি বাইরে এসে অবাক চোখে চাহি,
সে যে চমক দিয়ে চ'লে গেল
আমার চোখে নিমেষ নাহি।
দুলিয়ে বেণী চলে আমার আগে
কি ভাব আহা, বুকের মাঝে জাগে
ও তার পায়ে চলার তালে তালে
উঠিনু গান গাহি।

কলেজ তোলপাড়। দেখিতে দেখিতে হোঁৎকা ওয়াট, সুচতুর ধীর স্থির আরকুহার্ট, চুলবুলে কিড্ বড় বাড়ির সিঁড়ির উপরে এবং বিজ্ঞান বিভাগের দ্বারপথে ছাত্রসূদন নিবারণ রায় গরগর করিতে করিতে দর্শন দিলেন। আমরা কয়েক জন বমাল গ্রেপ্তার হইয়া ফিজিক্স থিয়েটারে নীত হইলাম। "কে লিখেছে, কে লিখেছে" এ প্রশ্নের উত্তর নিবারণবাবু পাইলেন না। তিনি গোটা ক্লাসটাকেই এক টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া ছাড়িলেন। সেখান হইতে কেমিস্ট্রি ক্লাসে ঢুকিতে যাইব, বরুণ দত্ত আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন, শয়তান, এ তোর কাজ; যা, বেশ করেছিস। আমাদের সেই ভক্তিভাজন সুরসিক সহৃদয় অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর যেন আজও শুনিতে পাইতেছি।

এই সহশিক্ষা-ঘটিত সহযোগ আন্দোলনের জের মিটিতে না মিটিতে নূতন ইংরেজী বৎসরের গোড়া হইতেই অসহযোগের প্রবল বন্যায় কলিকাতার ছাত্রসমাজ ভাসিয়া গেল। আমাদের কলেজের পিকেটিং ইত্যাদির ভার আমি গ্রহণ করিলাম। প্রিন্সিপাল ওয়াটের সঙ্গে ইহা লইয়া একদিন গুঁতাগুঁতি করিয়া এমনই মিথ্যা

সোরগোল তুলিলাম যে, সুযোগ বুঝিয়া দেশবন্ধু সি. আর. দাশ হেত্থ্যায় ছুটিয়া আসিয়া সভা করিলেন, সংবাদপত্রে ওয়াট সাহেব কর্তৃক "ইন্‌ডিস্‌ক্রিমিনেট কিকিং"এর সংবাদ বিঘোষিত হইল। সেন্‌ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বেঞ্চে বসিয়া কালো চশমা আঁটা চোখে আমাদের মুখে সে কাহিনী শুনিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, পরের মাসের 'প্রবাসী'তে তাঁহার কটূক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ কবিতা "কোনও ধর্ম্মধ্বজীর প্রতি" (ফাল্গুন ১৩২৭) বাহির হইয়া নির্দোষ ওয়াটকে সারা বাংলা দেশে নিন্দিত ও ধিক্কৃত করিয়া দিল।

ইহারই কিছুকাল পরে বন্ধুবর গোপাল হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় হাতের লেখা 'অগিল্‌ভি হস্টেল ম্যাগাজিনে'র একটি সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন চলিয়াছিল। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে দিয়া পাঁচ-পাঁচটি কবিতা লিখাইলেন, তন্মধ্যে একটি মহাত্মা গান্ধীর উপর ও একটি রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা কবিতাটি শেষ পর্যন্ত হাতের লেখা পত্রিকার পৃষ্ঠা উপচাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিল, এবং আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য অর্জন করিলাম।

নবম তরঙ্গ

বোলপুর

অসহযোগ-মন্দাকিনীর প্রথম বন্যা যেমন প্রবল তোড়ে কলিকাতার ছাত্রসমাজকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ঠিক তেমনই প্রবল তোড়ে তাহা নামিয়াও গেল ; ঐরাবতরা একে একে আত্মস্থ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-যূথও। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ-বিরোধী সি. আর. দাশ মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন ও মাসিক অর্ধ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যারিস্টারি বিসর্জন করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইয়া বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যে বিপর্যয় আনিয়াছিলেন, জাতীয় শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নেতৃবৃন্দ তদুপযুক্ত তৎপর হইতে না পারিয়া অসহযোগী ছাত্রদের সহযোগিতা হারাইলেন। কলিকাতায় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সুদূর আমেরিকা-ইউরোপের প্রবাসবাস হইতে রবীন্দ্রনাথ বারংবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরোধিতা আত্মঘাততুল্য ; হে ছাত্রগণ, বাহির বিশ্বের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কূপমণ্ডূক হইও না ; আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠুক তবে তোমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্জন করিও, ইত্যাদি। চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বপ্রান্তে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন পার্কে ও স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি নেতারা বেকার ছাত্রদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হইয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। আমরা কয়েক জন একদিন চিত্তরঞ্জনের গৃহে তাঁহাকে গিয়া ধরিলাম, নূতন শিক্ষাব্যবস্থা চাই। সেখানে সেদিন বিপিনচন্দ্র ও সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ উপস্থিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্পষ্ট রূঢ়ভাবে বলিলেন, শিক্ষা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ পারে না। তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, আমি কাল কি খাইব জানি না, তবু বৃত্তি ছাড়িতে দ্বিধা

করি নাই; তোমরাও বৈদেশিক শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া বৎসর খানেক ধীর ও স্থির থাকিলে স্বরাজ অবশ্যম্ভাবী, এবং তখন স্বদেশী শিক্ষাপদ্ধতির চমৎকার ব্যবস্থা হইবেই। অধিকাংশ ছাত্রই এই ফাঁকা কথায় স্থির থাকিতে পারিল না, প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মুখেই নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইয়া প্রায় সকলেই একে একে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। আমিও করিলাম। যে কয়েক জন দৃঢ়চিত্ত যুবক মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-মন্ত্রকে গুরু-মন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিল না। সংখ্যায় তাহারা কম নয়।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রত্যাবর্তনের পালা শেষ হইল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাৎ সার্ আশুতোষের সাময়িক দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গেল; নিয়মিত স্কুল কলেজ চলিতে লাগিল। ক্লাস প্রমোশনের জন্য এপ্রিল মাসেই আমাদের একটা বার্ষিক পরীক্ষা হইল; অধ্যক্ষ ওয়াট বিদ্রোহী নেতাকে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই আমাকে পরীক্ষায় বসিতে দিবেন না। শেষ পর্যন্ত আমাদের হস্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জে. সি. কিড্ ও কেমিস্ট্রির অধ্যাপক আমার এখন-পর্যন্ত ভক্তিভাজন শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিপদ উত্তীর্ণ হইলাম। আসলে ওয়াট সাহেব নিজেও অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলেন, কাহারও ক্ষতি করিতে চাহিতেন না।

গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। অসহযোগ পরিত্যাগের গ্লানি কাটাইবার জন্য আমরা হস্টেলের সকলেই মফস্বলে স্থান পরিবর্তনে গেলাম। বস্তুত, অসহযোগকে একটা পবিত্র মহদ্ধর্মরূপে ছাত্র-সমাজ প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ধর্মত্যাগের গ্লানি প্রত্যেকের অন্তরেই ছিল। জুলাই মাসে কলেজ খুলিতে আবার সকলে যখন সমবেত হইলাম, গ্লানিহীন নিরাবিল আনন্দে অকস্মাৎ বাধা পড়িল—দার্জিলিঙে মিসেস কিডের অকালমৃত্যু-সংবাদে। পত্নীহারা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

কিড্ অত্যন্ত অভিভূত ও বিচলিত হইয়া আর বিদেশে থাকিতে চাহিলেন না, ২০এ আগস্ট (১৯২১) আমরা তাঁহাকে একটা গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে চিরবিদায় দিলাম। আমাদের স্নেহশীল বিদেশী অভিভাবক অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে স্কটল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে আমাদের অভিভাবক হইলেন তরুণ মিঃ ডি. টি. এইচ. ম্যাক্‌লেলান। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ-ফেরত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সাহিত্য ব্যাপারে অতিশয় উৎসাহী, তাঁহারই উদ্দীপনায় সুধা-নলিনীকান্ত দে, গোপাল হালদার, বিমলাকান্ত সরকার, সুধেন্দু-মোহন ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, শৈলেশ কর, যতীন্দ্রনাথ দত্ত (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গম্ভীরানন্দ) ও আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। অগিল্‌ভি-হস্টেল-ম্যাগাজিন দীর্ঘকাল বাহির হয় নাই, ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত কয়েকটি সংখ্যার প্রকাশ পুরাতন ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সপ্তম খণ্ডের (১৯২১) প্রথম সংখ্যা প্রকাশের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনে ভারতীয় রাষ্ট্র-নীতিতে এবং বাংলা-সাহিত্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে অতিশয় শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ইয়োরোপ যাত্রা করেন। অমৃতসর-জালিয়ানওয়ালাবাগের হাঙ্গামা তখন থিতাইয়া আসিয়াছে, নাইটহুড ত্যাগ করিয়া সম্রাটকে তিনি যে অপমান করিয়াছিলেন (১৯১৯) তাহার জের ইংলণ্ডে একটু আধটু থাকিলেও এ দেশে আর নাই। কিন্তু কবির বিদেশে অবস্থানকালেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়া হইতে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগতত্ত্ব সারা ভারতবর্ষে তোলপাড় তুলিল, ঢেউ গিয়া নিখিল বিশ্বের সহযোগকামী, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে বিশ্বের বিবুধমণ্ডলীর আমন্ত্রণবাহী রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করিল। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠারূপ সুমহৎ কার্যের প্রাক্কালেই এই জাতিগত বাধার আশঙ্কায়

রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরে অসহযোগকে কার্যকরী করার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই তাহা উত্তাল হইয়া সমগ্র দেশকে গ্রাস করিল। সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ ও বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদলাভে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাভূমি শান্তিনিকেতনেই অসহযোগ প্রবল আকারে দেখা দিল। দূর হইতে প্রেরিত সত্য-মিথ্যা নানা খবরে বিচলিত, বিরক্ত ও বিব্রত রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিরোধ পূর্বে ও পশ্চিমে ঘনাইয়া উঠিতেছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি আশ্রমে ফিরিয়াই "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১১ই আগস্ট কলিকাতায় আসিলেন।

তখন পর্যন্ত, আমার জীবনে কাব্য ও সাহিত্য অনুভূতির উদ্বোধক, আমার শৈশব-কৈশোরের পরম বিস্ময় "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ও 'কথা ও কাহিনী'র কবি, আমার যৌবন-প্রারম্ভের ধ্যান ও জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সেই শুভদিন অকস্মাৎ সমাগত ভাবিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম। ১৫ই আগস্ট—৩০এ শ্রাবণ কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি স্বয়ং "শিক্ষার মিলন" পাঠ করিবেন—এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইল। কিন্তু আমার আন্তরিক চেষ্টা ও প্রভূত কায়িক উদ্যম সত্ত্বেও যাহা হইবার নয় তাহা ঘটিল না, নিদারুণ ভিড়ের চাপে বিপর্যস্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের দর্শন না পাইয়াই হস্টেলে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার জন্ম ভাদ্র মাসে। আমি বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, আমার জীবনের গণনীয় ও স্মরণীয় যাবতীয় ব্যাপার এই ভাদ্র মাসেই ঘটিয়া থাকে। পরে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সংযোগ এই মাসেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং অদম্য ইচ্ছা

লইয়াও রবীন্দ্র-সন্দর্শনের জন্য সেই ভাদ্র মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। সুযোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত বিরোধিতা লইয়া তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ; হস্টেলে মেসে সর্বত্রই দুই দল। অগিল্‌ভি হস্টেলে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শিবদাস রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কল্যাণে আমরা অসহযোগের পলাতক ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে রাবীন্দ্রিক ছিলাম। বিদেশ হইতে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকামী আমাদের কয়েক জনের আগ্রহাতিশয্যে শিবদাস অচিরাৎ সে ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল; শান্তিনিকেতন আশ্রম দলের সহিত অগিল্‌ভি হস্টেল দলের ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হইয়া গেল, ভাদ্র মাসে শান্তি-নিকেতনে। শান্তিনিকেতন আমার পৈতৃক নিবাস রাইপুরের সন্নিকট, রাইপুরেরই ভুবনমোহন সিংহের নামাঙ্কিত ভুবনডাঙার উপর অবস্থিত, সুতরাং আমার স্বদেশেই বিশ্বের মহাকবির সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার অসীম সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক।

আমি কোনকালেই খেলায় দড় ছিলাম না, তবু বারীন ঘোষেদের মানিকতলার বোমার আড্ডার পাশেই অবস্থিত স্কটিশ চার্চ কলেজের মাঠে হস্টেলের দলে ভিড়িয়া ফুটবল ও হকি খেলিতাম। এইটুকুই মূলধন, কিন্তু আসলে ইহা খেলার অভিযান ছিল না, সাহিত্য-তীর্থযাত্রাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২১, সেপ্টেম্বরের শেষে প্রকাশিত হস্টেল-ম্যাগাজিনে গোপাল হালদার লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিপিবদ্ধ আছে—

> "We went to Santiniketan Bolpur on a 'literary excursion'; never probably in the history of the hostel had there been such a pilgrimage."

বন্ধুমহলে আমার কবিখ্যাতি ছিল, গোলকীপারের পদের জন্য নির্বাচিত হইয়া আমিও তীর্থযাত্রার অধিকার লাভ করিলাম। ১৯১১

খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে বাবার সহিত স্বদেশযাত্রার ঠিক দশ বৎসর পরে আবার সেই পুরাতন বোলপুরে বহু বন্ধু-সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলাম। খেলায় দুই গোলে হারিয়া ফিরিলাম বটে, কিন্তু জীবনের খেলায় সেই প্রথম গুরুদর্শনের দিন হইতেই যে-জিত হইল আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছি।

বোলপুর। শরতের প্রসন্ন প্রভাত, স্বর্ণরৌদ্রোজ্জ্বল। আকাশের হালকা মেঘ আর প্রান্তরের কাশফুল একই শ্বেতবরণী দেবীর মন্দিরে চামর ব্যজনরত। সেদিন বোলপুরের এই রূপ মাত্র দেখিয়াছিলাম। পরে আরও নিবিড় করিয়া আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা বোলপুরের রূপ আমার 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যে এইভাবে ধরিয়াছি :

রেল-লাইনের ধারে ধারে দেখি সারি সারি ধান-কল
চোঙার আকারে আকাশে তুলেছে মাথা,
কয়লা খাইয়া মিশকালো ধোঁয়া উদ্গারে অবিরল,
ধূম্র-মলিন সবুজ গাছের পাতা।
পথের দু ধারে সেই পাতাদের দেখি গৈরিক শোভা—
কখনো সবুজ ছিল তা হয় না মনে,
ধূলো আর ধোঁয়া ডাঙা ও খোয়াই খ'ড়ো ঘর আর ডোবা—
এ বোলপুরের পরিচয় মোর সনে।
দূর হতে দেখি, পথ চলিতেছে গেঁয়ো লোক দলে দলে—
ভিন গাঁ হইতে আসে হেথাকার হাটে,
লাঠির আগায় বোঁচকা বাঁধিয়া যত সাঁওতাল চলে
যেতে হবে দূর—সূর্য নামিছে পাটে।
কৌপীন-পরা পুরুষ এবং মেয়েরা গামছা-পরা
যত চলে পথ তত বেশি কয় কথা ;
কলের কবলে প্রকৃতি মানুষ এখনো পড়ে নি ধরা,
ধূলি-ধোঁয়া ঠেলে জাগে প্রাণ-ব্যাকুলতা।
ভারমন্থর গরুর গাড়ির চাকার কান্না শোনো—
ধূলি-বালি কেটে চলে ঘস্ ঘস্ করি।

দূর-দিগন্তে পথ চলিয়াছে নাই তার শেষ কোনো
নিশিদিন চলে গো-গাড়ির খেয়াতরী।
কখনো দেখি যে মোটরের ছই, কভু টায়ারের চাকা,
পুরাতন আর নূতনেতে মেশামেশি
এই বোলপুর—নূতন ধোঁয়া ও পুরাতন ধূলা ঢাকা;
নূতনো হতেছে পুরাতন শেষাশেষি।
ডাঙায় ডাঙায় ছাড়াছাড়ি হয়ে তাল-খেজুরের মেলা—
তারি মাঝ দিয়ে চলিয়াছে রাঙা পথ,
তৈলবিহীন চাকার ভাষণে মুখরিত দুই বেলা,
চলে অবিরাম জগন্নাথের রথ।
পাশ দিয়ে গেছে রেলের লাইন, প্রহরে প্রহরে চলে
মাল ও মানুষে বোঝাই বাষ্পগাড়ি,
ঘরের ছন্দ কেটে কেটে যায় বাহিরের কোলাহলে,
অটুট তবুও রয়েছে বনেদী বাড়ি।
উত্তরে যাবে? উত্তরায়ণ—সেখানে ঠাকুর রবি··· ···

"উত্তরায়ণ" নয়, তাহারও উত্তরে "কোনারক" সদ্য-নির্মিত প্রস্তরশোভিত খর্বায়তন সৌধ। বাতায়ন ও দ্বারের অবকাশ-পথ দিয়া পশ্চিমে উত্তরে দিগন্তবিস্তার প্রান্তর—সেই তরুণ প্রভাতেও রুক্ষ নিষ্করুণ। শালপ্রাংশু মহাভুজ কবি সেই খাটো ঘরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া ছিলেন, প্রসন্ন হাস্যে আমাদের সম্ভাষণ জানাইলেন। দীর্ঘ প্রবাসান্তে ইয়োরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন, গায়ের রঙ টক্‌টক্ করিতেছে। বিস্ময়বিমূঢ় আমরা প্রথমটা প্রণাম করিতেও বিস্মৃত হইলাম। কবির সুধাবর্ষী কণ্ঠনিঃসৃত কৌতুক-প্রশ্নে আমাদের চমক ভাঙিল।

—তোমরাই বুঝি অগিল্‌ভি হস্টেলের দল! শুনলাম, ডাঙার মাঝখানে বেকায়দায় পেয়ে তোমাদের এঁরা হারিয়ে দিয়েছেন!

মন বলিতে চাহিল—হারি নাই, আমাদের জিত হইয়াছে; কিন্তু বলিতে পারিলাম না। বিশ্বমৈত্রীর পুরোহিত কবির চিত্ত

তখন অতিথি-বিমুখ অসহযোগী ভারতবর্ষের দুর্ব্যবহার-চিন্তায় কাতর, "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান"এর ছাপাখানার কালি তখনও শুকায় নাই। স্বতই প্রসঙ্গ প্রাচীন ভারতের উদারতা ও আধুনিক ভারতের সঙ্কীর্ণতা-ক্ষুদ্রতার প্রতি নিবদ্ধ হইল। সেদিন তাঁহার মুখে যে সুগভীর বেদনা এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কাজনিত উত্তেজনার প্রকাশ দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত হইয়াছিলাম। প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা, সব কথা পূর্বাপর মনেও নাই। শুধু এইটুকু মনে আছে, সেই কথাগুলিই তাঁহার তৎকালীন ভাষণসমূহে বিস্তৃততরভাবে স্থান পাইয়াছিল। যাহা স্থান পায় নাই তাহা আমার অন্তরে আজও স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান আছে। আমাদের বর্তমান জাতিগত চরিত্রহীনতা ও ক্ষুদ্রতার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমরা যে কোথায় নেমে গেছি তা বোঝাতে আমি আমাদের দেশের বহুপ্রচলিত একটা গুজবের কথা বলব। দেশে কোথাও ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্ট হ'লেই শুনতে পাই, এত জন আহত মুমূর্ষুকে মেরে মালগাড়িবন্দী ক'রে কর্তৃপক্ষ জলে ফেলে দিয়েছে। আমরা সহজেই বিশ্বাস করি এবং উত্তেজিত হই। একবার ভেবে দেখি না, এই কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক দেশী লোক আছেন, ঘাতকরা তো নিশ্চয়ই দেশী। বছরে বছরে এ ভাবে দেশের এতগুলো নিরীহ লোককে খুন ক'রে জলে ফেলা হচ্ছে অথচ এদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একজনও কি দাঁড়াল না এই নির্মম নৃশংসতার প্রতিবাদ করতে? মেরে ফেলাটা যদি সত্যি হয় তা হ'লে আমরা জাত হিসেবে কত ছোট ভেবে দেখ। আর সবটাই যদি মিথ্যে গুজব হয়, তা হ'লে মানুষের সততা ও মহত্ত্বকে এমনভাবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দেহ করবার প্রবৃত্তি আমাদের হ'ল কি ক'রে? আসলে আমরা সর্বদাই অক্ষম দুর্বল হীনের যা ধর্ম তাই অবলম্বন করি, সব বড়কেই সব মহৎকেই টেনে ধূলোয় নামিয়ে ধূলোসাৎ করলেই আমাদের আনন্দ, সবাইকে অবিশ্বাস্য ও হেয় প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের উল্লাস। এই দুর্ভাগা দেশে কোনো দিক

দিয়ে বড় যাঁরা হয়েছেন যেমন ক'রে হোক তাঁদের ছোট প্রমাণ করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি নেই। এ যুগের ছেলেরা অর্থাৎ তোমাদের ওপর আমার অটুট বিশ্বাস আছে। তোমরা এই হীন কলঙ্ক থেকে জাতিকে মুক্ত ক'রো।"

ইয়োরোপ ও ইংলণ্ডের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিলেন—

"একটা বিরাট ফাঁকির ওপর গ'ড়ে উঠেছে আজ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের অভিমান। পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে যা বোঝায় ওরা মোটে তার এক টুকরোর মালিক, এতেই ওদের বাহাদুরি কত, গর্ব কত! ফ্রান্সে যাও, জার্মানিতে যাও, তবেই যথার্থ ইয়োরোপীয় সভ্যতা কি বুঝতে পারবে। এ দেশের অনেকে ভাবেন ওয়েস্টার্ন সিভিলিজেশনের গোড়ার সুরটা তাঁরা ধরতে পেরেছেন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, সুর জিনিসটা সূক্ষ্ম, মোটা মোটেই নয়, চট্ ক'রে তা ধরা যায় না, নিখুঁত হ্যাট কোট টাই পরলেও না; তার জন্যে দেখা চাই এবং দেখার দৃষ্টি চাই। যাঁরা সত্যের ওপর জীবন গ'ড়ে তুলেছেন তাঁরাই মিথ্যেটাকে স্পষ্ট দেখতে পান। পুলিসে চোর ধরে, কিন্তু চৌর্য বস্তুটার ভয়ানকত্ব বুঝতে পারেন কেবল সাধুরাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমাজের ব্যাধি তাঁরাই পুরোপুরি ধরতে পারেন, যাঁরা ব্যাধিমুক্ত। খেলোয়াড়ের চাইতে খেলার দোষগুণ মাঠের বাইরে যারা থাকে তারাই ভাল দেখতে পায়। লেখা অনেক লেখা হয়, বেরও হয়; কিন্তু অধিকাংশ লেখাতেই শুধু কথা থাকে, বাণী থাকে না। লেখক হয়তো অনেক ভেবে লিখেছেন, কিন্তু পাঠককে ভাবিয়ে তোলার মসলা সে লেখায় নেই। এ সব লেখা অসার্থক, ইয়োরোপে আজকাল যে সব লেখক পাঠককে ভাবিয়ে তুলতে পারেন তাঁদের মধ্যে রম্যাঁ রল্যাঁ প্রধান, বার্নার্ড শ'য়ের প্রভাবও কম নয়।"

"স্বদেশী" ও "জাতীয়"—প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—

"আমরা নামে ন্যাশনাল ফ্যাক্টরি খুলি, স্বদেশী আন্দোলন করি, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ গড়ি, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান ব'লে চেঁচিয়েই মরি; কিন্তু কাজে কি করি, ইণ্ডিয়ান আর্টের হাল দেখলেই বুঝবে। কত কষ্টে, কত চেষ্টায় একে বাঁচিয়ে তোলা হ'ল, কিন্তু সারা দেশের লোক

চোখ ফিরিয়ে তাকালেও না, পশ্চিম একে একে সব লুট ক'রে নিয়ে গেল, আমরা হাত তুলে বারণ পর্যন্ত করলাম না। দেশের জিনিস তো যাচ্ছেই, পশ্চিম থেকে যদি কেউ কিছু আহরণ ক'রেও নিয়ে আসে তখন জাত যাওয়ার কথা ওঠে, যেমন উঠেছে আজ।"

অসহযোগের অতিথি-বিমুখতার কথা রবীন্দ্রনাথ ভুলিতে পারিতেছিলেন না। আমরা মুগ্ধ অথচ বেদনাহত চিত্ত লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এমনই আমাদের সৌভাগ্য যে, বোলপুরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিল, অর্থাৎ কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে "সত্যের আহ্বান" পাঠ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম "বর্ষামঙ্গল" উৎসব করিতে রবীন্দ্রনাথ স্বদলবলে কলিকাতায় আসিলেন। রবীন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিতে লাগিল। "শিক্ষার মিলনে"র অভিজ্ঞতায় "সত্যের আহ্বান" আর শুনিতে যাই নাই, কিন্তু "বর্ষামঙ্গলে"র অপূর্ব স্বপ্নময় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র, ১৩২৮) আবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত কবির ষষ্টিতম বার্ষিক সম্বর্ধনায় যোগ দিবার সুযোগও লাভ করিলাম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বহু সাহিত্যিকই সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক ছাড়া দ্বিতীয় দেখিতে পাইলাম না; সেই রাত্রেই একটি কবিতায় কবিকে বন্দনা করিলাম—

রবীন্দ্রনাথ

ওগো আঁধারের রবি,
ওগো মরতের কবি,
স্বরগে মরতে ঘটালে মিলন
দেবতার কৃপা লভি।

আকাশে মাটিতে তৃণে ফুলে ফলে
প্রতি গৃহকোণে প্রতি হৃদিতলে

চিরবিচিত্র যে স্বর উথলে
আঁকিছ তাহারি ছবি।
তুমি সন্ধানী, কবি।

আনন্দ দিয়ে দুখ-শোক করি জয়,
অসীমের পানে চলেছ ছুটিয়া
নিশঙ্ক নির্ভয়।
মূক প্রকৃতিরে তুমি দিলে ভাষা,
ক্ষুদ্রে জাগালে বৃহতের আশা,
যেথা সুন্দর যেথা ভালবাসা—
সেখানে সত্য সবি
তুমিই দেখালে, কবি।

মঙ্গলগানে অশুভে করিয়া ক্ষয়,
আঁধারবিনাশী আলোক আনিলে
হে চিরজ্যোতির্ময়।
নিরাশ পরাণে তুমি দাও আনি
আশা-আনন্দ-আশ্বাস-বাণী ;
আছে দেবতার বরাভয়-পাণি
নিত্য তা অনুভবি
তব আশ্বাসে, কবি।

তুমি আনো স্বর অস্বর ভুবনময়
নব নব গানে দাও প্রাণে প্রাণে
অধরার পরিচয়।
তোমারে প্রণাম কবি,
তুমি আঁধারের রবি,
মোদের মাঝারে তোমারে পেয়েছি
দেবতার কৃপা লভি॥ [ঈষৎ পরিবর্তিত]

এই কবিতা সঙ্গে সঙ্গে আমারই হস্তাক্ষরে হস্টেল-ম্যাগাজিন-ভুক্ত হইল। পরবর্তী ৭ই পৌষের উৎসবে একেলাই শান্তিনিকেতন গেলাম কবিতাটির নকল পকেটে লইয়া। প্রত্যূষে কাচ-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা শুনিলাম। পরদিন ৮ই পৌষ—২৩এ ডিসেম্বর শুক্রবার রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুড়ি বৎসরের লালিত সাধের বিশ্ব-ভারতীকে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ আশ্রম-বালিকাদের দ্বারা আলিম্পনে ও ফুলসজ্জায় সজ্জিত হইল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন; সভাপতিকে বরণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন। এবার তমোহন্তা এক-চন্দ্রকেই শুধু দেখিলাম না; চোখ মেলিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীকেও দেখিবার অবকাশ পাইলাম; তন্মধ্যে আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি, মাদাম লেভি, সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ, উইলিয়াম পিয়ার্সন, এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এক ফাঁকে নামো-বাংলোয় গিয়া ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথকেও শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া আসিলাম। তিনি তখন রকম-বেরকমের কাগজের বাক্স বানাইতে ব্যস্ত এবং ভৃত্য মুনীশ্বর-প্রসাদাৎ কোনও রকমে লজ্জানিবারণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এবারকার একক তীর্থযাত্রায় রবির যে গ্রহটি সর্বাপেক্ষা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিলেন, তিনি হইতেছেন প্রমথনাথ বিশী। দেখিতে বালকের মত, বেঁটেখাটো কিন্তু তখনই খ্যাতিমান, অন্তত আমার প্রভূত হিংসার উদ্রেক করিবার মত তাঁহার খ্যাতি। কাব্যে গল্পে প্রবন্ধে ভ্রমণকাহিনীতে বিশ্বসাহিত্য-সমালোচনায় তখনই তিনি সার্থক সাহিত্যিক, তদুপরি রবীন্দ্রনাট্য, সংস্কৃত নাট্য ও যাত্রাগান অভিনয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। বয়স তখন তাঁহার কতই হইবে? উনিশ-কুড়ি। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই বাংলা দেশের দ্বিতীয়

নাম-করা সাহিত্যিক যাঁহার সহিত পাঠ্যাবস্থাতেই আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে। অবশ্য একটা অভিসন্ধি লইয়া প্রমথনাথের শরণ লইয়াছিলাম, তিনি যদি দয়া করিয়া আমার রবীন্দ্র-বন্দনাখানি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির করিয়া দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, কবিতাটি পকেটে লইয়াই ফিরিয়া আসিলাম।

আজ প্রমথনাথ বিশী আমার প্রীতিভাজন এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একজন। তিনি হয়তো আজ আমার এই কাহিনী পড়িয়া হাসিবেন, কিন্তু সেদিন সত্য সত্যই তাঁহাকে দেখিয়া আমি মজিয়াছিলাম। আজিও সেই সুবাদে তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত হইয়া আছে। তাঁহার প্রসঙ্গ পরে আসিবে। আপাতত, অমন পরমার্থিক কবিতাটির গতি কি হয় সেই দুর্ভাবনা লইয়াই কলিকাতায় হস্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। ডাকযোগে পাঠাইব? কিন্তু অকারণে একটা কবিতা পাঠাইলে তিনি কি মনে করিবেন? কারণই বা কি লেখা যায়? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, স্কুল-জীবনে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বইখানি সম্পূর্ণ নকল করিবার কালে একটা বৈজ্ঞানিক ভুল আমার নজরে পড়িয়াছিল। মুদ্রাকর-প্রমাদ নয়, রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসাব না রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন। 'গোরা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়। বর্ণনাটি এইরূপ ছিল—

> "ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

"মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে" ছায়া "দীর্ঘতর" হইতে পারে না—একটি সুচিন্তিত পত্রে সবিনয়ে ইহাই নিবেদন করিলাম এবং কবিতাটি ফাউস্বরূপ পত্রে পুরিয়া গোপনে তাহা পোস্ট করিলাম। লজ্জায় কাহাকেও জানাইতে পারিলাম না। দুই দিন পরে আমার

চিরস্মরণীয় ৫ই মার্চ (১৯২২) তারিখে চমৎকার হস্তাক্ষরে অগিল্‌ভি হস্টেলের ঠিকানায় ও আমার নামে একখানি লেপাফা আসিল; পোস্টমার্ক—"শান্তিনিকেতন, ৪ঠা মার্চ"। দেখিয়াই বুঝিলাম, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন। এই আমার তাঁহার সহিত সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত যোগাযোগ। স্বামীর সর্বপ্রথম-পত্রপ্রাপ্ত নববধূর মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে গিয়া খিল দিয়া চিঠিটি পড়িলাম—

"ওঁ

কল্যাণীয়েষু

গোরার কোন্ জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ মনে পড়িতেছে না, বইখানিও হাতের কাছে নাই। যদি মধ্যাহ্ন কালের বর্ণনা হয় তবে ছায়ার দীর্ঘতা অসম্ভব বটে, যদি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে তবে ছায়া দীর্ঘ হওয়ার বাধা নাই বিশেষত ঋতুবিশেষে।

তোমার কবিতাটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

মনে হইল, গলা ফাটাইয়া চেঁচাইয়া কথাটা রাষ্ট্র করি। লজ্জায় বাধিল। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। আমার এই পত্র বিফলে যায় নাই। 'গোরা'র পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ "দীর্ঘতর" কাটিয়া "খর্ব" করিয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি।

এই দীর্ঘতরকে খর্ব করা—ইহাই বাংলা-সাহিত্যে আমার সর্বপ্রথম কীর্তি, আধুনিক ভাষায় "অবদান"ও বলিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার জীবনে দীর্ঘতরকে খর্ব করার ইহাই শেষ নয়।

দশম তরঙ্গ

দুই নৌকা

দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, জীবনে আমাকে প্রায় বরাবরই দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে হইয়াছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়া আর্টের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথে চিত্তসমর্পণ করিয়া শিক্ষাজীবনে যে মানসিক দ্বন্দ্বের কবলে পড়িয়াছিলাম, তাহার জের সম্পূর্ণ মিটিতে আরও পূরা তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সে কথা যথাসময়ে বলিতেছি। কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া হইতে ধীরে ধীরে আরও যে একটি আকর্ষণের কবলায়িত হইতেছিলাম, তাহাও আমাকে কম দোটানায় ফেলে নাই। তাহা ঠিক পলিটিক্স নয়। কৈশোরে দিনাজপুরে থাকিতে মনেপ্রাণে বিপ্লববাদী ছিলাম, মার্-কাট্ ছাড়া যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে না সেই বিশ্বাসই মনে মনে পোষণ করিতাম। হঠাৎ ১৯২০ সনের শেষে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আদর্শ আমার বিশ্বাসকে টলাইয়া দিল। মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া সেই ১৯২০ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পলিটিক্স অনেক হইয়াছে, আমি তাহার কোনটিই কখনও অবলম্বন করিতে পারি নাই। তাঁহাতে ভারতীয় ঋষিদের সর্বশেষ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমি তখন হইতেই তাঁহার প্রতি এক নৈতিক ও আত্মিক আকর্ষণ অনুভব করিতাম। বহুকাল পরে 'শনিবারের চিঠি'র গান্ধীভক্তি দেখিয়া বহু সাহিত্যিক বন্ধু আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন এবং অনেকের ধারণা গান্ধীজীর নোয়াখালি-সচিব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রভাবই ইহার কারণ। কিন্তু আসলে এই ভক্তি যে সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের পুরাতন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সেই সময়ে রচিত আমার সর্বপ্রথম গান্ধী-বন্দনাটি নিম্নে দাখিল করিতেছি।

ইহার রচনাকাল ১৯২০ সেপ্টেম্বর; ১৯২১ সেপ্টেম্বরে 'অগিল্‌ভি-হস্টেল-ম্যাগাজিনে' আমার হস্তাক্ষরে ইহা বিধৃত হইয়াছিল:

মহাত্মা গান্ধী

ঘুচালে অন্ধকার।
ধন্য তুমি হে মহাত্মা, ধন্য শেষ ঋষি
তোমায় নমস্কার।
তব সুকঠিন অহিংসা-ব্রতে
দিতেছ চেতনা তন্দ্রা-আহতে
নিত্য স্বাধীন শাশ্বত যাহা
মানুষের অধিকার—
তাহার লাগিয়া জাগালে ভারতে,
তোমায় নমস্কার।

তোমার সত্য-আগ্রহ-বেগে
মহাস্পন্দন উঠিয়াছে জেগে;
"মিথ্যার সাথে ছাড় সহযোগ"
তীক্ষ বাণী তোমার
মোহ করে দূর মুগ্ধ মনের;
তোমায় নমস্কার।

স্বদেশের লাগি ভিক্ষার ঝুলি
নিজের স্কন্ধে নিলে তুমি তুলি,
ধূলির মাঝারে হইতেছ ধূলি
প্রতিদিন শতবার,
সেই ধূলিমাঝে পেতেছ দীপ্তি—
তোমায় নমস্কার।

খৃষ্টের সম মানুষের লাগি
হে দধীচি, তুমি রহিয়াছ জাগি,

আপন বুকের রক্তে মানুষে
দেখাও মুক্তিদ্বার ;
সত্যে ও শুভে ঘটাও মিলন—
তোমায় নমস্কার ॥ [ঈষৎ পরিবর্তিত]

আমাদের কলেজ-জীবনে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতায় গান্ধী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন; হেদুয়ার দক্ষিণে তিনি নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, আমি মাঝে মাঝে তাঁহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতাম। উত্তেজনার মুখে তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া একদিন তাঁহাকেও উত্তেজিত করিয়াছিলাম, সে কথা বলিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা-সভায় তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের বাসনা জাগিয়াছিল। কিন্তু তখন রবির প্রদীপ্ত তেজ আমার চোখ দুইটিকে এমনই ধাঁধিয়া দিয়াছিল যে, সামলাইয়া আশেপাশে সহজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে খানিকটা সময় গেল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি পাওয়ার প্রায় দেড় মাস পূর্বে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র "কষ্টিপাথর" বিভাগে ওই সালের কার্তিক মাসের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী" কবিতা পাঠে মনে ছন্দের দোলা ও ভাবের দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দের রাজা বলিয়া তখনই চিনিয়াছিলাম। গান্ধী-বন্দনা কবিতাটি পকেটে এবং নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মনে লইয়া একদিন বৈকালে মফস্বলীয় মূঢ়তাসহ সত্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। স্বল্পভাষী সত্যেন্দ্রনাথ চক্ষুপীড়ায় অস্বচ্ছ রূঢ় দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভয়ে এবং সঙ্কোচে মরীয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত "বিদ্রোহী" সম্বন্ধে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। বলিলাম, ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু 'আমি'র এলোমেলো প্রশংসা-তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও

সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়; এ বিষয়ে আপনার মত কি? প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে একটা মৃদু হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বুঝি বিজ্ঞানের ছাত্র? বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বি. এস-সি. পরীক্ষা দিচ্ছি। বস্তুত তখন পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পরীক্ষা দেওয়াও হইয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ আমার প্রশ্নের জবাবে সেদিন মোদ্দা কথাটা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। "বিদ্রোহী" কবিতা কোনও ভাবের ইঙ্গিত দেয় কি না, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে। বৎসর দেড়েক পরে সেই কথাই বলিতে গিয়া আমার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া "বিদ্রোহী"র একটা মারাত্মক প্যারডি লিখিয়াছিলাম, যাহার আরম্ভটা ছিল এইরূপ—

"আমি ব্যাঙ্
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ্।
আমি ব্যাং...
দুইটা মাত্র ঠ্যাং।..."

এই কবিতাই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একাদশ বা পূজা-সংখ্যায় (১৯২৪, ৪ঠা অক্টোবর) প্রকাশিত হইয়া বিবিধ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বয়ং নজরুল ইসলাম ইহা তাঁহার গুরুকল্প মোহিতলাল মজুমদারের রচনা অনুমান করিয়া পরবর্তী সংখ্যা 'কল্লোলে' তাঁহাকে একটি কবিতায় ভীষণ আক্রমণ করেন এবং 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন মোহিতলাল 'চিঠি'র পরবর্তী সংখ্যায় (২৫ অক্টোবর, ১৯২৪) "দ্রোণ-গুরু" শীর্ষক একটি

কবিতা প্রকাশ করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। আমি আরও কিছুকাল পরে বিচিত্র ছন্দে ভাবলেশহীন কয়েকটি কবিতা লিখিয়া ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কথার সমর্থন করি। আমার বিশ্বাস, পরীক্ষামূলক সেই সকল কবিতার দ্বারা আমার ধারণা আমি প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলাম।

যাহা হউক, "বিদ্রোহী"-প্রসঙ্গশেষে পকেট হইতে আমার ব্যাঙের আধুলিটি অর্থাৎ গান্ধী-বন্দনা বাহির করিলাম। গান্ধীজীকে মাত্র পক্ষকাল পূর্বে (১০ই মার্চ) কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ত বেদনাকাতর। পরিবেশও ছিল আমার সহায়। হেদুয়ায় গ্যাসের বাতি তখন জ্বলিয়াছে এবং মৃদুতরঙ্গায়িত সরোবরে তাহাদের প্রতিবিম্ব আন্দোলিত হইয়া জনবহুল কলিকাতার সন্ধ্যাকেও স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, এ বিজ্ঞানও নয়, কবিতাও নয়, এ দেখছি তোমার তিন নম্বর নৌকো ; এত সামলাতে পারবে কি ?

সত্যই সামলাইতে পারি নাই। আমার পলিটিক্সের নৌকা কোনও কালেই চলে নাই এবং মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে উপজীবিকার অবলম্বন বিজ্ঞানের নৌকাও বানচাল হইয়াছিল।

পরীক্ষা দিয়া দিনাজপুরে অবকাশ যাপনের জন্য আসিলাম। সেখানেও ধরপাকড় চলিতেছে। একরূপ নির্লিপ্ত অজ্ঞাতবাসে সেখানে থাকিতে থাকিতেই মে মাসের মাঝামাঝি সংবাদ পাইলাম, পাস করিয়াছি। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম। প্রবেশাধিকার পাইয়াও মামাতো ভাইয়ের জন্য সে অধিকার ত্যাগ করিলাম। কি করিব, কোন্ পথে চলিব—ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার রাস্তায় নিঃসঙ্গ ভ্রমণ করিতেছি, সহসা ২৬শে জুনের (১৯২২) সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মর্মঘাতী আঘাত পাইলাম, ১০ই আষাঢ় শনিবার রাত্রি আড়াইটায় (ইংরেজী মতে ২৫শে জুন প্রত্যুষ আড়াইটা) কবি সত্যেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ মাত্র

চল্লিশ বৎসর বয়সে (জন্ম ১৮৮২, ১০ই ফেব্রুয়ারি) বঙ্গবাণীর মন্দিরে স্বীয় আসন শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ১৩২৯ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সত্যেন্দ্র-পরিচয়ে" কবিতা বিষয়ে আমার সহিত সত্যেন্দ্রনাথের আলাপ সম্পর্কে আরও স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাইলাম। অস্পষ্ট দুর্বোধ্য এলোমেলো ছন্দোবদ্ধ কথাকে তিনি কবিতা বলিতেন না, বলিতেন "হেঁয়ালি"। কবিতার ক্ষেত্র হইতে স্পষ্ট ও সত্য ভাষণ তাঁহার সঙ্গেই বিদায় গ্রহণ করিল। বঙ্গভারতীর মন্দির-প্রাঙ্গণে নাম-লেখানো ভক্তের দলের একজন না হইয়াও সত্যেন্দ্র-বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হইলাম।

বিজ্ঞানের নৌকাই শেষ পর্যন্ত আমাকে জীবনসমুদ্রে তরাইতে পারে কি না—সে বিষয়ে শেষ চেষ্টা করিবার জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া কাশী যাত্রা করিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ছাড়াও হৃদয়-ঘটিত অন্য কারণ ছিল যাহা নিষিদ্ধ পর্যায়ভুক্ত। দাদা এবং রতন দুইজনে আমাকে খুব উৎসাহ দিয়া বিদায় দিল। কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-স্থাপিত ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে তড়িৎ-ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্ররূপে পরদিন দর্শন দিলাম। মা-সরস্বতীর সিংহাসন নিশ্চয়ই একবার টলিয়া উঠিল। কয়েকটি বিরহব্যঞ্জক এবং যৌবনপ্রবুদ্ধ কবিতা রচনা ছাড়া কাশীর তিন মাস প্রবাসবাসে আর যাহা করিয়াছিলাম তাহা মোটেই বিদ্যা-বিষয়ক নয়। সে পথে সহৃদয় অধ্যক্ষ কিং সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রবল থাকিলেও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম কর্তৃপক্ষের বঙ্গবিরোধী খুঁটিনাটি বাধাই শেষ পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। সেই সকল বাধা অপসারণে দল বাঁধিতে ও ঘোঁট পাকাইতেই সময় গেল। মৎস্য-মাংস-ডিম্ব-নিষেধক হুকুমগুলি কৌশলে অমান্য করিবার ফিকিরে সর্বদা ফিরিতে হইত বলিয়া হস্টেলগুলির বাঙালী ছাত্রদের লেখাপড়া করিবার অবসর মিলিত না। তিন মাসে ছুতারমিস্ত্রীর কাজে হাত পাকাইয়া একটি চেয়ারের তিনখানি পায়া নিখুঁতভাবে নির্মাণ করিয়া

একদিন সেগুলি ফেলিয়াই বি. এন. ডব্লু. আর. পথে দিনাজপুরে উপস্থিত হইলাম।

কাশীতে থাকিতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, যাহার নাম দিয়াছিলাম "যৌবন"; নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"র প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশমত নানা অসম্বন্ধ উপমার মধ্যে একটা ভাবের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা ইহাতে আছে। এই কবিতাটিই "বিদ্রোহী"র বিরুদ্ধে আমার প্রথম বিদ্রোহ হিসাবে শুধু নয়, আমার তখনকার উদ্দাম মনের পরিচয় হিসাবেও উদ্ধারের যোগ্য। কবিতাটি এই—

আমি আলেয়ার আলো
আপন খেয়ালে চলি,
ঝঞ্ঝা মানি না, মানি না বাত্যা-ভয়,
আমি উল্কার মত
আপন বেগেতে জ্বলি;
পথহারা, নাহি কারো সাথে পরিচয়।
আমি পর্বত হতে
দুর্জয় বেগে নামি,
বাধাবন্ধন দু ধারে ঠেলিয়া যাই,
কভু নহি কো কাতর
হতেও নিম্নগামী
নিম্নে যদি বা সাগরের খোঁজ পাই।
আমি বৈশাখী ঝড়,
বিপুল রুদ্র তেজে
আঁধারি জগৎ উড়াই ধূলার রাশি,
ঘন শ্রাবণের মেঘ—
ভীষণ সাজেতে সেজে
ডুবাতে ধরণী বড় আমি ভালবাসি।
আমি বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বলি তির্যক বেগে

অট্টহাস্যে আকাশের বুক চিরি।
আমি মহা মহামারী
জনপদ মাঝে জেগে
মৃত্যুরে মোর সাথে সাথে ল'য়ে ফিরি।
আমি জ্যৈষ্ঠের রোদ
আগুনের মত জ্বলি
পরশে আমার ওঠে মাটি ফেটে ফেটে—
আমি সমর-ভীষণ
মূর্খ মানবে ছলি,
মরে দলে দলে নিজেরে নিজেরা কেটে।
আমি যৌবন, আমি
নিত্য নূতন রূপে
আপনার বেগে আপনি ছুটিয়া চলি,
আমি হুঙ্কারি চলি
চলি নাকো চুপে চুপে
বিঘ্ন বিপদ পদতলে আমি দলি।
উল্কা আলেয়া এরাই তুলনা মোর
প্রকৃতি আমার তবু না প্রকাশ হয়,
আমি যৌবন
আমি উন্মাদ ঘোর
ছুটিব, মরিব, লভিব নিত্য জয়।

কিন্তু কবিতায় বন্দিত এই নিত্যজয়ী দুর্মদ যৌবন আমার কর্মহীন মনকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারে নাই। বুঝিতেছিলাম, বিজ্ঞানলক্ষ্মী আমাকে দূরের ইঙ্গিত দিবেন না, নিরুদ্দেশ-যাত্রায় ডাকিবেন না। সাহিত্য-লক্ষ্মীও যে বিশেষ ভরসা দিতেছিলেন তাহাও নয়। তথাপি সর্বাধ্যক্ষ মালবীয়জীর সঙ্গে একদিন বচসা বাধাইয়া বারাণসীধাম পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। দিনাজপুর হইতেই দরখাস্ত করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সায়েন্স কলেজে

ফিজিক্সের "হীট" বিভাগে ভর্তি হইলাম এবং পূজার ছুটি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া ক্লাসে যোগদান করিলাম। আশ্রয় লাভ করিলাম ৬নং বাদুড়বাগান লেনে—সায়ান্স কলেজের মেসে।

যে দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য এইটিই শেষ চেষ্টা। নিজের ভবিষ্যৎ যদিচ গণৎকার ছাড়া আর সকলের নিকটই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন থাকে, তবু এই চেষ্টার মধ্যে কে যেন আমাকে কানে কানে বলিত—তোমার বিজ্ঞানের নৌকা বেশি দূর অগ্রসর হইবে না, নামিয়া পড়, নামিয়া পড়। মেসের সহপাঠী বন্ধুরা যখন নিষ্ঠার সহিত পাঠাভ্যাস করিতেন, আমি তখন অশান্ত চিত্তে সে সময়ের ফ্যাশন কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য-সমুদ্রে পাড়ি দিতাম। বন্ধুবর অজিতনারায়ণ চৌধুরী (ফলিত রসায়নের ছাত্র) দাশরথি সান্যালের সুবিখ্যাত ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতেন। নরওয়েজিয়ান, স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান, আইসল্যাণ্ডিক, ডেনিশ, পোলিশ ভাষার বহু গল্প উপন্যাস তখন ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমি একে একে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছি। ইহার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও রুশীয় ভাষার বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা যে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। আমার অবস্থা শিশুপাঠ্য বইয়ের সেই হতভাগ্য বালকটির মত হইল, যে বিদ্যালয় পলাইয়া পথে পথে পশু-পক্ষী-পতঙ্গের সহিত খেলা যাচিয়া বেড়াইত। কলের পুতুলের মত বই বগলে সি. ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, ডি. এম. বোস, সুশীল আচার্য, বিধুভূষণ রায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ক্লাস করিতাম, প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া যে যে দিন প্রশান্ত মহলানবীশ ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট যথাক্রমে রিলেটিভিটি ও রেডিও অ্যাক্টিভিটি পড়িতে যাইতাম সেদিন পথে একটু মুখবদলের নূতনত্ব থাকিত। প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে কি যে মাথামুণ্ড করিতাম—একটা এক্সপেরিমেণ্টও

যে শেষ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না। ক্লাসে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন শ্রীঅমূল্য সেন (অধুনা কলিকাতা করপোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার), তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতেই আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার কৃপায় নিঃসঙ্গ কলিকাতাতেও একটা মধুর সামাজিক জীবনের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। যে হতাশা ও রুক্ষতা আমার মনকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছিল, চমৎকার পারিবারিক পরিবেশে তাহা কাটিয়া গিয়া আশ্বাস ও স্নিগ্ধতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের মেসের ঠিক উত্তরে বাদুড়বাগান লেন এবং তাহারও উত্তরে একটি চতুষ্কোণ পার্ক। এই বাড়িটিরই দক্ষিণের অর্ধাংশে থাকিতেন দেশনেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। নিষিদ্ধ বাতায়নপথে এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করা আমার একটা ব্যসন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতাম, সংসারে ইনি ঠিক বিগ্রহের মতই পূজিত ও সেবিত হইতেন; সভা-সমিতি নিত্য লাগিয়াই থাকিত, ফুলের মালা আসিত, তোড়া আসিত—চক্রবর্তী-গৃহিণী সেগুলি ধবধবে বিছানার চারিপাশে পরিপাটি করিয়া সাজাইতেন। চক্রবর্তী মহাশয় খুব গম্ভীর মেজাজের লোক ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে রাজনৈতিক নেতা হইবার লোভ জাগিত।

উত্তরে আমার ঘরের বাতায়নপথে প্রত্যহ সকাল বিকাল আর একটি মানুষকে দেখিতে পাইতাম, দেহ ঈষৎ স্থূল, কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মনোরম মুখশ্রী। ছাতা হাতে বেলা দশটা নাগাদ সম্মুখের পথ দিয়া কোথায় যাইতেন, আবার বৈকালে ফিরিতেন। কে একজন বলিয়া দিল, ইনিই কবি মোহিতলাল মজুমদার, কাছাকাছি কোনও মেসে থাকেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ-কবিতার শেষে নামটি দেখিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও লেখার সহিত পরিচিত ছিলাম না। প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে এই বঙ্গকবির প্রতি মনে মনে স্বতই শ্রদ্ধাশীল হইতেছিলাম, তিনি আমাদেরই নিকট-প্রতিবেশী জানিয়া

একটা গর্বও অনুভব করিতে লাগিলাম। পরিচিত হইবার খুবই বাসনা হইতেছিল, কিন্তু সুযোগ মিলিতেছিল না।

আর দেখিতাম শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। রোজ এগারোটায় আমার ক্লাস। আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে (তখন পর্যন্ত সিগারেট স্পর্শ করি নাই) বইখাতা হাতে সংকীর্ণ গলিপথ পার হইয়া যেমনই আপার সারকুলার রোডের প্রশস্ত পরিসরে আসিয়া পা দিতাম, দেখিতে পাইতাম রিক্‌শারোহণে শ্বেতশ্মশ্রু প্রশস্তললাট রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' আপিসে চলিয়াছেন—সায়ান্স কলেজেরই ঠিক দক্ষিণে ৯১নং আপার সারকুলার রোডে। তিনি তখন থাকিতেন ৮নং রামমোহন রায় রোডে। আমি জানিতাম, তিনি আমার বড় ও মেজ মামা নন্দলাল ও কানাইলাল দত্তের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু। সেই পরিচয়ে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া লওয়া যায়—এমনই নিয়মিত তাঁহার গতায়াত ছিল।

এই যে সামান্য সামান্য ঘটনা, বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সাহিত্যিক সন্দর্শন, এবং কাচপোকা-তেলাপোকার চিরন্তন কাহিনী অনুযায়ী ধীরে ধীরে তেলাপোকা-আমির মানসিক রূপান্তর গ্রহণ—আমার স্বভাবত-পলাতক মনকে আরও দ্বিধাগ্রস্ত, আরও বৈরাগী করিয়া তুলিতেছিল। পাঠে সম্পূর্ণ অসহযোগ ও নিত্য হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও শান্তি পাইতেছিলাম না। ঠিক এই সঙ্কটকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া আমাকে আরও বিচলিত করিয়া দিল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিবাহিত জীবনের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে একটু বেশি অবহিত ছিলাম—পিতামাতার আশ্রয় সত্ত্বেও। বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর পাঁচজনের মত উচ্চতম ডিগ্রীলাভ ও চিরাচরিত প্রথায় সরকারী বেসরকারী ভাল-মন্দ-মাঝারি চাকুরিতে প্রবেশলাভ আমার ভাগ্যে নাই। দিনাজপুরের পার্টিশন ডেপুটি কলেক্টর পিতার

বাসনা ছিল ডেপুটিগিরির আশ্রয়ে নিরাপদ জীবনযাত্রায় আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন। আমার তাহা মনঃপূত হয় নাই, অমান্য করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। ভাগ্যে যাহাই থাকুক, সাহিত্য-সাধনাকেই উপজীবিকা-স্বরূপ গ্রহণ করিবার বাসনা অবচেতন মনে তখন হইতেই ছিল। বিবাহ করিলে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং মনের বাসনা ফলবতী হইবে না, ইহা জানিতাম। প্রথমেই প্রবল অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং প্রায়-বালিকা আমার ভাবী পত্নীকে শ্যামবাজারের এক সঙ্কীর্ণ গলির শেষপ্রান্তে দূর হইতে একদিন প্রত্যক্ষ করিয়া এমন একটা অলৌকিক আবেশ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইল, অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও যাহার প্রভাব এড়াইতে পারিলাম না। এই ঘটনার কথা আমার সেকালের বন্ধুরা সকলেই জানেন, তাই তাহার উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেছি, সাধারণ পাঠকের নিকট আজগবি ঠেকিবে বলিয়া তাহার বিস্তারে নিরস্ত হইলাম। যাহা হউক, আমি প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির মত বিবাহে রাজী হইলাম। মনের দ্বন্দ্ব তবু সম্পূর্ণ ঘুচিল না। ঠিক এই সময়ে লেখা "হতাশা" নামক কবিতায় তখনকার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। বিবাহিত এবং অবিবাহিত জীবনের দ্বন্দ্বই শুধু নয়—বিজ্ঞান না সাহিত্য, সেই দ্বন্দ্বের আভাসও ইহাতে আছে। কবিতাটি অংশত এই—

আমার মনের গভীর আঁধার মাঝে
উঁকি-ঝুঁকি ক্বচিৎ আসে আলো,
আশার বাণী হঠাৎ কানে বাজে
ঘনায় যখন মনের আঁধার কালো।
চেয়ে চেয়ে দেখি সমুখ পানে
পথের আভাস কিছুই নাহি পাই,
তবু চলি কোন্ অজানার টানে,
ভয়ে ভয়ে পিছন পানে চাই।

ডুবেছে মন গভীর হতাশায়
বুঝতে নারি চলব যে কোন্ পথে,
বিজ্ঞানেতে বন্দী হয়ে হায়,
ভাবি—জীবন কাটাই কোনো মতে।···

আশা-হতাশার দোলায় আরও বাউণ্ডুলে হইয়া উঠিলাম; সঙ্কটত্রাণ বা অন্যান্য ব্যাপারে ভলান্টিয়ারি করিবার সুযোগ পাইলেই হইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কলেজে দুই বেলা দেখিতাম। তিনিই হইলেন আদর্শ। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহভাজন হইয়া উঠিতেও বিলম্ব হইল না। সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৩২৯) পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, সন্ধ্যার দিকেই গ্রাস আরম্ভ। চন্দ্রগ্রহণের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। সায়ান্স কলেজের একটা দল এই কাজে আহিরীটোলা ঘাটের ভার পাইল। মেসের বন্ধুরা প্রায় সকলেই ছিলাম। দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার একটু আগেই আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরিয়া ঘাটের দিকে যাইতেছি, সুকিয়া স্ট্রীট জংশন পার হইয়াই ডান দিকের একটা বাড়ির ফুটপাথে অনেক জনসমাগম দেখিলাম। চেয়ারে বেঞ্চে টুলে বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া অনেক লোক। ঠিক রাস্তার পাশের একটা ঘরে প্রবল উৎসাহে গানবাজনা চলিতেছিল। উদাত্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কানে বাজিল—

"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ওই এল ওই
এল ওই রক্ত যুগান্তর রে—"

পুলকে বিস্ময়াভূত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একজন ঝাঁকড়াচুল বৃষস্কন্ধ সুদর্শন যুবক কোলের উপর হারমোনিয়াম তুলিয়া বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছেন এবং তাঁহার ঠিক সম্মুখে আমাদের পথের নিত্যদৃষ্ট পথিক কবি মোহিতলাল মজুমদার আসর জাঁকাইয়া বসিয়া বেশ একটা সাফল্য-

গর্বের ভঙ্গিতে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। ভাবটা—দেখ, এটি আমারই কীর্তি। আশেপাশের অস্ফুট গুঞ্জনেই সঙ্গীতরত যুবকটির পরিচয় মিলিল—কাজী নজরুল ইসলাম। গৃহস্বামী মোহিতলালের গুণমুগ্ধ বন্ধু সাহিত্যরসিক কবিরাজ জীবনকালী রায় আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিলেন। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। চন্দ্রে গ্রহণ লাগিল বলিয়া। আমরা শকুন্তলা-সমাগমান্তে রাজধানী-প্রত্যাগমনবাধ্য রাজা দুষ্মন্তের মত বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে আহিরীটোলা ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম। গান চলিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে নয়নমনোহারী বিবিধ পুরস্কারাকীর্ণ কর্তব্য সমাপন করিয়া যখন মেসের দিকে ফিরিলাম, তখন বাসন্তী নিশীথে সদ্য-রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রসন্ন হাস্য বিকিরণ করিতেছেন। আমরাও আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে লঘু মেঘের মত পক্ষবিস্তার করিয়া আসিতেছিলাম। ভাঙা মানিকতলা হইতে আমহার্স্ট স্ট্রীটে ঢুকিতেই সেই সুরালঙ্কৃত বজ্রনির্ঘোষ কানে আসিল—

"নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান—"

জলসা তখনও শেষ হয় নাই জানিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। পথের জনতা তখন বিরল হইয়া আসিয়াছে। মোহিতলাল বাহিরের একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন; তাঁহার পাশে একজন নগ্নগাত্র স্বর্ণবর্ণ পুরুষ গামছা কাঁধে বসিয়া হাস্য-পরিহাসে অবশিষ্ট কয়েকজনকে মাতাইয়া রাখিয়াছেন। ভিতরে গান চলিতেছে। নজরুল ইসলামের বোতাম-খোলা পিরহান ঘামে এবং পানের পিচে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কলকণ্ঠের বিরাম নাই। "বিদ্রোহী"র প্রলাপ পড়িয়া যে মানুষটির কল্পনা করিয়াছিলাম, ইঁহার সহিত তাঁহার মিল নাই। বর্তমানের মানুষটিকে ভালবাসা যায়, সমালোচনা করা যায় না। এটনা-

বিসুভিয়াসের মত সঙ্গীতগর্ভ এই পুরুষ, ইহার ক্রেটার-মুখে গানের লাভাস্রোত অবিশ্রান্ত নির্গত হইতেছে।

গান থামিতেই আমরা সরিয়া পড়িলাম, কিন্তু তৎপূর্বে সেই বিদূষক ব্রাহ্মণটির পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। তিনি স্বনামখ্যাত শরৎ পণ্ডিত—দাঠাকুর। পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছে। এইদিনকার গানের আসরে আরও দুইজন সাহিত্যিককে দেখিয়াছিলাম, যাঁহারাও পরে আমার বন্ধু হইয়াছেন—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। আমার যাত্রাপথে বিজ্ঞানের নৌকাকে বানচাল করিবার শৈবালদাম এইভাবে সঞ্চিত হইতে লাগিল।

গ্রীষ্মাবকাশে দিনাজপুরে আসিলাম। কনিষ্ঠ ভগিনীর বিবাহ বৈশাখে (১৩৩০) আমার বিবাহ ৪ঠা আষাঢ়। দিনাজপুরে গিয়াই নিদারুণ অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া মাত্র পাঁচ-ছয় জন আত্মীয় ও বন্ধুসহ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ১৯শে জুন (১৯২৩) মঙ্গলবার প্রায় গোধূলিলগ্নে শ্যামবাজারে শ্যাম স্কোয়ারের পূর্বদিক-সংলগ্ন একটি বৃহৎ বাড়িতে (রামলাল দত্তের) অগিল্‌ভি হস্টেল ও সায়ান্স কলেজ মেসের বন্ধুদের আনন্দহুলাহুলির মধ্যে শ্রীমতী সুধারাণী চৌধুরীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। সেই দিন সেই শুভলগ্নেই আমার নিরুদ্দেশযাত্রার পরিবহন-বিভাগের একটি ছাড়া আর সব কয়টি নৌকাই ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল। আমার যান ও পথ নির্দিষ্ট হইল। আমি অনেক অশান্তি হইতে বাঁচিয়া গেলাম। বঙ্গবাণী সেই ১লা আষাঢ়ে আমার মুখ দিয়া বলাইলেন—

গুরু গুরু গুরুধ্বনি আমার বুকের মাঝে
সে কি তুমি আসছ ব'লে, সে কি তোমার চরণ বাজে,
আমার বুকের মাঝে ?

অতীত আমার লুপ্ত হ'ল
স্মৃতি অনাদরেই ম'ল
পিছনে মোর সব একাকার, সমুখে দীপ তোমার রাজে।
বাতাস আনে গন্ধ তোমার আঁচল হতে
দূর সাগরে টান পড়েছে ভাসব এবার জীবন-স্রোতে।
শুনতে পেলাম তোমার ভাষণ,
মন্দিরে ওই পাতব আসন,
তোমার চরণ লাগি বল রইব সেজে কেমন সাজে!

একাদশ তরঙ্গ

নিরুপায় অবতরণ (Forced landing)

তথাপি তখনও বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম না, এক রকম বুড়ি ছুঁইয়া জীবনের লুকাচুরি খেলায় যত রকমের অনাচার সম্ভব সকলই করিতে লাগিলাম। বন্ধু শৈলজারঞ্জন মজুমদার (অধুনা শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতাচার্য) নারীসুলভ মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিতেন, নিত্যসঙ্গী অজিতনারায়ণ চৌধুরী বাঁশের বাঁশীতে সেই গান বাজাইতেন, আর আমি সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে ছাদের ময়লা জলের ট্যাঙ্কের উপর চড়িয়া পশ্চিম দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া "সুদূরের পিয়াসী" হইয়া বসিয়া থাকিতাম; শহরের ধূলিধূম্রজালের মধ্যে ক্লান্ত রক্তাভ সূর্য কখন যে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতেন জানিতেও পারিতাম না, অন্ধকারে ও শিশিরে চারিদিক কালো ও আর্দ্র হইয়া একটা দুশ্ছেদ্য আবরণ রচনা করিয়া আমার দৈনন্দিন কঠিন কর্তব্য হইতে আমাকে সস্নেহে আড়াল করিয়া রাখিত, উৎকল-নন্দন পাচকপ্রভুর কাংস্য কণ্ঠে যখন খাওয়ার ঘণ্টা নিনাদিত হইত, তখন নামিয়া আসিতাম। যদিও সদ্য-বিবাহিত, তবু তখনও আইবুড়োর আবেশ ও অভ্যাস কাটে নাই। এই অবস্থাতেই "ছাদ-বিহার" কবিতা লিখিয়াছিলাম, ইহাতে মেসের বন্ধু সকলেরই নাম ছিল, পরে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র নবম সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়া মেসে পাড়ায় এবং কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। দীর্ঘ কবিতা, গোড়া ও শেষটুকু উদ্ধার করিতেছি, সমগ্র কবিতাটি আমার 'অঙ্গুষ্ঠে' আছে—

বিকেল হ'লেই ছাদ আমারে ক'ষে যে দেয় টান,
কত প্রেমের 'ওজোন'-বাতাস বয় সেথা উজান ;

(আমি) থাক্‌তে নারি ঘরে
তাড়াহুড়ো ক'রে
যা হোক কিছু মুড়ি-চিঁড়ে না চিবিয়ে গিলে
(মেসের) জনকয়েক মিলে
ছাতে ছুটি বেহুঁশ হয়ে যেন
মৌতাতেরি সময় হ'লে কালাচাঁদের প্রিয় ভক্ত হেন।
পরস্পরের অগোচরে হেথাহোথা দৃষ্টিবাণ হানি,
মনের কোণে দুষ্ট আশা করে কানাকানি—
একটা মাছও পড়বে নাকি জালে ?
এদিক-ওদিক দেখা তো যায় পালে পালে
পঞ্চ হতে পঞ্চাশৎ পার।—

* * *

পায়চারিতে শ্রান্ত হয়ে এক দিকেতে দৃষ্টি স্থির করি
ময়লা জলের ট্যাঙ্কের উপর চড়ি
একটি হৃদয় জয়ের তরে করি বিষম ধ্যান
হারায় চেতন হারায় সকল জ্ঞান।
ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে আঁধার
ছোট বড় যায় না বোঝা লাল কি কালো পাড়,
যায় না বোঝা, তবু তাকাই
অন্ধকারের আড়ালেতে ইশারা তার যদি একটু পাই!
চক্ষু টাটায়, দৃষ্টি নাহি চলে,
ভুলি আশার ছলে
তবু দেখি আঁধার ঠেলে ঠেলে
ঐটুকু মোর চরম আরাম আমি মেসের ছেলে।

আমার রচনাশক্তির নিদর্শন হিসাবে এই উদ্ধৃতি নয়, মেস-হস্টেলবাসী কলিকাতার ছাত্র-সমাজের তৎকালীন রমণীয়তাবিহীন রুক্ষ-মরুতৃষ্ণার পরিচয় ইহাতে আছে। ছাদে উঠিয়া এই বৈকালিক মরীচিকা দর্শন তাহাদের অকারণ বিলাস ছিল না, বুভুক্ষিতের নিদারুণ হাহাকার ইহার মধ্যে ধ্বনিত হইত। তাহারা সত্য সত্যই

এক ক্লেশকর অবস্থায় 'হুলো'দের অতৃপ্ত হুলাহুলির মধ্যে কাল কাটাইত। সহশিক্ষার স্নিগ্ধতার সুযোগপ্রাপ্ত এ যুগের সৌভাগ্য-শালীরা আমাদের সে যুগের আশ্রমপীড়ার বেদনার পরিমাণ বুঝিবেন না। স্কুল-কলেজ পথ-ঘাট পার্ক-লেকের নয়নমনোবিহারের অবাধ অধিকারের মধ্যে "ছাদ-বিহার" তাঁহাদের কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে।

আমার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে একে একে মেসের অনেকের আইবুড়ো অপবাদ ঘুচিতে লাগিল, এবং ১৩৩০, ৪ঠা আষাঢ়ের পর দুই মাসের মধ্যেই শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত পরিবেশই ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ ও সরস হইয়া উঠিল। আমার সহবাসী (রুম-মেট) প্রফুল্লেরও বিবাহ হইল শ্যামবাজার অঞ্চলে। তাহার শ্বশুরবাড়ি-যাত্রার দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক পর্ব উপলক্ষ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমরাও মাতিয়া উঠিতাম। প্রফুল্লের কালো মুখের ব্রণসঙ্কুল-কলঙ্ক-মুক্তির সাধনায় রোজ এক শিশি হ্যাজেলিন স্নো খরচ হইত, সাবানও লাগিত একাধিক। তাহাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া অভিসারে পাঠাইবার কাজে আমরা এমনি ব্যস্ত হইয়া থাকিতাম যে, ছাদের সিঁড়িতে দেখিতে দেখিতে শ্যাওলা পড়িল; প্রফুল্লের এসেন্স-স্নোয়ের গন্ধ মরিতে না মরিতেই বন্ধু রমেশচন্দ্র সেনের (বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক) ইহলৌকিক সদগতি করিবার জন্য আমরা সদলবলে ট্রেন, স্টীমার ও নৌকাযোগে বরিশাল ঝালকাঠি হইয়া কুলকাঠিতে উপস্থিত হইলাম।

আমি আবাল্য উত্তরবঙ্গে মানুষ। প্রধানত পূর্ববঙ্গের "কলোনি" হইলেও বরেন্দ্রভূমের নিজস্ব বিশেষত্বে উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। রমেশের বিবাহে প্রথম পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়া পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব প্রণিধান করিলাম। তাহার পর অসংখ্য বার যাতায়াত করিয়াছি, নানা বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যস্থতায় ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে, কিন্তু সেই ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে প্রথম সন্দর্শনেই যে নিবিড়

প্রেম উপজিয়াছিল, তাহার ঘোর আর কাটাইতে পারি নাই। সন্ধানী আলোক ফেলিয়া নিশীথ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া স্টীমার চলিয়াছে। নদীবক্ষে সততসঞ্চরমাণ কচুরিপানাগুলি ঢেউয়ের আঘাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাত্র আঁালোকে সে দৃশ্য অপরূপ লাগিয়াছিল। ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে শৈবালাকীর্ণ জলস্রোতের মোহ কাটিয়া গিয়া নদীর দুই তীরে দিগ্বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত নারিকেল-গুবাক-জাতীয় তরুশ্রেণীর ঋজু দীর্ঘায়ত সমারোহ জাগিল,—কালিদাস সম্ভবত 'রঘুবংশে' ইহাকেই "তমালতালীবনরাজিনীলা" বলিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ খালপথে নৌকা-যোগে যখন কুলকাঠি গিয়া পৌঁছিলাম, পূর্ববঙ্গের মহিমা তখনই প্রথম আমার প্রত্যক্ষগোচর হইল। ওই জলকাদা-পিচ্ছিল অরণ্যের মাঝখানে মানুষ যে অত সহজে অমন সুখে বাস করিতে পারে, তাহা এই ভাবে না দেখিলে আমার প্রত্যয় হইত না। মানুষগুলা সজীব ও কষ্টসহিষ্ণু, প্রতিনিয়ত বিরূপ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সব-কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের আলস্য ও অবসাদ হইতে আসিয়া সে দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর ঠেকিল। যে ডাব কাটিয়া আমাদের প্রাথমিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইল, তাহা আঁকারে যেমন অতিকায় তাহার আভ্যন্তরীণ সলিল পরিমাণে তেমনই পর্যাপ্ত। সেই সর্বপ্রথম কাছিমের ডিম খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। যাহারা অস্বাভাবিক ও আকস্মিক দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল হইয়া এই স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের সর্বনাশা ক্ষতির পরিমাণ আমি অন্তত কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারি। তাহা অপূরণীয় এবং তাহার স্মৃতি হৃদয়বিদারক।

কিন্তু এই রম্য সজল বনভূমি হইতে সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মেস হইতে শ্যামবাজারে শ্বশুরালয়ে সুচিকিৎসার্থ নীত হইলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার

পর ছয় বৎসর কাল যে পরিবেশের মধ্যে প্রধানত বাস করিতেছিলাম, তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। অসার সংসারে একমাত্র সার শ্বশুরমন্দিরে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিদিশাশুড়ী ও শ্যালিকা-শ্যালক সম্প্রদায়ের (সংখ্যায় অনেকগুলি) সেবায় এমন একটা নূতন বাদশাহীর আস্বাদ পাইলাম, যাহা ছাড়িয়া পুরাতন মেসে প্রত্যাবর্তন আর সহজ ছিল না। আমার মতিগতিই কেমন যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল। পাস করিতে হইবে, পাস করিয়া অচিরাৎ উপার্জনক্ষম হওয়াও প্রয়োজন, অবিমিশ্র আরামের মধ্যে এই বোধটুকু খোঁচার মত জাগিয়া রহিল। এই কালে একটি মাত্র সৎকার্য করিয়াছিলাম তাহা সাহিত্য-বিষয়ক ;—জর্জ সেণ্টস্‌বেরির সুবৃহৎ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসখানি বিশেষ যত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলাম, বইখানি কোনও এম. এ.-পরীক্ষার্থী বন্ধুর কৃপায় সংগ্রহ হইয়াছিল। পরে এই জ্ঞান অতিশয় কাজে লাগিয়াছিল।

ছয় নম্বর বাতুড়বাগান লেনের মেসে না ফিরিবার অজুহাত মনে মনে খুঁজিতেছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফিরিতেই হইল—কিন্তু অল্পকালের জন্য। একাসনী (single seated) ঘর না হইলে পরীক্ষার পড়া করা সম্ভব নয়, ইহাই অবিরত প্রচার করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত ২৭নং বাদুড়বাগান লেনের সাতমিশালী মেসে (প্রধানত চাকুরি-জীবীদের) তেতলার একটি সিঙ্গেল-সীটেড ঘরে লটবহর লইয়া উপস্থিত হইলাম—১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে। তেতলায় নূতন সংযোজিত নয়খানি পাশাপাশি সঙ্কীর্ণ একাসনী ঘর। ইহারই একটিতে কবি মোহিতলালের সাময়িক আশ্রম ছিল, আর একটিতে থাকিতেন বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে যুগের সর্বোত্তম ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র রায়। বৎসরাধিককালের মধ্যেই তিনি সেখানেই নিজের ঠিকুজি বিচার করিতে করিতে পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগে আপন বহুমূল্য জীবনকে প্রায় সূত্রপাতেই খণ্ডিত করিয়া বাংলা দেশেরও সমূহ ক্ষতি করেন। তাঁহার মত অসাধারণ প্রতিভাধরের

সংস্পর্শে আমি কমই আসিয়াছি। আমি এবং আমার স্কটিশচার্চ কলেজের সহপাঠী, তখন বিজ্ঞান কলেজের কেমিস্ট্রির কৃতী ছাত্র যোগেন্দ্রমোহন সাহা উভয়ে এই বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত ভক্ত ছিলাম। এই আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর পরে একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আপার সারকুলার রোডে হাত ধরাধরি করিয়া পায়চারি করিতে করিতে দুইজনেই খুব কাঁদিয়াছিলাম, মনে আছে। যোগেন্দ্রমোহন সুগার টেক্‌নলজিতে পৃথিবীজোড়া নাম কিনিয়া অনেক নূতন আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করিয়া শ্রদ্ধেয়ের যথার্থ স্মৃতিতর্পণ করিতেছেন, আমিও আত্মস্মৃতি মন্থনের অবকাশে সেই পথভ্রান্ত বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করিয়া ধন্য হইলাম।

সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসটি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে একটি আদর্শ স্থান ছিল। ইহাকে সাহিত্যের প্রথম শিক্ষার্থীর "হেয়ার হিন্দু স্কুল" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোহিতলালের উল্লেখ করিয়াছি, তেতলার আর এক ঘরে থাকিতেন বেথুন কলেজের গণিতাধ্যাপক প্রসিদ্ধ পরেশচন্দ্র সেনের পুত্র শিক্ষাবিদ্ যতীশচন্দ্র সেন; তিনি নিজে সাহিত্যরসিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঘরে সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের সমাগম হইত। এইখানেই নিয়মিত আসিতেন কবি ও কবিরাজ জীবনময় রায় এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র অস্থির প্রতিভাবান লেখক যোগানন্দ দাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমৃদ্ধ আমার আশ্চর্য স্মৃতিভাণ্ডারের খবর কেমন করিয়া একদিন শেষোক্ত দুইজন পাইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানই শেষ পর্যন্ত আমার বিজ্ঞানের কাল হইল।

আমি যে কবিতা লিখি, সে খবরও তাঁহাদের অজ্ঞাত রহিল না। পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। স্বভাবত স্নেহশীল জীবনময় রায় অচিরাৎ আমার জীবনদা হইলেন। যোগানন্দ আত্মসমাহিত গম্ভীর পুরুষ, তাঁহার সহিত যথেষ্ট মাখামাখি হইল বটে, কিন্তু 'আপনি'র

ব্যবধান আজিও ঘুচিল না, যদিও আমি তাঁহাকে সেই সময় হইতেই দাদা বলিয়া আসিতেছি। সেখানেই আর এক ঘরে ছিলেন অগিল্‌ভি হস্টেলে আমার সাহিত্যসাধনার উৎসাহদাতা, গোড়ায় কবিতা-গল্প এবং শেষে অর্থনৈতিক প্রবন্ধলেখক সুধানলিনী-কান্ত দে—এখন নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সচিব সুধাকান্ত দে। তিনি আমার পূর্বপরিচিত, প্রথমে তাঁহার ঘরেই আড্ডা জমিত। পরে যতীশচন্দ্রের ঘরেও প্রবেশাধিকার পাইলাম, সেখানে প্রধানত সাহিত্য-বিষয়ক মজলিস বসিতে লাগিল। সুতরাং যথাবিহিত বিজ্ঞানের পরীক্ষায় বসার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতে লাগিল।

আমি যে কবিতা লিখি এবং রবীন্দ্রনাথকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি—এই সংবাদ অচিরকাল মধ্যে মোহিতলালের কর্ণগোচর হইল। তিনি আপনাতে আপনি মত্ত দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ, আমাকে ডাকিয়া আলাপ করিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। অভিমানে আঘাত লাগিল। দমিয়া গেলাম, কিন্তু হাল ছাড়িলাম না। সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশ করিবার কালেও এই একই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। দুর্বল মানুষের অহমিকার সুযোগ লইতে জানিলেই কাজ হয়।

বস্তুত, মোহিতলাল সম্পর্কে তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানিতাম না। তিনি কবিতা লেখেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার ঘরে আগত ব্যক্তিদের সুললিত উচ্চকণ্ঠে তাহা পড়িয়া শোনান—এইটুকুই জানা ছিল, বুঝিতে পারিতাম তাঁহারা ভক্তজন, কেহই সাহিত্যিক নহেন। সংবাদ পাইলাম কিছুদিন পূর্বে (ফেব্রুয়ারি ১৯২২) 'স্বপন-পসারী' নামক তাঁহার একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে পাওয়া যায়। পাঁচ সিকা পয়সা কষ্টে যোগাড় করিয়া এক খণ্ড 'স্বপন-পসারী' সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। রাত্রে বইখানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া

"পুরূরবা" কবিতাটি বাছিয়া লইলাম। পরদিন অতি প্রত্যুষে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম।

কানে পৈতা তুলিয়া একটা নীল-ডোরাকাটা-লুঙ্গি-পরিহিত নগ্নগাত্র কৃষ্ণকায় কবি দাঁতন মুখে এবং বদ্‌না হাতে প্রত্যুষেই আমার দ্বার-আঙ্গিনা পার হইয়া যাইতেন। খুব যে সুদৃশ্য বোধ হইত তাহা নয়, তবু সহিয়া গিয়াছিল। শীতকালে একটা মোটা ঢিলাঢালা গেঞ্জি গায়ে চড়িত। সেদিন তাঁহার দরজায় তালা বন্ধ করিবার শব্দ কানে আসা মাত্রই আমি প্রস্তুত হইলাম। উচ্চৈঃস্বরে "পুরূরবা"-পাঠ শুরু হইল। সেই স্বল্প ব্যবধান পার হইতে হইতে মোহিতলাল সম্ভবত "পরিস্থিতি"টা ঠিক ঠাহর করিতে পারিলেন না, একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন ফিরিলেন আমার পাঠ তখন জমিয়া উঠিয়াছে। তিনি সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বদ্‌নাটি বারান্দায় নামাইয়া রাখিলেন। আড়চোখে সকলই দেখিলাম, কিন্তু পড়া থামাইলাম না। মহাদেবের পরাজয় হইয়াছিল, মোহিতলালেরও পরাজয় ঘটিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিতে বসিতে বলিলেন, ও, "পুরূরবা" পড়ছেন বুঝি! আমি তখন "বালারুণ-রক্তরাগে অমৃতায়মান্" বলিয়া পাঠ সাঙ্গ করিতেছি। বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, চমৎকার! বলিলেন, আপনার পড়া ভালই, কিন্তু একটু দোষ আছে।—বলিয়া নিজেই বইখানা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ কবিতাটি আদ্যন্ত পড়িয়া দিলেন। চৌকাঠ দখল করিয়া তিনি স্বয়ং বসিয়া আছেন, বাহিরে বারান্দায় ভিড় জমিয়া গেল। সাঙ্গ হইলে সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, আপনিও নাকি কবিতা লেখেন? শোনা যাবে একদিন।—বলিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন, শুনলাম রবীন্দ্রনাথকে নাকি আপনি গুলে খেয়েছেন, এদিকে পড়েন তো এম. এস-সি.! সামলান কি ক'রে?

সত্যই আর সামলাইতে পারিতেছিলাম না। এই মেসের পরিবেশ ছিল প্রধানত সাহিত্যিক। এক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র রায়, তিনিও সাহিত্যরসিক ছিলেন, দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে সরস প্রবন্ধ দুই-চারিটি লিখিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিও হঠাৎ চলিয়া গেলেন। তা ছাড়া মূলেই আমার বিজ্ঞানের "ঘর" নয় তো আমি কি করিব? যত দিন যাইতে লাগিল আরও অনিশ্চিতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম। এই "অনিশ্চিত" অবস্থার কথা তখনই একটি কবিতায় বিবৃত করিয়াছিলাম—

নানা পথের মাঝে ওগো কোন্‌টি আমার পথ,
আজো আমি ঠাহর নাহি পাই ;
দিশাহারা হেথায় এসে—থামল জীবন-রথ
কোনদিকেই কূলকিনারা নাই।
মনের মাঝে আঁকা আছে কাম্য ভুবনখানা,
সেথায় পাতি আসনখানি মোর,
সে দেশ কোথাও আছে কি না সঠিক নাহি জানা
তাই তো দ্বিধায় ভয়ে হই যে ভোর।
হারিয়ে দিশে নানান দিশে ব্যাকুল হয়ে ধাই
নানান বাধায় আসি আবার ফিরে,
অনিশ্চিতের মাঝখানে আজ সুনিশ্চিতে চাই ;
কান্না জাগে বুকটি আমার চিরে।
দূরের বাঁশি শুনি কানে ডাকে মধুর সুরে,
পথের কিছু না পাই ঠিকানা যে,
অন্ধ আমি ঠুকছি মাথা গোলক-ধাঁধায় ঘুরে
দূরের বাঁশি মর্মে তবু বাজে।...

ভগবান আমার সহায় হইলেন। ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ ও কঠিন ব্যাধিব্যপদেশে মাসিক বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে— এই সংবাদ বাবাকে জানাইয়াছিলাম। শেষ কয়েক মাসের বেতন কলেজে দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু পরীক্ষার মোটা ফীও দেয়

হইয়াছে। একটি পোস্টকার্ডের “পুনশ্চে” সবিনয়ে তাঁহার নিকট বাকি মাহিনা ও ফী অবিলম্বে প্রেরণ করার কথা নিবেদন করিলাম। আমাদের সংসারে তখন “ডায়ার্কি” চলিতেছে, পিতার নির্ব্যূঢ় মালিকানা স্বত্বে সদ্য-উপার্জনশীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তাবলেপ পড়িয়াছে, বাবাও সুবিধামত রাশ ছাড়িয়া কিছু কিছু বোঝা বড়দার স্কন্ধে চাপাইতেছেন। দ্বন্দ্বও যে না বাধিতেছে তাহা নয়। বাবা অক্ষমতার অজুহাতে আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়দার দরবারে বিষয়টি “রেফার” করিতে বলিলেন। বিরক্তির সঙ্গে তাহাই করিলাম। সেখান হইতে অবিলম্বে প্রার্থিত জবাব আসিল—' আমার হাত খালি, পুনরায় বাবার শরণাপন্ন হও। আমার পরীক্ষা না-দেওয়ার মতলব হাসিল হইল। কপট ক্রোধে বাবাকে জানাইলাম, আমি পরীক্ষা দিব না এবং অতঃপর আমার মাসিক বরাদ্দ আমাকে পাঠানোর দায় হইতে আপনাকে অব্যাহতি দিলাম। নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিয়া লইব। তিনি যেন ক্ষমা করেন। বাবা বা বড়দার নিকট হইতে নিয়মিত অর্থাগমের সেই শেষ। পরীক্ষার হাত হইতে এই ছলে বাঁচিতে গিয়া আমি স্বেচ্ছায় কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইলাম।

এরোপ্লেনে একক বিমানচারী ব্যক্তির পেট্রলের তহবিল অকস্মাৎ শূন্যে ফুরাইয়া আসিলে তাহাকে বাধ্য হইয়া নিরুপায় ভাবে অবতরণ করিতে হয়—সেই অবস্থায় যেখানেই আসিয়া প্লেন ভূমি স্পর্শ করুক তাহাকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেই হয়। আমারও পেট্রল ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সম্বল ছিল এম. এস-সি.র মূল্যবান বইগুলি। লক্ষ্য ছিল সাহিত্যসেবা; কিন্তু কোথায় “বাধ্যতামূলক” অবতরণ ঘটিবে, তাহা আন্দাজ করা কঠিন ছিল। কঠিন ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রথমেই একটা রূঢ় ধাক্কা খাইলাম, দেখিলাম এতদিনের আশ্রয় প্লেনখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে—নিজে অক্ষত আছি। তাহারই ভগ্নাবশেষগুলি অর্থাৎ পাঠ্য বইগুলি বেচিয়া

জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এই অসহায় অনিশ্চিত অবস্থায় মনের মধ্যে কি বিপর্যয় ঘটিল জানি না, কলমের ডগায় ব্যঙ্গকবিতার বান ডাকিল। কামস্কাটকীয় ছন্দ রচনার ছলে কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী"কে ব্যঙ্গ করিয়া একদিন "ব্যাঙ" লিখিয়া ফেলিলাম এবং প্রত্যহই একাধিক কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। আমার জীবনে এই রকমই ঘটে। পরে মায়ের কঠিন অসুখের কালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ব্যঙ্গগল্প "হসন্ত তরফদার" লিখিয়াছিলাম—অশোক চট্টোপাধ্যায় তাহার কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া কুড়ুলরামের লেখা বলিয়া 'প্রবাসী'তে (ফাল্গুন ১৩৩২) ছাপিয়াছিলেন। আরও পরে যেদিন নিতান্ত সহায়সম্পদহীন বিপন্ন অবস্থায় 'প্রবাসী'র চাকুরিতে ইস্তফা দিই, ঠিক সেই দিনই (৭ অক্টোবর ১৯৩১) 'শনিবারের চিঠি'র সদ্য-স্থাপিত ছাপাখানার ভাঙা তক্তায় বসিয়া "বিবাহের চেয়ে বড়ো" নামক একটি দীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্কাটকীয় ছন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া "আমি ব্যাঙ" পাঠ করিতেছি, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই "পুরূরবা"-পাঠের পর তাঁহার আর এই অধীনের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নাই—কবিতা শোনা তো দূরের কথা। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি তখন নজরুল ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই "বিদ্রোহী"র প্যারডি কানে প্রবেশ করিতেই আত্মবিস্মৃত ভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন। সমগ্র কবিতাটি আবার তাঁহাকে শুনাইতে হইল। তিনি আমাকে আশাতীত রূপে তারিফ করিলেন এবং মেঝেয় পাতা শতরঞ্চিতে বসিয়া আমার অন্যান্য রচনাও শুনিতে চাহিলেন। সেই দিনই সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত পূর্বে উল্লিখিত "বকুলবনের পথে" তাঁহাকে

পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই কবিতা আপনি এতদিন ফেলে রেখেছেন, ছাপিয়ে দিন, ছাপিয়ে দিন। তাঁহার সেই আদেশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সেই কবিতা খণ্ডিত ভাবে ১৩৫৯ সালের শারদীয়া সংখ্যা 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

মোহিতলালের সার্টিফিকেট পাইয়া আমি অকূল পাথারের সমূহ বিপদের মধ্যেও যেন কূল পাইলাম। ধীরে ধীরে আমার লক্ষ্য ও গম্য স্থল যেন নির্দিষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। আরও শুভ যোগাযোগ ঘটিতে বিলম্ব হইল না। এই সময় যোগানন্দ দাসের মুখে প্রায়ই একটি নূতন পত্রিকার আশু প্রকাশ সম্ভাবনার কথা শুনিতাম। বিলাত হইতে সন্থ-প্রত্যাবৃত্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল হইয়াছে, তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। উইট, হিউমার ও স্যাটায়ার রচনায় তাঁহার অসাধারণ স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল—পরে তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তাহা বুঝিয়াছিলাম। এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বাংলা দেশে আমি দেখি নাই। এ দেশের হাস্য ও ব্যঙ্গ রসিকদের রুচি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নগামী; অশোক চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষিত মার্জিতরুচি রসিক, কাহাকেও "বিলো দি বেল্ট হিট" করিতে হইলে নিভৃতে একান্ত অন্তরঙ্গ মহলেই তাহা করিতেন। যাহা হউক, গুরুগম্ভীর 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার এই রস-রসিকতা চরিতার্থ হইবার উপায় ছিল না বলিয়া তিনি পত্রান্তর প্রকাশের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কারণও ঘটিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রবর্তিত স্বরাজ্য দলের রাজনীতি চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করে নাই। 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" প্রবীণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তি প্রয়োগে যে চেষ্টা করিতেন, তরুণ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের তাহা মনঃপূত হইত না। সুতরাং 'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভব অনিবার্য হইল।

পরে জানিয়াছিলাম, একদা সন্ধ্যার আবছায়া-অন্ধকারে হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া চানাচুর-চিনাবাদাম চিবাইতে চিবাইতে 'শনিবারের চিঠি'র নাম ও নীতি পরিকল্পিত হয়। অশোক চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান, সঙ্গে ছিলেন যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী ও বর্তমানে সার-কারখানা-খ্যাত সিঁদরির টাউন অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর প্রভাকর দাস। আমি তখন সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেন মেসের সঙ্কীর্ণ কোটরে ক্ষুৎপিপাসাতুর অসহায় অবস্থায় চিঁহি চিঁহি করিতেছি, পাখায় জোর পাইলে কোন্ গগনে উড্ডীন হইব তাহাও নিজে জানি না।

ব্যঙ্গরচনায় হাত পাকাইতেছিলাম, সুতরাং একটি ব্যঙ্গপত্রিকা প্রকাশিত হইবে জানিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, কে বা কাহারা তাহা প্রকাশ করিবে তাহা জানা আমার পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। যোগানন্দ দাস আসিতেন যাইতেন, বাপের বাড়ির দেশের কোন লোক শ্বশুরবাড়িতে বেড়াইতে আসিলে সদ্য-বিবাহিতা বধূ বাপের বাড়ির খবর শুনিবার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, সেই ব্যাকুলতা লইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। আমার মনের বিরহকাতর অবস্থা যোগানন্দদা বুঝিতেন না, কাটা কাটা কঠিন জবাব দিয়া তিনি আমাকে নিরস্ত ও নিরাশ করিতেন। তাঁহার ভাবখানা সর্বদাই এইরূপ ছিল, সে সব অতি গোপনীয় গুহ্য কথা; তুমি বিজ্ঞানের আদার ব্যাপারী, সাহিত্যের জাহাজের খবরে তোমার প্রয়োজন কি? তাঁহার নিকট হইতে কোনদিন কোন কথাই আদায় করিতে পারি নাই—এই ক্ষোভ আমার এখনও যায় নাই।

কিন্তু স্নেহাশ্রয় বিস্তার করিয়া আপন তপ্ত পক্ষপুটে আমাকে আশ্রয় দিলেন জীবনময় রায়। তিনি সর্বপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াই ছিলেন। আমার মাসিক অর্থাগমে ছেদ ঘটিয়াছে সে সংবাদ তিনি জানিতেন, এম. এস-সি.র পাঠ্যপুস্তক

দামে ও ওজনে ভারী হইলেও পরিমাণে অফুরন্ত নয়; সুতরাং আমার কূপোদক ধীরে ধীরে কাদায় আসিয়া ঠেকিতেছিল, দৈনিক জীবনযাত্রা ক্রমশ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছিল।

একটি প্রশ্ন স্বতই বুদ্ধিমান পাঠকের মনে জাগিবে, এখানেই যাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। এই নিদারুণ অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে কলিকাতাবাসী শ্বশুর মহাশয়ের গৃহে আমি আশ্রয় লইলাম না কেন? সত্য বটে, তিনি কলিকাতাতেই স্থায়ীভাবে সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন এবং একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীও ছিলেন। তাঁহার ঘাড়ের উপর একবার চাপিতে পারিলে তাঁহার দ্বারাই আমার তদানীন্তন ও ভবিষ্যৎ আর্থিক যাবতীয় বেদনার উপশম অচিরাৎ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি লর্ড সিংহের সহিত সম্পর্কের দরুন কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন্ন মহলে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু আমার অভিমানে বাধিল। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, একান্ত আত্মনির্ভরশীল ও সক্ষম না হইয়া স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য শ্বশুরবাড়িমুখো হইব না। অনুরোধ-উপরোধ সবিনয়ে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। আজ নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, সেদিন উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই জামাই-বারিকের আস্তাবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার অকালমৃত্যু ঘটে নাই। ভগবান আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

আমি তখনও মেসে খাই-দাই এবং আড্ডা দিয়া বেড়াই, আমার চাকুরির খোঁজে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান স্নেহময় জীবনময়; এই সময়ে মোহিতলালের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার খাতাখানি যতই ব্যঙ্গকবিতায় বোঝাই হইতে লাগিল, তিনিও ততই খাতা-বগলে আমাকে লইয়া পরিচিত মহলে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমটা গিয়া আমার পরিচয়-পর্বটা শেষ করিলেই আমি দম দেওয়া ঘড়ির মতন বাজিতে থাকিতাম—কাজী নজরুলের প্যারডিটাই বেশি

বাজাইতে হইত। একদিন মেসের তেতলার বারান্দাতেই তিনি একটি গানের মজলিসের আয়োজন করিলেন, হাস্যরসিক নলিনীকান্ত সরকার হাসির গান গাহিবেন। চন্দ্রগ্রহণের দিন কবিরাজ জীবনকালী রায়ের ঘরে তাঁহাকে তবলা বাজাইতে দেখিয়াছিলাম, তিনি যে স্বয়ং গান গাহিতে পারেন আবার হাসির গান রচনা করিতেও পারেন তাহা দেখিয়া ও জানিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। তাঁহার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটিল। সে পরিচয় কখনও একদিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অথচ আমরা দুই জনেই পরস্পরের নাকের কাছে বহুবার আগুন লইয়া মহরম খেলিয়াছি। ইহার কারণ, এমন বন্ধুবৎসল অথচ নির্বিরোধ মানুষ কদাচিৎ মেলে। নজরুল এবং দিলীপকুমার উভয়েই তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অথচ আমি এই দুই জনকেই কম আঘাত হানি নাই। ইহাতে বন্ধু-বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহার কারণ নলিনীদা গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন, আমার ব্যঙ্গ কখনই ঈর্ষা-(malice)-প্রণোদিত ছিল না। সাহিত্য-সংস্কারে আঘাত লাগিলে লেখার দ্বারাই যথাসাধ্য আঘাত করিতাম, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনও দিনই সেই বিবাদকে টানিয়া আনি নাই।

সেই হাসির গানের আসরেই আমার বন্ধু ও সহকর্মী সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বয়সে আমার অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের ছোট হইলেও তখনই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরি করিতেন। মোহিতলালের প্রত্যক্ষ ছাত্র না হইলেও ছাত্রের বন্ধু হিসাবে তিনি মোহিতলালকে গুরুর মত সমীহ ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন, এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রের মত সস্নেহ ও সকর্তৃত্ব ব্যবহার করিতে করিতে মোহিতলালও ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ছাত্র নন। সুবলচন্দ্র স্কুলজীবন হইতেই সাহিত্যিক-ঘেঁষা ছিলেন, প্রসব না করিয়াই গোপালের মা হইয়াছিলেন। তাঁহার এঁচোড়পক্কতার (অবশ্য সাহিত্য ব্যাপারে) বহু কাহিনী পাঁচজনকে শুনাইবার মত। নিতান্ত কাঁচ

বয়সেই দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি মোহিতলালকে নিত্য সঙ্গদান করিতেছিলেন। মজলিসে পাঁচজনকে "এণ্টারটেন" করিবার মত বিবিধ গুণ তাঁহাতে ছিল—ভাল ম্যাজিক দেখাইতে পারিতেন, মিমিক্রি বা কণ্ঠানুকৃতিতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে গুণের জন্য তিনি বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়া শেষ পর্যন্ত একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের বৈবাহিক পদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা হইতেছে তাঁহার নিরলস অকুণ্ঠ সেবা ও সাহচর্যের ক্ষমতা। আমাদের সুবলচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ধের নড়ি হইয়া পড়াতে অনেকের হিংসা উদ্রিক্ত হইয়াছে।

জীবনদার কৃপায় সর্বপ্রথম শ্যামবাজারে একটি ট্যুইশানি জুটিল, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, ছাত্রটি আই. এস-সি. পড়ে। তিন মাস যাইতে না যাইতে জীবনদা ঝামাপুকুরে আরও এক জোড়া ছাত্র জুটাইয়া দিলেন, ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী, বেতন একুনে পঁচিশ। পঁয়তাল্লিশ টাকায় রাজার হালে চলিবার কথা, কারণ তখনও সিগারেট ধরি নাই। কিন্তু জীবনদা চেষ্টা করিলে কি হইবে? ভাগ্য মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। তিন মাস পরে একদিন শ্যামবাজারের ছাত্রটির পিতা দোতলার বারান্দায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া নীচে দণ্ডায়মান আমাকে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ম্যাস্টার, ছেলে কেমন পড়ছে? পরে জানিয়াছিলাম ভদ্রলোক আমাকে অপমান করিবার জন্য প্রশ্ন করেন নাই, তাঁহার ওইসাই বদন, কিন্তু আমার চট্‌ করিয়া রাগ হইয়া গেল। তর তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে অভদ্র অসভ্য প্রভৃতি গালাগালি দিয়া তেমনই দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম। আর পড়াইতে গেলাম না। অর্থাৎ আমার আয়ের পারা চট্‌ করিয়া পঁয়তাল্লিশ হইতে পঁচিশে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবনদা

একবার মাথা চুলকাইলেন, একটু বকিলেন এবং শেষ পর্যন্ত 'কুছ পরোয়া নেহি' বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিলেন।

ঠিক এই সময়ে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই শনিবার (১০ই শ্রাবণ ১৩৩১) সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইল। সম্পাদক ও মুদ্রাকর—যোগানন্দ দাস। ৯১নং আপার সারকুলার রোড প্রবাসী প্রেসে মুদ্রিত এবং ১০৫নং আপার সারকুলার রোড ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের ঠিকানা হইতে প্রকাশিত।

দ্বাদশ তরঙ্গ

আশ্রয়-কোটর

যত কৃচ্ছ্রসাধনই করা যাক, মাসিক পঁচিশ টাকায় ঘরভাড়া সমেত দৈনিক খোরাক চলে না। এক বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম—ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ, তা সে শ্বশুরবাড়িতেই হউক বা বন্ধুবান্ধবদের কাছেই হউক। জীবনদার চেষ্টার বিরাম ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টাখানেকের জন্য ঝামাপুকুরে পড়াইতে যাই, প্রায় বেকারই ছিলাম। প্রচুর লিখিয়া ও পড়িয়াও সময় কাটিতেছিল না। পরবর্তী জীবনে কি করিব তাহার ঝাপসা নীহারিকা মূর্তি মানস-আকাশে ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল। সে মূর্তি যে ছাপাখানার, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। প্রূফ দেখিতে শেখার তাগিদ স্বতই মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল, সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরির বা লেজার-রক্ষার নয়। মোহিতলাল তখন 'নব্যভারতে' ও 'ভারতী'তে নিয়মিত লিখিতেছেন। তাঁহার নিকট প্রূফ আসিত, তিনি একা বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। সে সুযোগ অবহেলা করিলাম না। মোহিত-বাবুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কাপি-হোল্ডারের পদে বহাল হইয়া গেলাম; মাঝে মাঝে তাঁহার পড়া প্রূফ টানিয়া লইয়া চিহ্ন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে হইতে দুই-একটা খোদকারি করিয়াও আনন্দ পাইতে লাগিলাম।

ডবল-ক্রাউন ষোলপেজী আকারের একখানি খাম, উপরে সবুজ কালিতে ছাপা চাবুকপ্রহাররত এক ভীম অথচ সুঠাম বীরমূর্তি —যোগানন্দ দাস তাঁহার ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া আমার নাকের সম্মুখে ধরিলেন। সময় প্রাতঃকাল হইলেও শ্রাবণের আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল, সদ্য-বর্ষণে আমার ঘরের সম্মুখের বারান্দা

সিক্ত। উল্লাসে ছোঁ মারিয়া খামটি কাড়িয়া লইয়া মূল্যসংগ্রহে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। খামে কাদাজল মাখামাখি হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আবরণ খুলিয়া ভিতরের বহুমূল্য বস্তুটিকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রথম সন্দর্শন ঘটিল,—প্রতিকূল অবস্থায় প্রথম সন্দর্শনেই নিবিড় প্রেম জন্মিল। এক আনা মূল্য দিয়া বস্তুটির মালিক হইলাম। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা। তারিখটাও স্পষ্ট মনে আছে ১১ই শ্রাবণ রবিবার ১৩৩১—২৭ জুলাই ১৯২৪; প্রথম প্রকাশের ঠিক পরের দিন।

যোগানন্দ দাসের দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আড্ডা দিবার সময় ছিল না, তিনি কাগজ বেচিতে ও বিলি করিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি বিদায় লইতেই আমি গুরু গুরু মেঘগর্জনের মধ্যে বত্রিশ পাতার চটি পত্রিকাখানি পড়িতে বসিলাম। মনে হইল, মেঘমেদুর অম্বরের তলে শ্যামবনভূমির মাঝখানে সেই প্রথম প্রিয়সম্ভাষণ শুনিলাম। কোন লেখাতেই যথাযথ নাম নাই, প্রত্যেকটি বেনামে লেখা—একমাত্র সম্পাদক যোগানন্দ দাসের কোনও লেখা থাকিলে তাহার লেখককে চিনি, বাকি সব অজ্ঞাত লেখক। কিন্তু হইলে কি হয়। মনে হইল, সবই যেন আমার লেখা, আমি লিখিলেও ঠিক এমনই লিখিতাম। একটা অদ্ভুত আত্মীয়তা-রস অন্তরে সঞ্চারিত হইল, অকারণ পুলকে মন ভরিয়া গেল। প্রথমেই "মুখবন্ধে" পড়িলাম—

> "...আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এমন কি উদ্দেশ্যহীনতাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য যদি কখনো আপনা-আপনি ফুটেও ওঠে, তা হ'লে আশা যে, তা আপনা-আপনি ঝ'রেও পড়বে। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কখনো উদ্দেশ্যযুক্ত ও কখনো উদ্দেশ্যহীন ক'রে চালাবে। উদ্দেশ্যের বা উদ্দেশ্যহীনতার খাতিরে আমরা নিজেদের বিসর্জন দেব না। নিজেদের স্বভাব, জীবন ও আগ্রহের ক্রমবিকাশের পথ ধ'রে চলতে চলতে আমাদের যা ভাল মনে হবে

আমরা তারই অনুসরণ করব—কোন নির্দিষ্ট 'পলিসি'র অনুসরণ করতে গিয়ে জীবন, স্বভাব ও চিরপরিবর্তনশীল হৃদয়াকাঙ্ক্ষাগুলিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন ক'রে ফেলব না। এই যে আমাদের উদ্দেশ্য,—জগতে স্বাধীনতার প্রয়াস, এর ছায়া আমাদের সব কাজের উপর পড়বে।

…ধর্ম-জগতে আমরা কোন-কিছুকে সাধারণত অভ্রান্ত, চিরসত্য অথবা শেষ ব'লে স্বীকার করব না।…ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন দূর দেশকে মানব না—সময়ের ক্ষেত্রে তেমনি অতীতকে মানব না। দূর বা অতীত আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আমাদের মধ্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু সে আমাদের মন জুগিয়ে—জোর ক'রে নয়।

…অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব, কিন্তু অলমতি-বিস্তরেণ।"

বলা বাহুল্য, ইহা 'শনিবারের চিঠি'র ভগীরথ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের রচিত সিদ্ধান্ত। তিনি আজ পর্যন্ত ইহাতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহার মূল সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় হয় নাই। অপরে ক্রোধে বা উত্তেজনার বশে উদ্দেশ্যমূলক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি বরাবর বৈদান্তিক নিষ্কাম নির্লিপ্ততা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন।

আর পলায়নী নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তি বরাবর বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন আদি সম্পাদক যোগানন্দ দাস। 'শনিবারের চিঠি'র প্রবর্তক-দলে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রচনাকুশলী, যেমন তাঁহার তীক্ষ্ণ ধী, তেমন তাঁহার বক্রোক্তি জ্ঞান, ছন্দজ্ঞান নিখুঁত। কিন্তু কোন কিছুকে আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহকারে ধারণ করিবার শিবশক্তি তাঁহাতে ছিল না, যখনই বুঝিতেন তিনি কাজে লাগিতেছেন তখনই তিনি পলায়ন করিতেন। প্রতিভার এত বড় ব্যর্থতা আমার জীবনে আর দেখি নাই। প্রথম সংখ্যাতেই "প্রকাশ রায়" এই বেনামীতে যোগানন্দ দাসের "জীবন-দর্শন" প্রকাশিত হইয়াছিল। নীচের কয় লাইনে তিনি যে আত্মকাহিনী সেদিন লিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়—

"শুধু 'বেঁচে থাকার নাম কি জীবন?'—না।

আমি যে বেঁচে থাকতে আরম্ভ করেছিলাম তার কৃতিত্বটা আমার ছিল না। সেখানে আমার বাবা-মার দায়িত্ব। তার পর তাঁদের লালনে আর তাড়নে পাঁচ-আর-দশে পনেরো বছর বেঁচেছি (শাস্ত্রমতে)। তার পর প্রাইভেট টিউটর, তার পর শ্বশুর-মশাই ও তাঁর সুপারিশে-পাওয়া চাকরির বড়-কর্তারা আমাকে 'বাঁচিয়ে' রেখেছেন। বুড়ো বয়সে আমার দেড় গণ্ডা ছেলের শ্বশুরদের টাকা আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার স্ত্রীরাও আমায় কম বাঁচায় নি। সত্যিই আমি বেঁচে গেলাম। জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত আমি বেঁচেই চলেছি।

কিন্তু এর মধ্যে জীবন কই? কোথাও নেই। কেন না, কোনদিনই তাকে জন্ম দিই নি। আমার বাবা ও মা আমারই জনক-জননী, আমার জীবনের নন। তার একমাত্র জন্মদাতা আমি নিজে।"

নিজেকে ব্রহ্মচারী বানাইয়া যোগানন্দ দাস সে দিক দিয়াও "বাঁচিয়া" গিয়াছেন!

"মৌলা দোপেঁয়াজি" বেনামে হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যে" সেই দিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উদ্দেশ্য বা দর্শনের বালাই তাঁহার ছিল না, তিনি ছিলেন নিছক হিউমারিস্ট, নাম-করা সার্কাস দলের অতি সক্ষম ক্লাউন, ঝালে ঝোলে অম্বলে সবেতেই আছেন, কিন্তু কিছুতেই স্পেশিয়ালিস্ট নন। "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে"র বিজ্ঞাপনকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি সে দিন লিখিয়াছিলেন—

"গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

আবার গর্জিয়া উঠিল, সারা বাংলা দেশ কেরামতী-সাহিত্য-মন্দিরের কামান-গর্জনে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ দেখুন, পিল্ পিল্ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা বাংলার সকল নরনারী কামান-গর্জনে সচকিত হইয়া কেরামতী-সাহিত্য-মন্দিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে! কিন্তু এ কামান মানুষ মারিবার জন্য নহে—বিলাতী হিংস্র শ্রাপ্নেল্ নহে, ইহা তাপিত হৃদয়ে শান্তিবারি বরিষণকারী জলদগোলা। বেদ-বিশারদ মহাপণ্ডিত প্যালারাম কাব্যতীর্থের 'চঞ্চুবিক্রমণিকা' এই কামান!!

ছেলেমেয়ে কিম্বা যুবাবৃদ্ধকে উপহার দিবার এমন উপদেশপূর্ণ বই আর নাই। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'কবুতরে'র সম্পাদক এই পুস্তক পাঠে বলেন, 'এই বইয়ের মধ্যে যুবক-যুবতীর চপল হাস্য-পরিহাস নাই, ঘটনা-বৈচিত্র্যের ম্যাজেণ্টা রং নাই, বিরহী-বিরহিণীর চোখের জল নাই।'…"

বস্তুত, 'শনিবারের চিঠি' গোড়া হইতে কিছু কাল পর্যন্ত শিশু-ব্যবহার্য খর্বায়তন ত্রিচক্রযানই ছিল; অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এই তিন চাকায় উচ্চাবচ অনেকেই ঠেলা মারিয়াছেন, কিন্তু ভূমিস্পর্শ করিয়া ইঁহারা তিন জনই মাত্র ছিলেন।

আমি সর্বাপেক্ষা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলাম শেষ পৃষ্ঠার ইস্তাহার-দৃষ্টে—

"লেখা চাই না। টাকা ইত্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা…"

"লেখা চাই না" এমন দম্ভোক্তি ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। নিজে লিখিয়া থাকি, লেখা প্রকাশের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, তথাপি কথাটা ভাল লাগিল। আজ বলিতে বাধা নাই, 'শনিবারের চিঠি' যদি কোনও মন্ত্রবলে আজও পর্যন্ত টিকিয়া থাকে তাহা এই মন্ত্র—"লেখা চাই না"। আমাদের বলিবার কথা আছে, আমরা নিজেরা লিখিয়া অন্যকে শুনাইব, অন্যের কথা অন্যকে শুনাইবার জন্য আমাদের কাগজ নয়। আজকালকার ছেলেরা নূতন পত্রিকা-প্রকাশে মনস্থ করিয়া যখন লেখার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে এই মন্ত্রটি শিখাইবার চেষ্টা করি। যাহারা শোনে তাহারা বাঁচে, যাহারা শোনে না তাহারা হীন উঞ্ছবৃত্তি করিতে করিতে শোচনীয় ভাবে মৃত্যু বরণ করে। শিশু-মৃত্যুর আবর্জনায় বাংলার সাময়িকপত্রের প্রাঙ্গণ রুদ্ধ হইয়া আছে। সম্পাদক বা পরিচালকদের পরমুখাপেক্ষিতাই ইহার কারণ। 'শনিবারের চিঠি'ই এ যুগে স্বাবলম্বিতার পথ দেখাইয়াছিল।

যাহা হউক, প্রথম সংখ্যাতেই তিন প্রধানের পরিচয় পাইলাম, দুইজনকে একেবারে না চিনিয়াই। ইঁহারা দীর্ঘকাল আমার

সহযোগী ছিলেন এবং এখনও বন্ধু আছেন। পরে ইঁহাদের মুখে 'শনিবারের চিঠি'র সূত্রপাতের ইতিহাস যেরূপ শুনিয়াছিলাম ঠিক কুড়ি বৎসর পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তেই ("নিবেদন"—পৌষ, ১৩৩৯) তাহা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম—

> ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের এক ক্ষান্তবর্ষণ সন্ধ্যায় উত্তর কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্বদক্ষিণ সীমান্তের এক বেঞ্চির উপর বসিয়া ভাজা চিনাবাদামের খোসা ছাড়াইয়া খাইতে খাইতে যাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে কল্পনারূপী 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম আবির্ভাব ঘটে··· কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি তখন সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন। নূতন কিছু, অদ্ভুত কিছু করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল। বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া শনিবারে শনিবারে একখানি চটি সাপ্তাহিক বাহির করিবার প্রস্তাব তিনিই করেন। 'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে ইঁহার স্থান সর্বপ্রথম; ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়।
>
> কল্পনাব্যাপারে ইঁহার সঙ্গী দুইজনও পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না—শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস সম্পাদক ও মুদ্রাকর হইবেন স্থির হইয়া গেল; শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় হইলেন কর্মাধ্যক্ষ। বর্ষারজনীর অন্ধকার আকাশের তলে গ্যাসালোকিত হেদুয়া পুষ্করিণীর তীরে 'শনিবারের চিঠি' নাটকের 'প্রস্তাবনা'-পাঠ হইয়া গেল।
>
> ১০ই শ্রাবণ প্রথম যবনিকা উঠিলে দেখা গেল এই ত্রয়ীর সঙ্গে আরও দুইজন আসিয়া জুটিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রভাকর দাস। ইহার পর আরও অনেকে জুটিয়াছেন এবং এমন সকল ব্যক্তি জুটিয়াছেন যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইলে বাঙালী পাঠক বিস্মিত হইবেন কিন্তু তবু এই পঞ্চরত্নই প্রথম।
>
> 'শনিবারের চিঠি'র ভঙ্গী আমার ভাল লাগিয়াছিল—ইহাতে লিখিবার জন্য আমি উৎসুক হইলাম। সম্পাদক শ্রীযোগানন্দ দাসের সহিত মৌখিক পরিচয় ছিল, তাঁহার নিকট ঘুষ কবুল করিয়াও কৃতকার্য হইলাম না।

ইহা মোটেই অত্যুক্তি নয়। যোগানন্দ দাসকে আমি সত্যসত্যই সেই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে একটি লেখা ছাপাইবার জন্য দশ টাকা পর্যন্ত দিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহার সেই দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িলেন। বুঝিলাম, সহজ পথে কাজ হইবে না, কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম সংখ্যাতেই কাজী নজরুল ইসলামকে ব্যঙ্গ করিয়া "গাজী আব্বাস বিটকেল" এই নামে দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল; আমিও স্বাধীনভাবে "বিদ্রোহী"র কবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলাম। মনে মনে আঁচিয়া রাখিলাম, এই বিটকেলী-পথই 'শনিবারের চিঠি'র সহিত আমার সংযোগের পথ।

এক সংখ্যা, দুই সংখ্যা, তিন সংখ্যা—পর পর পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি সংখ্যা বাহির হইল; এক আনা হিসাবে পাঁচ আনা ব্যয় করিয়া সব কয়টিই স-খাম সংগ্রহ করিলাম এবং আয়ত্তও করিলাম; ঢং-ঢাং ধরন-ধারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মজাই যেখানে মোদ্দা উদ্দেশ্য, সেখানে বুঝিবার হাঙ্গামা নাই। মজাতে আমারও আসক্তি। মেসে নোটিশ পড়িয়াছে, তহবিল শূন্য, ডাইং ক্লীনিং হইতে কাপড়জামা ছাড়াইয়া আনিবারও সঙ্গতি নাই। জীবনদা একদিন শুভপ্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন, চল, একটা মতলব ঠাউরাইয়াছি। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুগমন করিলাম। গলি পার হইয়াই সারকুলার রোড, সারকুলার রোড কোণাকুণি পার হইয়া রামমোহন রায় রোড, পনের নম্বর বাড়ি। ভালই জানা ছিল—'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি।

তখন বেলা নয়টা বাজিয়াছে। দেউড়িতে দারোয়ান ছিল। জীবনদা অগ্রসর হইয়া ক্ষুদুবাবুকে খবর দিতে বলিলেন। ক্ষুদুই যে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম তাহা তখনও জানা ছিল না। কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ণ বারান্দায় অপেক্ষা করিবার পর রাত্রিবাসপরিহিত একজন সুশ্রী সবলকায় যুবকের দর্শন মিলিল। আমার সহিত

মুখামুখি হইবার পূর্বে জীবনদা তাঁহাকে সম্ভবত আমার পরিচয় ও আর্জি পেশ করিলেন। তারিখটা যত দূর মনে পড়ে, ৯ই ভাদ্র—আমার জন্মদিন। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিলাম—হঠাৎ দক্ষিণ বাহুমূলে একটা রূঢ় আঘাত খাইয়া চমকাইয়া উঠিলাম। চিত্র-বিচিত্র গাত্রবাস, সহসা মনে হইল রয়াল বেঙ্গল টাইগারের থাবা। ব্যাঘ্র মহারাজ বলিলেন, শরীরটা তো ভাল, শুনলাম কবিতা লেখেন, পাঞ্জা লড়তে পারেন কি? জীবনদা বলিবার পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, ইনিই 'শনিবারের চিঠি'র ব্রহ্মা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। এক মুহূর্তের দ্বিধা, সঙ্গে সঙ্গেই বলিলাম, পারি বইকি। বারান্দায় দাঁড়াইয়াই নিঃশব্দে পাঞ্জা লড়া হইল—জীবনদা কুতূহলী দর্শক। ডান হাতের লড়াইয়ে আমি হারিলাম, বাম হাতের যুদ্ধে অশোক চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই ঘর্মাক্ত; অশোক চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, এর ওপরে আপনার কবিতা যদি ভাল হয় তা হ'লে আপনার ছবিসুদ্ধ 'প্রবাসী'তে ছাপিয়ে দেব। বলিবার অধিকার তাঁহার ছিল, তিনি তখন 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'-এর সর্বময় কর্তা। বলিলেন, স্বাস্থ্যের সঙ্গে কবিতা এ দেশে বেমানান। দেখা যাক। আজ সন্ধ্যেয় 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় হাজির হবেন—'প্রবাসী' আপিসের দোতলায়। সঙ্গে লেখা নিয়ে যাবেন 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে। আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলে জীবনদাকে আরও কিছু বলিলেন, অনুমানে বুঝিলাম আমার চাকুরি-সংক্রান্ত। জীবনদা আমাকে বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু নির্দেশ দিলেন সন্ধ্যার আড্ডায় "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" যেন নিশ্চয়ই লইয়া যাই।

কিন্তু জীবনদার আমার উপর যত বিশ্বাসই থাকুক, আমি ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইব স্থির করিলাম। প্রথম চার সংখ্যায় কবিবর গাজী আব্বাস বিটকেলকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া সম্ভবত বাড়াবাড়ির ভয়ে তাঁহাকে আসর হইতে সরাইবার জন্য 'শনিবারের চিঠি'র কর্তৃপক্ষ চতুর্থ সংখ্যার শেষে তাঁহাকে মহরমের গোঁয়ারায় অগ্নিদগ্ধ

করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদেরই ধারা ধরিয়া একটি কবিতায় তাঁহাকে আবার "আবাহন" করিলাম। নাম লইলাম "ভাবকুমার প্রধান"। "প্রকাশের বেদনা," "ছাদবিহার" ও "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র সঙ্গে সেটি লইয়া অতীব ভয় ও সঙ্কোচের সহিত ৯১ নং আপার সারকুলার রোডের দ্বিতলের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে—'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় প্রবেশ করিলাম। ঘরটির মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তাহার কেন্দ্রস্থলে অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশেপাশে—চেয়ারে টুলে বেতের সোফায় জানালার পৈঠায় আট-দশজন আড্ডাধারী বসিয়া, একসঙ্গে শিককাবাব-পরোটা ও সিগারেট চলিতেছে, এবং কেহ কেহ 'শনিবারের চিঠি' খামে ভরিতেছেন। যোগানন্দ দাস এই দলে ছিলেন। আমিও আহূত হইলাম। খাওয়া-পর্ব চুকিলে আপনা হইতেই অনুভূত হইল খামে পত্রিকা ভরাটা একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা মজার খেলা যেন। ঘড়ি ধরিয়া দেখা গেল, ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল ফার্স্ট হইলেন। পকেটে লেখাগুলি খোঁচাইতেছিল, আমি সুবিধা করিতে পারিলাম না। শেষে এক ফাঁকে মরীয়া হইয়া ভাঁজ-করা লেখাগুলি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ডান পাশের দেরাজ খুলিয়া সেগুলি তাহার গহ্বরে প্রায় নিক্ষেপ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন গর্তে পড়ার আঘাত পাইলাম। আজ ঝুনা সম্পাদক হইয়া বুঝিতে পারি, এই আঘাত লেখক মাত্রকেই অনিবার্য ভাবে পাইতে হয়। বিচারকদের পক্ষে লেখকের মর্জিমত লেখা পড়িয়া দেখা কদাচিৎ সম্ভব হয়, ইহাকে সম্ভব করিতে হইলে সম্পাদক বা নির্বাচককে যতটা সদয় ও সহৃদয় হইতে হয় বর্তমান যুগে তাহা একান্ত দুর্লভ।

পরদিন যথাসময়ে হাজিরা দিবার জন্য হুকুম হইল, আমি রায়ের প্রতীক্ষায় মামলার আসামীর ব্যাকুলতা ও অস্বস্তি লইয়া কোন

প্রকারে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া আপিসে বা আড্ডায় দর্শন দিলাম। নির্মম অশোক চট্টোপাধ্যায় যেন আবহাওয়ার সংবাদ দিতেছেন এইরূপ উদাসীন ভাবে একবার মাত্র বলিলেন, আপনার লেখা মনোনীত হয়েছে।' হ্যাঁ, আপনি প্রূফ দেখতে জানেন? বলিলাম, একটু একটু। ষষ্ঠ সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত "থাঁটি" নামক একটি রচনার প্রূফ আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায় চলিয়া গেলেন। আমি সর্বাগ্রে লেখকের নাম দেখিলাম—"বিনামা", কিন্তু পড়িতে পড়িতে লেখার ঢং ও বানানের কায়দা দেখিয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিলাম, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা। 'প্রবাসী'র নিয়মিত পাঠক আমি, তাঁহার ভঙ্গি আমার অপরিচিত ছিল না, বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রূফটি দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় খালি গায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি সপরিবারে তখন 'প্রবাসী' আপিসেরই একাংশে বসবাস করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ দাস আসিলেন এবং একটি ছোটখাট দলসহ অশোক চট্টোপাধ্যায়ও পুনরাবির্ভূত হইলেন। আসর জাঁকিয়া উঠিল। আমি বোকার মত অশোকবাবুকে বলিলাম, এ যে দেখছি যোগেশচন্দ্র রায়ের লেখা! অশোকে-যোগানন্দে-হেমন্তে চোখে-চোখে কথা হইয়া গেল, বুঝিলাম তাঁহারা আমার সাহিত্য-বুদ্ধির তারিফ করিলেন। প্রূফ কেমন দেখি সে পরীক্ষা লইলেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, দুই-চারিটা ভুল নিশ্চয়ই আমার অপটু দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তেমন মারাত্মক কিছু নয়। সেই রাত্রে সভাভঙ্গের পূর্বে আমি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে, 'প্রবাসী'র নয়, 'শনিবারের চিঠি'র নয়—অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী নিযুক্ত হইলাম; পুলিনবিহারী দাসের 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' পুস্তক মুদ্রণের ভার আমার উপর পড়িল। ভাষা সংশোধন করা, প্রূফ দেখা এবং প্রেস-ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র সরকারকে নিয়মিত তাগাদা দিয়া দ্রুত কার্যোদ্ধার

করা—ইহাই হইল আমার বৈতনিক কাজ। অবৈতনিক কাজই বেশি, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা, খামে চিঠি ভরা এবং প্রয়োজন হইলে প্রূফ দেখা। চারিটি লেখা আগাম দেওয়া ছিল, সুতরাং লেখার কাজ আপাতত নয়।

নিয়মিত আড্ডায় উপস্থিত হওয়ার অর্থই হইল ঝামাপুকুরের পঁচিশ টাকা বেতনের টিউশনিটি খোওয়া যাওয়া। গেলও। আবার সেই হরেদরে পঁচিশ। সুতরাং বিদায় সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেস, বিদায় মোহিতলাল প্রমুখ সাহিত্যিকগোষ্ঠী, বিদায় স্নেহপ্রবণ বঙ্কিমচন্দ্র রায়। কিন্তু যাই কোথায়? অগতির গতি জীবনময় রায় ছিলেন, তিনি আমাকে এক রকম হাত ধরিয়াই ১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে লইয়া গেলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-স্থাপিত বিশ্বভারতীর আপিস ও গ্রন্থালয়। চারতলার একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র শৌচ-প্রকোষ্ঠে আমার স্থান হইল। আসবাবের মধ্যে সামান্য বিছানাপত্র, তাহা সেই খুপরিতে ফেলিয়া রাখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে সস্তা আহার্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম, দৈনিক আহার্যের ব্যয় পাঁচ আনার বেশি লাগিত না। বাকিটা চায়ের দোকানে ব্যয় করিতাম।

বিশ্বভারতীর স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সাঁতরা তখন নিদারুণ ফুস্‌ফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দশ নম্বরেই শয্যাশায়ী ছিলেন, বিশ্বভারতীর কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন। জীবনদা পরদিন আমাকে লইয়া তাঁহার কাছে হাজির করিলেন। প্রশান্তবাবু বৈজ্ঞানিক লোক, যুক্তিবাদী—অকারণে কোনও কিছু করা বা হওয়াটা তাঁহার পছন্দ নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রূফ দেখার বিনিময়ে আমি সেখানে বাসের অধিকার পাইব ইহাই সাব্যস্ত হইল।

জীবনদা তখন ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে মাস্টারির সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজী-হোমিওপ্যাথী-বায়োকেমিক-টোট্‌কা চিকিৎসায় হাত পাকাইতে-ছিলেন। হোমিওপ্যাথী-বায়োকেমিকে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পুস্তকও তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। কিশোরীমোহন সাঁতরাকে তখন প্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা জবাব দিয়াছিলেন। জীবনময় তাঁহাকে স্রেফ লাউয়ের রস খাওয়াইয়া সঞ্জীবিত করিবার শেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। পালা করিয়া রোগীর সেবা চলিতেছিল, আমিও আসিয়া জুটিলাম। জীবনদা ছিলেন, যোগানন্দ দাস, যতীশচন্দ্র সেন নিয়মিত আসিতেন, আর আসিতেন হাবল সান্যাল নামে খ্যাত হিরণকুমার সান্যাল, প্রভাস ঘোষ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক) ও শরদিন্দু ঘোষাল (পাটনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক) এবং সুশান্তকুমার ঘোষাল (ট্রপিকাল স্কুল, কলিকাতা, সম্প্রতি মৃত)। ইঁহাদের সকলের সহিত পরিচয় আমার জীবনকে নানাভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। একদিন রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহনকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন, এখন-তখন অবস্থা। গুরু-শিষ্যের সেই মর্মান্তিক মিলন আমরা দেখিলাম, কিন্তু জীবনদার লাউ-রস অঘটন ঘটাইল। সাঁতরা মহাশয় সুস্থ সবল কর্মক্ষম হইয়া আবার বিশ্বভারতীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; অনেক বৎসর পরে রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বিশ্বভারতী আপিসে আশ্রয় পাইয়া আমি নানা ভাবে উপকৃত হইলাম, আমার অব্যবস্থিত জীবন একটা বাঁধা রুটিনের খাতে পড়িল। দ্বিপ্রহরে ‘লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা’র ধকল সামলাইয়া সন্ধ্যায় আড্ডা ও আহারের ফাঁকে ফাঁকে ‘শনিবারের চিঠি’র কাজ অবসর বিনোদন মাত্র ছিল। ১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে রাত্রি নয়টা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কপি মিলাইয়া

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখিতাম। এখানেই ১২৯২ সালের 'বালক' হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ মিলাইয়া বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'রাজর্ষি' (জানুয়ারি, ১৯২৫) প্রকাশ করি। জীবনময় রায়ের সহযোগে ইহাই আমার সর্বপ্রথম পুস্তক-সম্পাদন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত এখানেই ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হয়।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সপ্তম সংখ্যায় (২১ ভাদ্র, ১৩৩১) হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিত "সংবাদ-সাহিত্যে" একটি সংশোধন সাময়িক-পত্রে ছাপার অক্ষরে আমার প্রথম সাহিত্যিক "অবদান"। অষ্টম সংখ্যা (২৮ ভাদ্র) হইতে আমি রীতিমত লেখক। আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতা "আবাহন" ইহাতেই প্রকাশিত হয়। আমার জীবনে কবিতাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে বলিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

ওরে ভাই গাজি রে
কোথা তুই আজি রে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে-ঝাপে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা!…
দাবানল-বীণা আর
জহরের বাঁশীতে
শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুললি,
পুষ্পক দোলা দিয়া
মজালি যে কত হিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুললি…

কিন্তু অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পোস্ট-পাঙ্গা প্রতিশ্রুতি আমি ভুলি নাই। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী তখন 'প্রবাসী'র রচনা-নির্বাচন-ভারপ্রাপ্তা। তাঁহার দরবারেও দুইটি গুরুগম্ভীর কবিতা প্রেরণ

করিলাম। তিনি সেগুলি যথাসময়ে মনোনীত করিয়া সম্পাদকীয় বিভাগে পাঠাইলেন। সম্পাদকীয় বিভাগে তখন প্রধান হইতেছেন অশ্বিনীকুমার ঘোষ,—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ও প্রভাত সান্যাল তাঁহার সহযোগী। নির্বাচন-কর্ত্রীর কৃপালাভ করিলেও সম্পাদকীয় দলে কিছুতেই আমল পাইতেছিলাম না। ভাদ্র মাসেই কবিতা মনোনীত হইয়াছিল, কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন দুই মাস চলিয়া গেল, লেখা আর প্রকাশ হয় না। ইতিমধ্যে একাদশ বা শারদীয় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে (১৮ই আশ্বিন) আমার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" প্রকাশিত হইয়া বাংলা-সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট সোরগোল তুলিল; এই কবিতাই আমাকে প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিল। আমার আশ্রয়-কোটর শুধু রচিত হইল না, 'শনিবারের চিঠি'ও নবজন্ম পরিগ্রহ করিল। 'কল্লোল' পত্রিকা মারফৎ কাজী নজরুল ইসলামের সহিত সংঘর্ষ ঘটিল, মোহিতলাল আসিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের ক্ষেত্র সাহিত্য অধিকার করিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

'কল্লোল'

সবে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম, নির্ঝর তখনও গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নাই, দিগন্তপ্রসারী সমতল শ্যামল প্রান্তর তখনও বহু নিম্নে ক্ষীণ রজতমেখলামণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল, সহসা জল-কল্লোল কানে আসিল। যুক্তিবিচারহীন অসাবধানী আত্মভোলা পথিকের নিশ্চয়ই সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা খেলাচ্ছলে যাত্রা করিলেও উৎকর্ণ হইয়াই ছিলাম, শ্রবণমাত্র একটু চকিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, গিরি-প্রপাতেরই কল্লোল—সমুদ্রের নহে। পূর্বগামী অন্য এক নির্ঝরিণী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে স্খলিত হইয়া একটা বড় রকমের পতনের ফলে "ফল্‌সে"র (falls) সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সর্বৈব "ফল্‌স্‌" (false) সমুদ্র-কল্লোল। আমরাও নাগাল ধরিয়া ফেলিলাম, ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

তরুণ হনুমান জননী অঞ্জনার স্নেহক্রোড় ছাড়িয়া নিদারুণ ক্ষুধার বশে পাকা ফল ভ্রমে রক্তবর্ণ সূর্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য মহাশূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। ভ্রম তাহার তারুণ্যের ; বস্তু ও মানুষের যথাযথ মূল্যবোধ এই অবস্থায় থাকে না—ছোটকে বড় মনে হয়, বড়কে ছোট। উভয় পক্ষেই এই ভুল ঘটিয়াছিল, ফলে সম্পূর্ণ বাহিরের নিরীহ ভালমানুষ লোকের কাছাতেও টান পড়িয়াছিল। কবি মোহিতলাল মজুমদার এই ভালমানুষ সম্প্রদায়ের একজন। তিনি কাছা সামলাইতে সামলাইতে এই কল্লোলের আবর্তে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। রগড় জমিয়া উঠিল।

এতদিন পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান উপজীব্য ছিল পলিটিক্স, স্বরাজ্য-পলিটিক্স। এ-পক্ষের রথচূড়ায় আত্মগোপন করিয়া ছিলেন

স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অভিযানের লক্ষ্য ছিলেন সি. আর. দাশ—তখনও পাকাপাকি রকম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হন নাই। গড়পার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র জনসভায় দাশ মহাশয় 'শনিবারের চিঠি'র উল্লেখ করিয়া "চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট"ও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পর্ব জমিতে না জমিতে আমি আসিয়া পড়িয়া ভাগের মায়ের বোঝা স্কন্ধে লইলাম, বাকি কয়েকজন কাঁধ সরাইয়া লইয়া এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন; সাপ্তাহিকের অষ্টম হইতে একাদশ সংখ্যার মধ্যেই এইরূপ ঘটিল। একাদশ সংখ্যার "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র শেষ "অসম ছন্দ" অন্য উপদ্রব টানিয়া আনিল। "আমি ব্যাঙ" বলিয়া আরম্ভ হইয়া হঠাৎ তাল-ফেরতায় ব্যাঙ সাপ হইয়া গেল—

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
আমি ভীম ভুজঙ্গ ফণিনী দলিতফণা,
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গণা—
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি "বে অব বিস্কে", "সাইক্লোন" আমি, মরু সাহারার আঁধি।

এবং পরেই, "আমি খোদার যণ্ড, নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি···।" আবেদন যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিল। হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিরীক্ষণ করিয়া সম্মুখে কাহাকেও না পাইয়া মোহিতলাল মজুমদার নেপথ্যে আছেন কল্পনা করিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই কবিতার গদা নিক্ষেপ করিলেন। গুরুর সহিত শিষ্যের তখন মনোমালিন্য গাঢ়তর হইয়াছে। এই গদার বাহন হইল 'কল্লোল' নামক মাসিকপত্রের দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ষষ্ঠ বা আশ্বিন সংখ্যা। 'কল্লোল' আসিয়া আমাদের পাড়ায় পৌঁছিল। ইতিপূর্বে তেইশ সংখ্যা ধরিয়া ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে এই পত্রিকা নিয়মিত বাহির হইয়াছে। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার

মত এমন কিছু নহে; আর পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয় সেই রকমই পাঁচমিশেলি ব্যাপার, থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড়; লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্য নৃপেন্দ্র বুদ্ধদেব পর্যন্ত; পুরাতন এবং নূতনের মিশাল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের লেখাই ইহাতে থাকিত। যুগ-পরিবর্তনের কোন সূচনাই ইহাতে ছিল না। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'যমুনা'তে ধারাবাহিক ভাবে 'নারীর মূল্য' ও 'চরিত্রহীন' ছাপিয়া শরৎচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ওই বৎসরেই প্রথম-প্রকাশিত 'ভারতবর্ষে' নবভাবধারার যে জোয়ার আসিয়াছিল তখন পর্যন্ত তাহারই জের চলিতেছিল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস হইতে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আওতায় তাঁহারই আশ্রয় হইতে 'বঙ্গবাণী' বাহির হইয়া বঙ্গভাষায় মৌলিক চিন্তাশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যে যে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, আমরা তখন পর্যন্ত তাহাতেই মুগ্ধ বিস্মিত ছিলাম। আমাদের সামাজিক এবং অন্য বহুবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-সম্মত সাহিত্যিক আন্দোলন তুলিয়াছিলেন ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে তিন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য 'বেপরোয়া' নামক অসাময়িক পত্রিকায়। যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ধুয়া ইঁহারা এই চটি সচিত্র পত্রিকায় তুলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার মত, তাহার তুলনা হয় না। এই সব দিক দিয়া 'কল্লোলে'র কোনও বৈশিষ্ট্যই ছিল না। বাংলা-সাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যে নূতন ধারার প্রবর্তক তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল অন্যত্র, শৈলজানন্দের কয়লা-কুঠির গল্পগুলিতে। প্রথম গল্প "কয়লা-কুঠী" প্রকাশিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'মাসিক বসুমতী'তে। সেই বৎসর বৈশাখেই 'মাসিক বসুমতী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। যে অশ্লীলতার দাপাদাপি করিয়া 'কল্লোল' তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে

অন্য ধরনের নূতনত্ব সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিল তাহারও আরম্ভ হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রবর্তিত 'নারায়ণে' (১ম বর্ষ ১৩২১-২২)। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন জগদীশ গুপ্ত যুবনাশ্ব অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব বসুর পূর্বগামী।

যাহা হউক, "আমি ব্যাঙ" পড়িয়া কাজী নজরুলের রক্তে "সর্বনাশের নেশা" জাগিয়া উঠিল, গুরুসম্বোধনে মোহিতলালকে রণে আহ্বান করিয়া তিনি লিখিলেন, "রক্ত অসির কৃষ্ণ মসী"র যে কোন যুদ্ধে তিনি গুরুর সহিত বোঝাপড়া করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মোহিতলালকে শেষে এই বলিয়া শাসাইলেন "ভূধরপ্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার।" মোহিতলাল হন্তদন্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে ছুটিয়া আসিলেন। হাতে একটি দীর্ঘ রচনা—"দ্রোণ-গুরু" নামে একটি কবিতা। বলিলেন, নজরুল গালাগালি দিলেও 'শনিবারের চিঠি'র সহিত সরাসরি যুক্ত হইতে তাঁহার আপত্তি আছে। তাঁহার কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'র "ক্রোড়পত্র" করিয়া ছাপাইতে হইবে। আমরা তাহাতেই রাজী হইলাম। "বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা" বা দ্বাদশ সংখ্যায় (৮ কার্তিক ১৩৩১) কবিতাটি মুদ্রিত হইল। কবিতাটিতে তিনি একটি ভূমিকা যোজিত করিয়া আমাকে অর্জুন বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। অংশত উদ্ধৃত করিতেছি—

> "কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরু সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে।···দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য, এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহ-সূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।"

এই নিদারুণ কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি মারাত্মক, বাংলা-সাহিত্যে অভিশাপের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

"আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরি নাই আর, ওরে হীন জাতি-চোর!
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে!—ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার,—মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে!
দুদিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে!
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস—
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস!"

অতঃপর রণদামামা বাজিয়া উঠিল, আর ঠেকানো গেল না। দুইটি নিরীহ শান্ত সমুদ্রপথযাত্রী স্রোতস্বিনীর মধ্যে কলহের কল্লোল ফেনিল হইয়া উঠিল। 'শনিবারের চিঠি' ও 'কল্লোল' দুই পত্রিকারই কর্তৃপক্ষ পরস্পর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন প্রখ্যাত সংস্কৃতি-সংঘ 'ফোর আর্টস্ ক্লাবে'র সদস্য উভয় পক্ষেই ছিলেন। 'কল্লোলে'র সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশই 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করিয়াছিলেন, অনেকটা চাবুকহস্তে সমুদ্র-শাসনরত কান্যুটের ছবি যেন; আবার তাঁহারই আঁকা 'কল্লোলে'র প্রচ্ছদপট—সমুদ্রতটে নৃত্যরত নটরাজের চরণতল স্পর্শ করিতেছে সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গমালা—প্রায় একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। দুই সহোদরা দিতি ও অদিতির সন্তানদের মত 'শনিবারের চিঠি'র আর 'কল্লোলে'র কলহ বাধিবে, ইহার সম্ভাবনাও প্রারম্ভে অভাবনীয় ছিল। কিন্তু সেই অভাবনীয়ই ঘটিল। দুই সখীর সহজ দৃষ্টি প্রায় অকারণ ক্রোধে কুটিল হইয়া উঠিল। আশ্বিনের (১৩৩১) 'কল্লোলে' কাজী নজরুল ইসলাম যে কলহের সূত্রপাত করিলেন, আমরা তাহার জের টানিয়া "বিদ্রোহ সংখ্যা"র ভূমিকায় লিখিলাম—

"·· আজ বাংলা দেশেও তেমনি একটা বিদ্রোহের রোমাঞ্চ, একটা পুলকস্পন্দন জাগছে। সকলের চেয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে বাংলা-সাহিত্যে—বিশেষত কাব্যে। ঝঞ্ঝার ঝনৎকার, প্রলয় ঝড়ের বিষম ঝড়ৎকার, মহাকুলিশের কড়ক্কাকড়ি আজ বাংলার সাহিত্যগগনকে দিকে দিকে বিদীর্ণ বিশীর্ণ ক'রে ফেলছে। বিদ্রোহী রক্তাশ্বের উন্মত্ত হ্রেষা যাদের চিত্তে বিপ্লবের চিঁহি-রব প্রতিধ্বনিত করছে, বিশ্বের খিলানে তার প্রচণ্ড খুরক্ষেপ যাঁরা মুহূর্তে মুহূর্তে লক্ষ্য ক'রে চলেছেন, বাংলা দেশের সেই প্রধান কয়েকটি বিদ্রোহী কবির লেখা এইবার দেওয়া গেল। বাংলার প্রত্যেক পাঠকেরই এই কবিদের সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। যে মুটে দুপুরবেলায় ঝাঁকায় শুয়ে ঘুমোয় তার অন্তরে তখন কি ব্যথা জাগছে—পাহারাওয়ালারা যখন মোড়ে মোড়ে রোঁদ দিয়ে ফেরে, তাদের সেই নীরব গাম্ভীর্যের মধ্যে অত্যাচারের কি বিকট মূর্তি লুক্কায়িত রয়েছে—নবোঢ়া পত্নী বায়োস্কোপ-দর্শনাভিলাষিণী হয়ে যখন পতির অনুমতি না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে, তার সেই নিবিড়-হৃদয়-নিঙড়ানো ব্যথার ধারায় যুগে-যুগে সঞ্চিত অবরুদ্ধ পীড়িত অত্যাচারিত নারীর বিদ্রোহী অন্তরের কি করুণ অথচ কি রূঢ় ইতিহাস জলের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—সেই সব গণপ্রাণের কথা জানতে গেলে এই কবিদের লেখা পড়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ এঁদের ছন্দে সুরে সমস্তই ধরা পড়েছে, যেমন ক'রে ধরা পড়ে নব কিশোরী তার প্রণয়পাগল মনোচোরের বাহুবন্ধনের মধ্যে।"

'নব-শিহরণে' অশোক চট্টোপাধ্যায় 'হর্ষক' বেনামীতে লিখিলেন—

"শিহরণ জেগেছে রে কি হরণ করিব ?
স্ত্রীহরণ বিহরণে যুঝে রণ মরিব।"

সম্পাদক যোগানন্দ দাস নামহীন "ছড়া"য় লিখিলেন—

"ভেপসে উঠে খেপলি কেন কী হ'ল তোর খাপ্পা খোকা,
থাবড়া মেরে হাবড়া গেল ঘাবড়ে গিয়ে বাপ খামোখা ?"

এবং পরবর্তী ত্রয়োদশ সংখ্যায় (১৫ কার্তিক, ১৩৩১) "বিদ্রোহী-সংখ্যা"য়-স্বাতন্ত্র্য-প্রার্থী মোহিতলাল "চামার খায়-আম" বেনামীতে সরাসরি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া লিখিলেন—

"চাহি না আঙুর—শুধু চানাচুর,
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান দুই,—
ঘলঘসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ,
বোঝে না আমার এমন ছন্দ !—
আর কিছু দিনে ইহারি ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁই চুঁই !
চাবে না আঙুর, চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান দুই।"

ফলে 'শনিবারের চিঠি'র পলিটিক্সের দুই নয়ন ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসিল ; সাহিত্যের তৃতীয় নেত্র, যাহা এতদিন অলক্ষ্য ছিল, ধীরে ধীরে বিস্ফারিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ।

এই সময়ে আমার ভাগ্যের বাসস্থানে শনির দৃষ্টি পড়িল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বিশ্বভারতীর হর্তাকর্তা বিধাতা ; তিনি সর্বগ্রাসী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ, তাঁহার আশ্রয়ে অর্ধেক মাথা গলাইয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। গভীর রাত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রুফ দেখিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ" তোমার লেখা ? কোন্ দিকে নীত হইতেছি ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া সগর্বে উত্তর দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। স্ফীংক্সের মুখে সস্মিত হাসি ফুটিল, বলিলেন, খুব ভাল লেখা, কিন্তু এ সব বাজে কাজে সময় নষ্ট না ক'রে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ করতে পার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা বাকি আছে। সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না, এবং স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্রের অনেক গভীর গবেষণা সত্ত্বেও আজিও অনেক কিছু করিবার আছে সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু যে "কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে"র জন্য 'শনিবারের চিঠি'র ভোলই বদলাইতে চলিয়াছে, তাহার রচনাকে

বাজে কাজের পর্যায়ভুক্ত মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং পরদিনই প্রশান্ত-শাসিত বিশ্বভারতীকে সেলাম বাজাইয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে থাকিলে হয়তো তাঁহার দরবার পর্যন্ত যাইতাম, কিন্তু তিনি তখন "পশ্চিম-যাত্রিকী"।

এবার আমার মুরুব্বি হইলেন স্বয়ং সম্পাদক যোগানন্দ দাস; তিনি মতান্তর ব্যপদেশে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের উপরে মানিকতলা মেন রোডের ঠিক দক্ষিণে "সায়ান্স কট" নামক গালভরা নামওয়ালা একটি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর মেস সন্ধান করিয়া পাশাপাশি দুইটি ঘর ভাড়া লইলাম। পূর্বপরিচিত বিপিনবাবুর রেস্তরাঁয় ধারে কারবার ছিল, সুতরাং এখানকার কদর্য আহার-ব্যবস্থায় বিশেষ আহত হইলাম না। রাত্রির ভয়াবহ পরিবেশকে প্রায়শই সঞ্জীবিত ও সুসহ করিয়া দিতেন খুদুদা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন রায় রোডের অদূরবর্তী এই মেসে তিনি নৈশ-আহার-প্রারম্ভিক ভ্রমণে আসিতেন, একটা ভাঙা চেয়ার ছিল, তাহাতে প্রায় 'ময়ূর সিংহাসনে' বসার ভঙ্গিতে বসিতেন এবং কবিতা লেখার কম্পিটিশন লাগাইয়া যোগানন্দদা ও আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেন। নীচের অখাদ্য চায়ের দোকান হইতে পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত, খুদুদা যোগানন্দদা উভয়ে মোটা মোটা বর্মাচুরুট ধরাইয়া বসিতেন, আমি চায়ের ও চুরুটের পরস্মৈপদী ধোঁয়ায় মশগুল হইয়া কবিতা লিখিয়া যাইতাম। এই সময়ে আমরা পরস্পর পাল্লা দিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম। মোহিতলালও ধারাবাহিকভাবে "রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম" লিখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

একদিন এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে অর্থাৎ 'প্রবাসী' আপিসেই "কম্পিটিশনে"র আসর বসিল। সেই বৎসরের ডিক্সন লণ্ঠনের ক্যালেণ্ডারে এক সুন্দরী বিদেশিনীর অপরূপ রঙিন চিত্র

ছিল। তিনিই হইলেন কবিতা-প্রতিযোগিতার বিষয়। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত-সজনীকান্ত এই চারিজন প্রতিযোগী; এই অধমই সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম হইল; ২২শে কার্তিকের (১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'তে কবিতাটি প্রকাশিতও হইল; আরম্ভটা এইরূপ—

ওগো তুষার দেশের মেয়ে—
কেন এই বাংলা দেশের গোবেচারীর পানেতে রও চেয়ে।
তোমার ওই নীল নয়নে নিমেষ নাহি
ফ্যালফেলিয়ে আছ চাহি,
প্রণয়-ভীতু কুমারীদের
নয়কো রীতি যে এ!
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!
যেদিন কিনে ছ আনাতে
গোলদীঘির ওই পূব কোণাতে;
সুমুখের এই দেয়ালটাতে
টাঙিয়ে দিলেম তোমায়,
সেদিন হতে আজও
তোমার একটু নাহি লাজও,
তোমার নিমেষবিহীন নয়নবাণে
বিঁধছ কেবল আমায়!
আমার কাজ-অকাজে ঘুমের মাঝে
মনটি আছ ছেয়ে—
ওগো তুষার দেশের মেয়ে!

এই সময়ে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-রাজ্যের তিনজন ধুরন্ধর পণ্ডিতের সহিত আমাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক জন্মে। 'প্রবাসী' আপিসে ও বিশ্বভারতী আপিসে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর কালিদাস নাগের নিত্য যাতায়াত ছিল। ডক্টর নাগ তখনই 'প্রবাসী'র সহিত ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং তিনি 'কল্লোলে'র সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের জ্যেষ্ঠ

সহোদর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অতি সামান্য সহজ কথাবার্তায় এমন একটা আবেগ-স্পন্দন থাকিত যে, আমাদের চিত্তও কিছু একটা করিবার জন্য ব্যাকুল ও স্পন্দিত হইয়া উঠিত; তিনি সর্বদাই নিজের চতুর্দিকে একটা মহত্ত্বের ও বিশ্বসৌহার্দ্যের তপ্ত পরিমণ্ডল সৃজন করিয়া রাখিতেন; অথচ তাঁহার বিচিত্র সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে হইত, কি যেন একটা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই। ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকরকেও বৃহৎ ভাবনায় ভাবিত করিবার মন্ত্র তাঁহার জানা ছিল। তিনি এখনও সেই মন্ত্রেরই কারবার করিতেছেন।

সুনীতিকুমার সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ; তিনি কত বড় তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া তাহা বুঝিবার জো নাই। তখন হইতেই আমাদের সকল সংশয়ের মীমাংসা একমাত্র তাঁহার নিকটেই ছিল। তিনি ভাষাতত্ত্বের টাইটানিক জাহাজ, কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও তত্ত্ব নাই যাহাতে ডিঙি বাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসুকে পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে না পারেন; আরবের মরুভূমিতে তাঁহার গল্প আরম্ভ হইলে জাপানের ক্রিসেন্থিমাম-উদ্যানে গিয়া তাহা শেষ হইত, মুণ্ডাদের কথা শুরু হইলে তাহা শেষ হইত ক্রোম্যাগ্নন মানুষের মুণ্ডুতে। মহাভারত কথাসরিৎসাগর আরব্য উপন্যাসের মত গল্প হইতে গল্পান্তরে বিচরণ করিতে করিতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কোনও আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কদের মত তাঁহার প্রেম-প্রীতি বিশেষ স্ফূর্তি পাইত আহার্যবস্তুর মাধ্যমে, এত বড় খাদ্যরসিক এ যুগে আমি আর দেখি নাই। দেশভ্রমণে তাঁহার ক্লান্তি নাই, বুড়া বয়স পর্যন্ত সকল দৈহিক অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া তিনি সারা পৃথিবী চষিয়া বেড়াইতেছেন, আর সমস্ত পৃথিবীর সুন্দর ও উৎকট "কিউরিও"-নিচয় তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরি-ঘরে ভিড় জমাইয়া সেটিকে স্বল্প-পরিসর করিয়া তুলিতেছে। তিনি 'শনিবারের চিঠি'র গোড়া হইতে অন্যতম

প্রধান হিতৈষী, তাঁহারই কৃপায় তাঁহার মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আমরা নিজস্ব করিতে পারিয়াছিলাম। সুনীতিকুমার 'শনিবারের চিঠি'তে খুব কমই লিখিয়াছেন। অনেকের ধারণা 'শনিবারের চিঠি'র বহু পাণ্ডিত্যমূলক প্রবন্ধ তাঁহার রচনা। .তাহা নয়; কিন্তু হাতে-কলমে তাঁহার রচনা না হইলেও 'শনিবারের চিঠি'র সকল পাণ্ডিত্যের নীচে তাঁহারও স্বাক্ষর আছে। এমন সহজ সবল সুস্থ স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বদেশ-প্রেমিক আনন্দময় পুরুষ আমি কমই দেখিয়াছি, তাঁহার সাহচর্যে আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে।

তৃতীয় পণ্ডিতের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইলেন মোহিতলাল, তিনি তাঁহারই যৌবনের বন্ধু ডক্টর সুশীলকুমার দে। সুশীলকুমার কথায় চিঁড়া ভিজাইবার লোক নহেন, কাজের লোক। আমাদের চেষ্টাকে আশীর্বাদের দ্বারাই সমর্থন করিলেন না, একেবারে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ত্রয়োদশ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে (১৫ কার্তিক, ১৩৩১) তিনি প্রেমমুকুল জানা ও শান্তশিব গাজনদার এই দুইটি বেনামীতে যথাক্রমে "অজানা প্রেম" কবিতা ও "আর্ট ও আলোক-পন্থা" প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন হইতে আজও পর্যন্ত তিনি 'শনিবারের চিঠি'র প্রায় কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বহু গদ্য-পদ্য রচনায় 'শনিবারের চিঠি' সমৃদ্ধ হইয়াছে। তিনি বাহিরে মৃদু স্বল্পভাষী হইলেও আমাদের আসর জমাইয়া মুখরোচক গল্প বলিতে ওস্তাদ ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র প্রাথমিক দলের যে চিত্র প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে সুনীতিকুমার-মোহিতলালের সঙ্গে তিনিও আছেন।

'কল্লোল'-সংঘর্ষের দরুন 'শনিবারের চিঠি'র ক্রম-সাহিত্য-পরায়ণতার মোট ফল কিন্তু এই সাপ্তাহিক পর্যায়ে ভাল হইল না। তবে এ কথাও সত্য যে, পলিটিক্সের পথও আর তাহার পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ হইত না। যে স্বরাজ্য পার্টির বিরুদ্ধে ইহার প্রধান অভিযান ছিল, তাহার নেতা ও কর্মীরা ধৃত ও কারান্তরালে নীত

হইয়া দেশের ও দশের চোখে জয়ী হইয়া গেলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া খাঁটাখাঁটি আর শোভনভাবে চলিত না; যে ভাবেই হউক বিষয়ান্তরে যাইতেই হইত।

'কল্লোলে' তখন ফুট্‌কি-কণ্টকিত গল্প-কথিকার রেওয়াজ আরম্ভ হইয়াছে, আর আরম্ভ হইয়াছে অবাস্তবের সঙ্গে অতি-বাস্তবের বিচিত্র সংমিশ্রণ—গোকুল নাগের সঙ্গে যুবনাশ্ব। 'শনিবারের চিঠি'র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সেই পথেই নূতন অভিযান শুরু করিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি যাঁহারা ইহাতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারেই বিদায় লইলেন, এবং নানা কারণে রুধিরেরও অভাব ঘটিতে লাগিল। আমি পর পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্যারডি লিখিয়া নাম করিয়া ফেলিলাম। প্রমথনাথ বিশী (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'র দলে নেপথ্যে যোগ দিলেন—ইঁহারা সশরীরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আরও অনেক পরে। সে কাহিনী যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সপ্তদশ সংখ্যা পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র কিছু সৌষ্ঠব ছিল, পঞ্চবিংশ সংখ্যা পর্যন্ত কোনও রকমে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩২ বজায় রাখিয়া বিপন্ন পণ্ডিতের মত সে দেহের অর্ধেক ত্যাগ করিল এবং আরও দুই সংখ্যা সেইরূপ কাহিল ভাবে চলিয়া ৯ই ফাল্গুন ১৩৩১ সপ্তবিংশ সংখ্যায় একেবারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহার সাপ্তাহিক জন্ম চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল। 'কল্লোল' তখন মহাসমারোহে প্রতি মাসে অনিয়মিত ভাবে হইলেও বাহির হইতেছে। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ৫ই ফাল্গুন (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) তারিখে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাশ্চাত্ত্য সফরান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটনার সহিত আমার পরবর্তী সাহিত্যজীবন বিশেষভাবে যুক্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সাহিত্যসাধনার লোভে আমি প্রায় সর্বস্ব—আত্মীয়-স্বজন পিতামাতা বিজ্ঞানাধ্যয়ন উচ্চচাকুরিগত আরাম, এমন কি শ্বশুর-বাড়ির স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে তাহার মূল আসনটি কাঁচা মাটির সরার মত গলিয়া গেল। ইহাতে আমাদের দলের একমাত্র আমিই মর্মান্তিক আঘাত পাইলাম। যোগানন্দ দাস সন্ন্যাসী—মায়ামমতাহীন অর্থাৎ নির্মায়িক পুরুষ, বাকি সকলেরই অন্য অবলম্বন ছিল। আমার সম্বল অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কৃপাকণা মাসিক পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রা। 'প্রবাসী' আপিসে তখন পর্যন্ত আমার অবস্থান অনধিকার-প্রবেশেরই সামিল হইয়া ছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেখক হিসাবে আমার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছিল। সে কাহিনীও কম করুণ নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা-নির্বাচক শ্রীমতী শান্তা দেবী আমার দুইটি কবিতা 'প্রবাসী'র জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন সেই ভাদ্র মাসে। কিন্তু তাহা আর বাহির হয় না। সেখানেই 'শনিবারের চিঠি'র আপিস, নিত্য যাই আসি। অশ্বিনীকুমার ঘোষ, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সহ-সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যহই খোসামোদ করি, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হয় না। শান্তা দেবী থাকেন নেপথ্যে, তাঁহার নিকট নালিশ রীতিমত আয়াসসাপেক্ষ; অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রধান কর্মাধ্যক্ষ, কিন্তু আমার কবিতা ছাপা হইতেছে না এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর করাইলে তিনি আমার মেয়েলিপনায় কিরূপ হাসিবেন তাহা অনুমান করিয়া তাঁহার দরবারও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সরাসরি ছোট কর্তাদেরই শরণাপন্ন হইতাম; শেষ পর্যন্ত এক প্লেট করিয়া মতিবাবুর দোকানের ('প্রবাসী' আপিসের সংলগ্ন) রান্না মাংস ও এক ভাঁড় করিয়া রাবড়ি কবুল করিয়া কথা আদায় করিলাম—অগ্রহায়ণে আমার "স্বপ্ন-জাগরণ" কবিতা বাহির হইবে। কার্তিক মাস শেষ হইয়া আসিল, "বিবিধ প্রসঙ্গ"ও ছাপা শেষ হয় হয়, আমার কবিতা সম্পাদকীয় টেবিলের ঝুড়িতেই পড়িয়া

থাকে। শেষে কোনও প্রকারে তখন আমার পক্ষে মহামূল্যবান তিনটি টাকার মায়া কাটাইয়া মাসের শেষ রাত্রে তিন প্লেট মাংস ও তিন ভাঁড় রাবড়ি লইয়া মরীয়া হইয়া 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদকদের দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা নিমকহারামি করিলেন না, কবিতাটি "বিবিধ প্রসঙ্গে"র পরে 'প্রবাসী'তে স্থান পাইল। আমি এতদিনে স্বনামে বাংলা দেশের অসংখ্য ভাগ্যবান সাহিত্যিক দলে পাংক্তেয় হইলাম।

চতুর্দশ তরঙ্গ

মাটি

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১ (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫) পশ্চিমযাত্রী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চার দিন পরে ৯ই ফাল্গুন তারিখে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সপ্তবিংশ বা শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইল।

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমার অন্নের অবলম্বন পুলিনবিহারী দাস প্রণীত 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা' পুস্তকাকারে বাজারে বাহির হইয়া আমাকে সম্পূর্ণ নিরালম্ব করিয়া দিয়াছে। অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে স্বনামে কবি হিসাবে স্থান পাইয়া নিজের সাহিত্যিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইলেও 'লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা'র মুদ্রণ যতই অগ্রসর হইতেছিল ততই অনুভব করিতেছিলাম, আমার পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে, বেকার হইবার আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে অদ্ভুতকর্মা সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর সহিত পরিচয় ঘটে। তিনি ছিলেন বাৎতাল্লা-বিশারদ, কথার যাদুকর, শুধু কথার তোড়ে শ্রোতার অন্তরের সাহারা মরুভূমিকে কুলুকুলু-কলধ্বনিময় স্বর্গোদ্যানে পরিণত করিতে পারিতেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তাজাত অভিনয়-কুশলতা তিনি একটু তির্যক-ভাবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া মাঝে মাঝে বেশ সাফল্য অর্জন করিতেন। তাঁহার কথাবার্তায় মুগ্ধ হইয়া আমরা 'শনিবারের চিঠি'র দল তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলাম। তিনি স্রেফ মুখের কথায় 'শনিবারের চিঠি'র বিজ্ঞাপনের যে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া দেখাইলেন, তাহারই লোভে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও জোর করিয়া 'শনিবারের চিঠি' চালাইতে লাগিলাম। অশোক চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে "আউট অব পকেট" হইয়া বিপন্ন হইতে লাগিলেন। ইহার শোধ অবশ্য তিনি পরে 'প্রবাসী'তে

তুলিয়াছিলেন—সিদ্ধেশ্বরের আদর্শে "পীতাম্বর স্যাণ্ডেল" নামক সচিত্র গল্পটি লিখিয়া। আমরা যখন প্রায় ডুবু-ডুবু, সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ী তখন 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক অশ্বিনীকুমার ঘোষকে সম্পাদক করিয়া নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' বাহির করিলেন। ৫ই পৌষ শনিবার (২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪) 'বিচিত্রা' প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। বলা বাহুল্য, আমি বিনা মাহিনায় ইহার লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলাম। সিদ্ধেশ্বর মাথার উপরে থাকিলেও 'বিচিত্রা'র পরিচালনা করিতেন একজন উৎসাহী প্রিয়দর্শন যুবক; তিনিই পরবর্তী কালে প্রবোধকুমার সান্যাল নামে খ্যাত হইয়াছেন। প্রথম বা দ্বিতীয় সংখ্যা 'বিচিত্রা'তেই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা "লাল [অথবা রাঙা] শাড়ী" নামক একটি গল্প আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি নিতান্ত আর্থিক কারণে 'বিচিত্রা'র দিকে ঝুঁকিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ী ফুঁয়ে কাজ চালাইতে চান—পাঁচ সংখ্যা চলিয়া 'বিচিত্রা' বন্ধ হইল, সিদ্ধেশ্বর স্বয়ং অশোক চট্টোপাধ্যায়ের স্কন্ধে ভর করিলেন। তাঁহার সৎ-পরামর্শে যোগানন্দদা ও আমি একটি বিচিত্র ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলাম। পরিপূর্ণ যৌবনে আশা ও আশ্বাসে মন ভরপুর, সাহিত্যের অর্থকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত হতাশ হইবার কারণ ঘটে নাই। ১১ই মাঘের (ত্রয়োবিংশ সংখ্যা) 'শনিবারের চিঠি'তে সুতরাং আমাদের এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল—

"Applied Literature Society

—। আর ভাবনা নাই ।—

কবিতার ঝরণা আপনার দ্বারে প্রবহমানা। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সম্বর্ধনা, বিদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের গভীর ভাবযুক্ত কবিতা আপনার জন্য সকল সময় ফরমাস মাফিক তৈয়ার থাকিবে। দক্ষিণার হার—বিদায় ও সম্বর্ধনা কবিতা ১০৲, বিবাহ কবিতা ৮৲, শ্রাদ্ধাদি কবিতা ৪৲, অন্যান্য উৎসব ও পর্বাদি বিষয়ক গাথা ৫৲।

প্রত্যেক কবিতায় স্বত্ব ক্রয় করিবার ব্যবস্থা এবং হার স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণের জন্ত কার্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখুন। অর্ধমূল্য অগ্রিম দেয়।
ফলিত সাহিত্য কার্য্যালয়
১০৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।"

ঠিকানা যোগানন্দ দাসের পিতৃগৃহের। বলা বাহুল্য, আমাদের "সায়েন্স-কট" বা বিজ্ঞানকুঞ্জ বিহার তখন সমাপ্ত হইয়াছে; যোগানন্দদা পিতৃগৃহে এবং আমি ২৭ নং বাদুড়বাগান লেনের মেসে বাইবেলোক্ত "প্রডিগাল সানে"র মত পুনরধিষ্ঠিত হইয়াছি।

সিদ্ধেশ্বর ভাদুড়ীর পরম আশ্বাস সত্ত্বেও "ফলিত সাহিত্য" সুফলপ্রসূ হইল না। গুটিতিনেক অর্ডার বাবদ গোটাকয়েক টাকা পাইয়াছিলাম; কিন্তু গ্রাহক অপেক্ষা লেখকের আবেদন এত বেশি আসিতে লাগিল যে, আমরা তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অগ্রহায়ণ মাস হইতে 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার পশ্চিম যাত্রার কাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল; মাঘ পর্যন্ত বাহির হইয়া উহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিবামাত্র "কপি"র জন্য তাঁহাকে জোর সম্পাদকীয় তাগাদা দেওয়া হইল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, লেখা বীজাকারে তাঁহার নোট-বইয়ে রহিয়াছে, নিজের হাতে তাহাকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিবার উৎসাহ তাঁহার নাই; তবে উপযুক্ত লেখক পাইলে মুখে মুখে বলিয়া যাইতে রাজী আছেন। 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতন-প্রবাসী। পত্রযোগে তাঁহার নিকট হইতে হুকুম আসিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলিখন-কর্মে আমি ইতিপূর্বেই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলাম, আমার সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের তাহা মনেও ছিল। 'শনিবারের চিঠি' তখনও বাহির হয় নাই, সুতরাং সাহিত্যিক হিসাবে সে অধিকার পাই নাই। ১৯২১ হইতে

কয়েকবার শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করিয়া এবং সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সভ্য হিসাবে নাম লিখাইয়া কর্তৃপক্ষ মহলে একটু পরিচিত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সনের ২১শে মার্চ চীন-ভ্রমণে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে আলিপুরের হাওয়া-আপিসে বিদায়-সম্বর্ধনার বিশেষ আয়োজন হয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ তখন হাওয়া-আপিসের অধ্যক্ষ। সেখানকার মাঠে বেশ একটি জনসমাগম হয় এবং সেই দিনই সর্বপ্রথম আমরা বেতার-যন্ত্রের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় বোধ করি। বেতার-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীমতী সাহানা বসু রবীন্দ্রনাথের "এখন আমার সময় হ'ল" গানটি গাহিয়া যন্ত্রগত নানা বাধা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমিও তাহার অনুলিখন লই। রবীন্দ্রনাথ আমার লেখাটি পছন্দ করেন। চীন হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ২১শে জুলাই ১৯২৪। সেই দিনই কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। সেই সভাতেও আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ লিখিবার জন্য আহূত হইয়াছিলাম। মহাচীন কর্তৃক সম্মানার্ঘ স্বরূপ প্রদত্ত স্বর্ণ-পীত-ক্ষৌম-বহির্বাস-পরিহিত কবি সেদিন রবির উজ্জ্বল দীপ্তিতেই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সভার শেষে অনুলিখিত ভাষণটি লইয়া তাঁহার নিকট হাজির হইলাম। তিনি কিঞ্চিৎ সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া সেইটিকেই বহাল রাখিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন।

এ হেন আমাকে ত্রিশঙ্কু-অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহৃদয় অশোক চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি" লিখিতে পাঠাইয়া এক ঢিলে দুই পাখি মারিলেন; "কপি" সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং আমাকেও সরাসরি 'প্রবাসী'র কর্মী-শ্রেণীভুক্ত করিবার সুযোগ পাইলেন। আমি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে প্রুফ-রীডার নিযুক্ত হইলাম। মেশিনে যখন ফর্মা চড়িবে সম্পাদকীয়

বিভাগের দেখা প্রুফ যথাযথ সংশোধিত হইয়াছে কি না তাহা মিলাইয়া লওয়া আমার একমাত্র কাজ হইল। অবশ্য গোড়ার কাজ "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র কপি আহরণ। রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠান তখন সাময়িকভাবে আলিপুরের হাওয়া-আপিসেই অধ্যক্ষ প্রশান্তচন্দ্রের অতিথি-রূপে। আমাকেও সাময়িকভাবে সেখানে ডেরা বাঁধিতে হইল। পূর্বে উল্লিখিত কৃতিত্বের জোরে হাজির হওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথের সাদর আপ্যায়ন লাভ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁহার সহিত কৌশলে পত্রব্যবহার করিয়াছি, তাঁহার সান্নিধ্যেও আসিয়াছি, কিন্তু এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সম্ভাবনার কথা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। দিনরাত্রি সর্বদা কয়েকদিন একসঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল, এক টেবিলে আহার করিতাম, এক ঘরে শয়ন করিতাম। খেয়াল হইলেই তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া নোট-বইটি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া মুখে মুখে ডায়ারি রচনা করিয়া চলিতেন, আর আমি লিখিয়া যাইতাম। ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ তারিখ হইতে শেষ পর্যন্ত আমার অনুলিখন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সুষ্ঠু শব্দ হাতড়াইতেন, আমি সাধ্যমত কথা যোগাইতাম, অনেক শব্দ এবং কিছু কিছু বাক্যও যে আমার রচনা নয় তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিব না। অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁহার বক্তব্যের সম্পূর্ণ মৎকৃত রচনার নীচে স্বাক্ষর করিয়া তিনি আমাকে প্রভূত সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু সেই গোড়ার দিকে নিতান্ত কাঁচা বয়সে এই সম্মানে আমার দেহে রীতিমত স্বেদ-পুলক-কম্প হইত। নিভৃত আলাপের সুযোগে তাঁহার কাছ হইতে বাংলা-সাহিত্য বিষয়ে অনেক অভিমত ও উপদেশ আদায় করিয়া লইয়াছি, তাঁহার সেই সময়কার অনেক ইঙ্গিত আমার জীবনের সাহিত্য-পথের পাথেয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া অবিশ্রাম দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে বিশেষ নজর

দিয়া সমসাময়িক বাংলা-সাহিত্যচর্চার অবকাশ তাঁহার ছিল না, কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি এক নজর যাহা দেখিত তাহারই সঠিক মূল্য বিচার করিয়া লইতে পারিত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি নূতন কবিতা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে তখন আকৃষ্ট করিয়াছিল, তিনি প্রায়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। আমি বাল্যে ও কৈশোরে পয়সার অভাবে তাঁহার বই খরিদ করিতে না পারার দুঃখ কি ভাবে তাঁহার সতেরখানি বই ('গোরা' তন্মধ্যে একখানি) হাতে নকল করিয়া মিটাইয়াছিলাম, সে কথা শুনিয়া তিনি একদিন যথেষ্ট কৌতুক ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখনই আমার কয়েকটি প্যারডি-কবিতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। "মৎস্যগন্ধার প্রতি পরাশর" এবং "শীত-মঙ্গলে"র কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'গুলি তাঁহাকে আমি এক-একটি করিয়া দেখাইতাম। সেই হাওয়া-আপিসে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে বসিয়াই একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইবার মত ছেলেমানুষিও করিয়াছিলাম, তিনি তখন তারিফ করিয়াছিলেন। কবিতাটির নাম "অগ্নিদূত"। কবিতাটিকে তিনি ভুলেন নাই। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (প্রায় ১৪ বৎসর পরে) যখন 'বাংলা কাব্যপরিচয়" সঙ্কলন করেন

তখন তিনি আমার "অগ্নিদূত"কে সেই সঙ্কলনভুক্ত করেন। কিছু টীকাও স্বয়ং যোজনা করিয়া দেন। কবিতাটির খানিকটা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; কবিতাটি অনেক দিন পরে (১৩৩৩ বৈশাখের) 'প্রবাসী'তে বাহির হইয়াছিল—

ফাগুন-দুপুরে আগুন জ্বলিছে খাঁ-খাঁ করে চারিদিক,
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের 'পরে
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর মরীচিকা যেন ঠিক
শ্মশান-নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।
অর্গল-আঁটা সব বাতায়নে পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়িছে কিসের লোভে,
কপোত-কপোতী আলিসার কোণে ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা-কা করে কাক যেন কি মনঃক্ষোভে!
পতিতপত্র দেবদারু-শাখে ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল-তরু এলায়েছে পাতাগুলি।
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে সুনিভৃত আশ্রয়,
তপ্ত উঠানে ফেরে না কাকলী তুলি।
ঘূর্ণি হাওয়ায় শুষ্ক পত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধূলি-কুণ্ডলী কভু বা ধরিছে ফণা;
বাতাস কাঁদিছে অতি দূরে কোথা চাপা কান্নার সুরে
ফাগুন-আগুনে যেন সে ক্ষুণ্ণমনা।...

হাওয়া-আপিসের উপযুক্ত কবিতা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তখন শূন্য হাওয়া-লোক হইতে শক্ত মাটিতে আশ্রয় লাভ করিয়াছি; চাকরিতে কায়েম হইয়া মনে কবিতার বান ডাকাইয়াছি। যখন নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া যাইবার কথা, বেকার অবস্থায় বাংলা দেশের আরও হাজার হাজার বেকারের মত জনতার ভিড়ে হারাইয়া যাইবার কথা, তখনই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আমাকে রক্ষা করিল। আমার জীবনে আরও কয়েকবার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত

সঙ্কটকালে আমার রক্ষার উপলক্ষ্য হইয়াছেন, শনিগ্রহের তিনি মঙ্গলগ্রহ।

যাহা হউক, আমি মফস্বলের ছেলে, এখানে এই কয়দিনে স্থূলে-বাস্তবে এবং আভাসে-ইঙ্গিতে উচ্চতম নাগরিক জীবনের স্পর্শ পাইলাম ; যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাঁহাদের স্নেহ-সমীহ করেন, তাঁহাদিগকে চিনিলাম ও জানিলাম। আজ দীর্ঘকাল পরে মনের অতলে ডুব দিয়া তাঁহাদের কথা স্মরণে আনিতে চেষ্টা করিতেছি, দেখিতেছি, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা সঞ্চিত নাই। অবশ্য আর কাহারও কাছ হইতে স্মরণীয় কিছু লাভ না হইলেও আমার দুঃখ নাই ; প্রদীপ্ত ভাস্করের মত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র আকাশখানাকে একলা এমন ভাবে জুড়িয়া থাকিতেন যে, ভাল মন্দ অন্য কোনও গ্রহ-উপগ্রহের কাছে হাত পাতিবার প্রয়োজনও হইত না।

কবি রবীন্দ্রনাথের খেয়ালের কিছু কিছু পরিচয় পাইতাম। সেদিন দক্ষিণের গাড়ি-বারান্দার উপরে আরাম-কেদারায় কবির আসন পাতা হইয়াছে, আমরা চুপচাপ মেঝেতে বসিয়া আছি। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বিজলী আলো জ্বালিবার হুকুম নাই। গুন্ গুন্ করিয়া কবি নিজেরই রচিত গান গাহিতেছেন, সহসা অন্যের কণ্ঠে নিজের গান শুনিবার ঝোঁক চাপিল। চলনসই গোছও কেহ কাছাকাছি ছিল না। সেই নিশীথরাত্রে ডালহৌসি-স্কোয়ারের সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে লোক ছুটিল শান্তিনিকেতনে জরুরি তার করিতে—রমা মজুমদারের অবিলম্বে আসা চাই। পরদিন রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্বেই রমা দেবী উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি না আসা পর্যন্ত কবি শিশুর মত অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রমা দেবী প্রায় ধূলাপায়ে গান ধরিলে তবে তিনি শান্ত হইলেন।

"পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র "কপি" লেখা শেষ হইলে আমি স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মর্ত্যের ধরণীতে চিরপুরাতন সাতাশ নম্বরে ফিরিয়া আসিলাম। 'শনিবারের চিঠি'র আসর তখনও সরগরম, যদিও "অতি আধুনিক সাহিত্য" কথাটাই তখন পর্যন্ত জন্মলাভ করে নাই। নজরুল ইসলামের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও 'কল্লোল' তখনও ধীরবাহিনী নদী মাত্রই ছিল, ইহাতে তারুণ্যের সফেন উদগ্র উগ্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে আরও কিছুকাল পরে। মোহিতলাল তাঁহার নাদিরশাহী কবিতা দিয়া তখন আমাদের আবিষ্ট রাখিয়াছিলেন। সারকুলার রোডের উপরে প্রায় সুকিয়া স্ট্রীট জংশনের কোণে বিপিনবাবুর চায়ের দোকান ছিল। রোগা কালো লম্বা অথচ প্রিয়দর্শন লোকটি খরিদ্দার-ভগবানে সর্বদাই তদ্গতচিত্ত—একটি সহ্যাদ্রি বলিলেও হয়। কত ব্যাট্‌ল অব ওয়াটার‌্লু, কত পানিপথ-থানেশ্বরের যুদ্ধের মীমাংসা তাঁহার ক্ষুদ্র দোকান-ঘরটিতে হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিপিনবাবু স্বয়ং পানিপথ-সমরক্ষেত্রের মতই বিকার-হীন; শিবনেত্র হইয়াই আছেন। যোগানন্দদা আর আমি দিনরাত্রির প্রায় সকল প্রহরেরই খরিদ্দার ছিলাম, সুতরাং আমাদের খাতির একটু বেশি ছিল। স-সুবল মোহিতলাল আসিতেন সকাল বিকাল। অধুনা বাঁকুড়া শহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত, উখ্‌রার জমিদারদের পারিবারিক ডাক্তার বিরিঞ্চিবিলাস রায়, কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ও পরে পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদক এখন ডক্টর শচীন সেন তখনকার শচীন বাঙাল, পক্ষিতত্ত্ববিদ্ সুধীন্দ্রলাল রায়, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অনেক কৃতী ছাত্র—পরে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, যতীশচন্দ্র সেন, জীবনময় রায়, সুধানলিনীকান্ত দে, ডাক্তার শরদিন্দু ঘোষাল, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং কখনও কখনও অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও বিপিনবাবুর পান্থশালায় পদার্পণ করিয়া এক পাত্র চায়ের প্রত্যাশায় বসিতেন, দোকানের নানা

দিক হইতে রাজনীতি সমাজতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য বিজ্ঞানের নানা ধারা প্রবাহিত হইয়া পরস্পর কাটাকাটি করিত—হট্টগোলে কান পাতা দায়। ইহার মধ্যে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে আলাপচারি করিতেন সম্মুখের মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা। তাঁহারা অনেকেই নিয়মিত খরিদ্দার ছিলেন। আমরা ঘর ফাটাইয়া পথচারীর পিলে চমকাইয়া অনর্গল কথার তোড়ে যখন তর্কে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, তাঁহারা তখন নিঃশব্দে শুধু হাত ও মুখ নাড়িয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া যাইতেছেন—এই বিচিত্র দৃশ্য দার্শনিক দর্শকেরা প্রায়ই উপভোগ করিতেন। মোহিতলাল 'স্বপন-পসারী'র পরে তখন তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী'র জন্য প্রস্তুত হইতেছেন—প্রায়শই নূতন কবিতাপাঠের আদ্যপীঠ হইত বিপিনবাবুর দোকান অথবা তৎসম্মুখস্থ গাছতলা, গাছটা কি গাছ ছিল আজ মনে নাই, গাছটিও আর নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মোহিতলাল কিছুদিন পূর্বে মেস ছাড়িয়া মানিকতলা অঞ্চলে বাসা ভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। সংসার নামমাত্র, দিবারাত্র কাব্য-কবিতা লইয়া বিভোর, তাঁহার কাব্যের শ্রোতারাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা নিকট-আত্মীয়। তাঁহার এই সাহিত্য-প্রীতি আমাকে এতখানি মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল যে, সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চবিংশ সংখ্যায় (২৫ মাঘ, ১৩৩১) আমাকে ও তাঁহাকে লইয়া একটি গল্প ("দুই দিক") লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ, এখন হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা, মোহিতলাল তখন চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, কিন্তু তাঁহার তখনকার সাহিত্য-প্রীতির ধরন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বদলায় নাই বলিয়া গল্পচ্ছলে তাঁহার সেদিনের যে ছবি আঁকিয়াছিলাম তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

একদিন ছিন্নবেশে দরিদ্র ভিখারীর মত সারকুলার রোড ধরিয়া চাকুরির খোঁজে চলিয়াছি, পথে এক স্থানে হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া

চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, এক চায়ের দোকান হইতে 'ম'বাবু বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। খাঁটি কবি। কোন্ এক স্কুলে মাস্টারি করেন। অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও কবিতা আর বনিতা লইয়াই ভরপুর আছেন। কাছে আসিতেই 'কি হে কেবলরাম ভায়া ?' [কেবলরাম বেনামীতে আমি তখন লিখিতাম] বলিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন, আমার জীর্ণ বেশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কি হে, কবিতাদেবী তোমার স্কন্ধেও ভর করলেন না কি ?' আমি আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তিনি ব্যথিত চিত্তে বলিলেন, 'তুমি আমার ওখানে যাও নি কেন ভাই ? আড়াই জনের পেট যদি ভরে, তবে সাড়ে তিন জনের পেটও ভরবে।' দোকানে উপবিষ্ট তাঁহার বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া আমাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

অত্যন্ত এঁদোগলিতে একটি জীর্ণ বাড়ি। তেতলায় তুইটি মাত্র ঘর। আর একটি নামমাত্র রান্নাঘর। তুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে ঠাকুরঘর বলিলেও চলে। সেইটি 'ম'বাবুর বৈঠকখানা। তাঁহার আদরের মেয়ে [তাঁহার প্রথম সন্তান, ডাকনাম পেলা, ঢাকায় গিয়া ইহার মৃত্যু হয় এবং ইহারই মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন পিতা তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "মৃত্যুদর্শন" লেখেন] 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াই আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। 'ম'বাবু তাহাকে কোলে লইয়া আমাকে তাহার কাকাবাবু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, আজ আমাদের অতিথশালা সরগরম।' আমরা গিয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। বাড়ির চতুর্দিকের জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম,—এই তুঃস্থ পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকা! আমি অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম।

'ম'বাবু বলিলেন, 'ভায়া, গিন্নী রান্না করুন, আমরা ততক্ষণ একটু কাব্যচর্চা করি। খুকী ঘুমিয়েছে।' তিনি তাঁহার দপ্তরপত্র টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

'ম'বাবু ৪৫ টাকা মাহিনার সামান্য স্কুল-মাস্টার; মাসে ১৫ টাকা তাঁহার ঘরভাড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯ তারিখ, হয়তো কাল কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক একটি স্থায়ী

অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শোনাইতে বসিলেন! ধন্য কবিতাদেবী!

কবিতার পর কবিতা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা অন্তরাল হইতে 'ম'বাবুর গিন্নীর ইশারা আসিল। রান্না হইয়াছে। 'ম'বাবু বলিলেন, 'যাও তুমি ভাত দাও গিয়ে, আমরা যাচ্ছি।' বলিয়াই তাঁহার গম্ভীর গলায় পড়িতে লাগিলেন তাঁহার একটি কবিতা, যাহাতে তিনি কবিতা-কল্পনাকে ঘোড়া ও নিজেকে তাহার আরোহী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—অবশ্য একটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার অনুসরণে। দরিদ্র কবির সেই অদ্ভুত উচ্চাভিলাষ ছন্দোবদ্ধভাবে এখনও আমার কানে বাজিতেছে—

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন—
প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে,
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন!···

শুনিতে শুনিতে ভুলিয়া গেলাম—আমি দরিদ্র, দরিদ্রের সহবাসে রহিয়াছি, ভুলিয়া গেলাম কল্য প্রাতেই আমাকে চাকুরির জন্য পথে পথে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইবে। কানে শুধু বাজিতে লাগিল—

ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবায়ে তাদের আলো
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায়!

শুধু সে যুগের কেন, সর্বযুগের মোহিতলালের ইহাই খাঁটি পরিচয়; তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম বলিয়া আমি সেই দুঃসময়েও ভাঙিয়া পড়ি নাই, এবং সাহিত্যকেই তরণী করিয়া দুস্তর জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিবার সাহস করিয়াছিলাম।

'শনিবারের চিঠি'র শেষ কয়েক সংখ্যার কিছু খবর এখানেই দিয়া সাপ্তাহিক পর্ব শেষ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র "তালতলা সাহিত্য" লইয়া অষ্টাদশ সংখ্যায় (২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) 'শনিবারের চিঠি'র রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন; তাঁহার কর্মস্থান ছিল রংপুরে। তিনি সুনীতিকুমারের প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র, এবং পত্রযোগে

তাঁহার সহিত আমাদের যোগাযোগও ঘটাইয়াছিলেন সুনীতিকুমার। কাঠমোল্লারা কেচ্ছা-সাহিত্যের মারফতে বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, স্বভাবত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের যে সর্বনাশ-সাধনে ব্যাপকভাবে তৎপর ছিল, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রই সর্বপ্রথম তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—'শনিবারের চিঠি'ই তাঁহার প্রচারের বাহন হয়। তিনি নিজের সামান্য সাধ্যমত রংপুর-বগুড়া অঞ্চলে ইহার প্রতিকারও করিতেছিলেন। লাঞ্ছনাও তাঁহাকে কম সহিতে হয় নাই। তাঁহার দেহের একাধিক স্থলে প্রতিপক্ষের গুলির চিহ্ন ছিল, পরে সাক্ষাৎ-দর্শনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সুদূর রংপুর (মাহিগঞ্জ) হইতেই তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে অভিযান চালাইতে লাগিলেন। একবিংশ সংখ্যায় তাঁহার "টেক্সট-বুক সাহিত্য" বাংলা দেশের শিক্ষা-বিভাগে এক তুমুল সোরগোল তুলিল। মক্তব-প্রাইমাররূপে যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইত, সেগুলি হিন্দুসমাজের পক্ষে কি পরিমাণ ক্ষতিকর—দৃষ্টান্ত তুলিয়া তুলিয়া তিনি তাহা দেখাইলেন। তাঁহার কল্যাণে 'শনিবারের চিঠি' চিন্তাশীল বাঙালী সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে লাগিল। তিনি তখনই দিবাকর শর্মা নামে খ্যাত হইয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেও নিয়মিত লিখিবার জন্য আহূত হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলা-সাহিত্যে তখনও তথাকথিত আধুনিকতা প্রকট হয় নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের বিখ্যাত হরিকুমারের আবির্ভাবও ঘটে নাই। তাহার আগমন হয় আরও পরে। মোটের উপর, ডাকযোগে রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া 'শনিবারের চিঠি' আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

নজরুল-মোহিতলাল সংঘর্ষ সত্ত্বেও 'কল্লোলে' ও সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে রীতিমত দোস্তি ছিল। আসল কর্ণধার গোকুলচন্দ্র নাগ তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি "তরুণ" কবি ও শিল্পী হইলেও ভদ্ররুচিসম্পন্ন সংযত মানুষ ছিলেন, কোনও

দিক দিয়া শালীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। মূর্তিমান বিদ্রোহের মত মাঝে মাঝে পটলডাঙার পাঁচালিকার যুবনাশ্বের (মনীশ ঘটক) আবির্ভাব ঘটিলেও 'কল্লোলে'র মোটামুটি আবহাওয়া ছিল শান্ত ও সুন্দর। প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নৃসিংহদাসী দেবী, কালিদাস নাগের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র শৈলজা অচিন্ত্য গোকুলচন্দ্রের আদর্শগত কোনও বিরোধ ছিল না; আর পাঁচটা কাগজ যেমন ভালমন্দে পাঁচমিশালি হইয়া বাহির হইত, 'কল্লোল'ও ছিল তেমনই। প্রথম বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিলেন ১৩৩১এর মাঘ সংখ্যা হইতে শ্রীকালিদাস নাগ মূল ফরাসী রম্যা রলাঁকে আসরে অবতীর্ণ করাইয়া। অনুবাদে কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র জ্যেষ্ঠ কালিদাসের সহকর্মী ছিলেন। ব্যাপারটা 'শনিবারের চিঠি'র এতই মনঃপূত হইয়াছিল যে, মাঘের 'কল্লোলে' প্রকাশিত কালিদাস নাগের ভূমিকাটি ৪ঠা মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে হুবহু মুদ্রিত হইল। সংঘর্ষের কোনও সমীচীন কারণ ঘটিবার পূর্বেই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র দেহান্ত ঘটিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায় সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিলেন; শেষোক্ত দুইজন বিদ্রূপে ব্যঙ্গে বার বার আক্রান্ত হইয়াছেন। আর কোনও সাহিত্যিকের কথা আমার মনে পড়ে না। হেমেন্দ্রকুমারের ভাষা ও ভঙ্গির তারল্য 'শনিবারের চিঠি' বরদাস্ত করিত না। হয়তো অন্য কারণও ছিল; সম্পাদক যোগানন্দ দাসের ব্যক্তিগত বিরূপতা। তাসপাশার আড্ডায় কবে কলহ হইয়াছিল তাহার জের চলিয়াছিল 'শনিবারের চিঠি'তে ছন্দোবদ্ধ ব্যঙ্গকবিতায়। আমিও অকারণে শুধু হস্ত-কণ্ডুয়ন-নিবৃত্তির জন্যই যোগ দিয়াছিলাম। সে কলহ মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

যাহা হউক, সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' মরিল বটে, কিন্তু আমি 'প্রবাসী'তে মাটির আশ্রয় পাইলাম। শান্তা দেবী কর্তৃক মনোনীত

বাকি কবিতাটি "মানস-অভিসার" মাঘের (১৩৩১) 'প্রবাসী'তে এবং চৈত্র মাসে সদ্য-রচিত "নারী" কবিতাটি বাহির হইয়া আমাকে মাটিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিল। পর-বৎসর অর্থাৎ ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'প্রবাসী'তে যখন আমার পূর্ণ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী (ছয় কলম) "সভ্যতা" কবিতাটি বাহির হইল, তখন আর আমাকে পায় কে ? 'মানসী ও মর্মবাণী' এবং 'নবযুগ' পত্রিকার মাসিক-সাহিত্য-সমালোচকেরা আমাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিলেন। এই কবিতাটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীকে শান্তিনিকেতনে তাঁহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার ভার আমার উপর পড়িল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার ভক্ত ও কর্মচারী হিসাবে পাদস্পর্শ করিয়া সেখানেই প্রথম প্রণাম করিলাম। তিনি সস্মিত মুখে আমাকে সম্ভাষণ জানাইয়া আবেগহীন শান্ত কণ্ঠে এইটুকু মাত্র বলিলেন, তোমার একটি দীর্ঘ কবিতা বৈশাখের 'প্রবাসী'তে বের হয়েছে দেখলাম। এখনও পড়ি নি। এ দেশে যারা কবিতা লেখে তারা কাজের লোক হয় না। দেখি, তুমি কি কর। আমার কর্মক্ষমতা-সম্পর্কিত বিচারের ফলাফল তিনি কখনও ঘোষণা করেন নাই বটে, কিন্তু পরে অনেক কঠিন কঠিন কাজের ভার আমাকে দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু নন্দলাল ও কানাইলাল দত্তের ভাগিনেয়—ইহা জানিবার পর তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে কখনও কসুর করেন নাই। দীর্ঘ সাত বৎসর কাল আমি তাঁহার স্নেহাশ্রয়ে থাকিয়া অনেক কিছুই শিখিবার সুযোগ পাইয়াছি, নানা দিক দিয়া সুবিধাও কম পাই নাই। তাঁহার প্রসঙ্গ সূত্রপাতেই শেষ হইবার নয়, আমাকে আরও অনেক বলিতে হইবে।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে অন্তিম কালে ষড়বিংশ সংখ্যায় (২ ফাল্গুন ১৩৩১) আমার একটি পত্র প্রকাশিত হয়,

পত্রটি আমার মাত্র দেড় বৎসরের পুরাতন পত্নীর নিকট কবিতায় লিখিত হইয়াছিল। পূর্বতন “কামস্কাট্কীয় ছন্দে”র ন্যায় এই কবিতাটিও আমাকে সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল; জীবনময় রায় ও মোহিতলাল কবিতাটি অনেককে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ইহা পড়িয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তো বড় দুষ্ট হে। আজ গৃহিণী পঞ্চাশৎ না হইলেও বত্রিশ বৎসরের পুরাতন হইয়াছেন, নাতিনী এখনও আসেন নাই বটে তবে নাতিরা আসিয়াছেন—আমার ভবিষ্যৎ কল্পনা বাস্তবকে প্রায় ছুঁই-ছুঁই করিতেছে। সেই কল্পনা একদিন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইবে এই ভরসায় এবং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করিবার জন্য সেটি এখানে অংশত পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, ‘আত্মস্মৃতি’র পাঠকেরা অপরাধ লইবেন না।—

আজি হতে দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে
ষষ্টিপঞ্চ বয়সে তোমার, হে প্রেয়সী,
ছবিটি জাগিছে তব মুগ্ধ এ অন্তরে—
লোলচর্ম বৃদ্ধাবেশ, অয়ি পঞ্চদশী।
সুকৃষ্ণ কুন্তল ঘন শনশুভ্র হয়ে
শোভিতেছে ক্ষুদ্র তব বিরল মস্তকে,
কপোল কুঞ্চিত শীর্ণ কাল-ঝঞ্ঝা স'য়ে,
অধর পাণ্ডুর জীর্ণ সংসার-পরশে।
দশন অভাবে মুখে ভীষণ ভ্রূকুটি,
কুব্জ হয়ে ফিরিতেছ ভগ্ন কটিদেশ,
কপালে গণ্ডেতে রেখা উঠিতেছে ফুটি,
নয়ন-কমলে আর নাহি জ্যোতিলেশ।
বিশীর্ণ অঙ্গুলি তব কাঁপে থরথরি
মুখে বাক্য বাহিরায় অবোধ্য অস্ফুট,
বিড় বিড় বকিতেছ রাত্রিদিন ধরি,
অকারণে বধূদের ধরিতেছ খুঁত।

নাতি ও নাতনী ল'য়ে কাটাইছ বেলা
রঙ্গরস পরিহাস বিরক্তি বিভ্রাটে,
বিনিদ্র রজনী বুকে আনে স্মৃতিমেলা—
অষ্টোত্তরশত নামে শেষরাত্রি কাটে।
শীতে অঙ্গ জরজর, নামাবলী গায়ে
বসেছ উঠান-কোণে রোদে পিঠ দিয়া,
নাতিনী লেপিছে তৈল শুষ্ক তব পায়ে
তার সাথে পরিহাস কর মোরে নিয়া।
আমার এ পত্রগুলি কাল-জর্জরিত
দেখাও তাহারে গর্বে অতি সঙ্গোপনে,
গোপনে শুধাও নাতজামাতার রীত—
কহিয়া আমার কথা হৃষ্ট মনে মনে।
সন্ধ্যায় লেপেতে তব সর্বাঙ্গ মুড়িয়া
কহিছ কাহিনী কত, অতীতের কথা,
স্মৃতি যত আছে তব হৃদয় জুড়িয়া
জীবনের সুখদুঃখ বিষাদবারতা।
মুকুরে দেখিয়া মুখ ভাবিছ বিরলে
পঞ্চাশ বছর আগে কে ছিল সুন্দরী—
বেঁধেছিল হৃদি কার চঞ্চল অঞ্চলে
কে রাখিত প্রেমপাত্র পরিপূর্ণ করি !···
ফাগুন-যামিনী একা কাটাই প্রেয়সী,
ভাবী জীবনের কথা ভাবি অকারণ,
সেদিনের কথা ভেবে ওগো পঞ্চদশী,
কবিতা-কল্পনা মোর মানে না বারণ।···

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' আপনি মরিয়া আমার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নূতন পরিচয়ের জোরে আবার বিশ্বভারতীতে তাঁহার পুস্তক-মুদ্রণ ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য নিয়মিত যাতায়াতের অধিকার অর্জন করিলাম। 'শনিবারের চিঠি'হীন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ মোটের উপর নানা দিক দিয়া আমার কল্যাণেরই সূচনা করিল।

আসন

শস্যশ্যামল প্রান্তরে বিপুল কলোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত তরঙ্গভঙ্গময় নদী যেন অকস্মাৎ অজ্ঞাত মরুবালুকার তলদেশে হারাইয়া গেল। সকলে ভাবিল, নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি জানিতাম, উহা আমাদেরই অবহেলার পাপে অন্তঃসলিলা হইয়া ফল্গুধারায় বিরাজ করিতেছে। আমার অন্তঃকরণ তাহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। আমাকে মাটিতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া জলধারা যেখানেই আত্মগোপন করুক, আমি এ কথা প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করিতাম, একদিন তাহা আবার আত্মপ্রকাশ করিবেই। মাটির আশ্রয় লাভ করিয়া আমি তাহার উপরেই তপস্যার আসন পাতিলাম, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পাপক্ষালন করিতে হইবে। মাসিক মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনে আসন দৃঢ় হইবার কথা নয়, সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধন স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইয়া "বাধ্যতামূলক" হওয়াতে আমার মনের গ্লানি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের কৃপায় বিশ্বভারতীতে পুনরায় প্রুফ দেখার কাজে বহাল হইলাম বটে, কিন্তু সে কাজ তো নির্বেতন আপখোরাকি। দেবদ্বিজে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না, স্বভাব ও বয়োধর্মে একমাত্র নারী-শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতাম, সেই ঘোরতর দুর্দিনে কাজেই তাঁহারই বন্দনা রচনা করিলাম—

…পূর্ণ আজি অনন্ত নিখিল
তব স্নেহরসসুধাধারে। অন্তরের প্রতি বিন্দু রক্তকণাদানে
জীয়াইয়া রাখো তুমি শুষ্ক শীর্ণ পুরুষ-পাদপে; সে ত নাহি জানে
কোথা কোন্ অন্ধকার ভূমিবক্ষ হতে লুব্ধপ্রেমে করে আহরণ
আপন জীবনীরসধারা। অন্তঃপুর অন্তরালে রহিয়া গোপন
কে যোগায় প্রাণের পীযূষ! কত স্নেহ, কত ব্যথা, শঙ্কা দ্বিধা কত
বিনিদ্র রজনী, অনাহার, দেবতা-দুয়ারে শত প্রার্থনা নিয়ত

আজন্ম রেখেছে তারে ঘেরি! সে কি জানে কভু হায়, নিয়ে কত ব্যথা
বাহিরে পাঠাল তারে সংসারের জয়যাত্রা-পথে আর্ত ব্যাকুলতা
জননীর! নিষ্ফল ক্রন্দনে দীর্ণ করি জীর্ণ বক্ষ দেবতা চরণে
জানায়েছে করুণ মিনতি। উল্লাসে যে ছুটে চলে মরণ-বরণে
সে কি জানে প্রেয়সীর নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণা মরণ-অধিক,
সে কি জানে ভগিনীর অশ্রু ছলছল; কত শুষ্ক শূন্য চারিদিক
জননীর নয়নে বিরাজে? সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে আজো তুমি নারী
অন্তরালে রয়েছ গোপনে, আঁধার মৃত্তিকা হতে সঞ্জীবনী-বারি
যুগে যুগে করিছ প্রদান।···

১৩৩১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে দীর্ঘ "নারী" কবিতাটি প্রকাশিত হইল এবং আমার অন্তরের গভীর আবেদন ব্যর্থ হইল না। ভ্রাতা যখন বন্ধুত্ব ও অতি-পরিচয়ের দরুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অন্তরাল হইতে ভগিনী তখন কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করিলেন; আমি অচিরাৎ চল্লিশ টাকা হইতে মাসিক পঁচাত্তর টাকাতেই শুধু উন্নীত হইলাম না, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার স্থায়ী পোক্ত সহকারী-সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়া জীবনে ও সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

শান্তা দেবীকে লইয়া শান্তিনিকেতন পৌঁছিয়াছিলাম ১৩৩২ বৈশাখের মাঝামাঝি; গিয়াই দেখি, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিপুল আনন্দের আয়োজন চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে দলে দলে ভক্তেরা আসিতেছেন, শান্তিনিকেতন সরগরম। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, তখনও পর্যন্ত আমার বিস্ময় শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সহিত অন্তরঙ্গ হইবার কারণ ইতিমধ্যে ঘটিয়াছিল, "নূতন কথামালার গল্প" লইয়া শ্রীবিষ্ণুশর্মা রূপে তিনি সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র আসরে সপ্তদশ (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) হইতে পর পর কয়েক সংখ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এবারেও মুরুব্বি পাকড়াইলাম। মাত্র

মাসাধিক কাল আগে রবীন্দ্রনাথের সহিত কতকটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ব্যাকুলতা ছিল না। এবারে প্রমথনাথ ও কালিদাস নাগকে ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ক্ষিতিমোহনের সহিত পরিচিত হইলাম। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সেখানেও সর্বময় কর্তা, সুরুল শ্রীনিকেতনে তৎপ্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান-সম্মত কৃষিকার্য মহাসমারোহে চলিতেছিল, স্বদলবলে তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। একজন উৎসাহী সংবাদদাতা সংবাদ দিলেন, এই নবপদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিলাতী বেগুন পিছু খরচা পড়িয়াছে কয়েক আনা করিয়া। কৌতুক বোধ করিলাম; সেই দিনই আমার মনে পরবর্তী কালে রচিত "হসন্ত তরফদার" গল্পের গোড়াপত্তন হইল। পরে আরও উপকরণ জুটিয়াছিল।

বিগত দোলপূর্ণিমার দিন (২৬ ফাল্গুন ১৩৩১) বসন্ত উৎসবের মধ্যে 'সুন্দর'কে সঙ্গীতে বরণের মনোহারী আয়োজন কালবৈশাখীর অকাল-অভ্যাগমে ব্যর্থ হইয়াছিল। শুনিলাম, বর্ষশেষের দিন সেই 'সুন্দর'-বরণ সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। 'সুন্দর'—তেরোটি সঙ্গীতের মালা, তন্মধ্যে এগারোটিই নূতন রচিত। আরও সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্বসাধারণের জন্য নহে। শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে লক্ষ্য করিয়া রচিত একটি গানের নিম্নোদ্ধৃত প্রথম দুই পংক্তি লইয়া আমরা খুবই হুল্লোড় করিয়াছিলাম—

"চৈত্র-রজনী আজ যাবে অ-ফলা,
বিরহিণী জপে ব'সে প'য়ে র-ফলা॥" [অপ্রকাশিত]

বলা বাহুল্য, প্রশান্তচন্দ্র সেই বসন্তোৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য আমরা কবির নিকট আবেদন জানাইলাম। আবেদন মঞ্জুর হইল। কবির জন্মদিনে সকাল সাড়ে সাতটায় উত্তরায়ণেরও উত্তরে অশ্বত্থ বট বিল্ব অশোক আমলকী অর্থাৎ "পঞ্চবটী" রোপিত হইল, সন্ধ্যায় কলাভবনে মেয়েদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয়ান্তে 'সুন্দরে'র গান

হইল। মুগ্ধ হইয়া গেলাম; গান শুনিতে শুনিতে এই চিরপুরাতন পৃথিবীর এক চিরনূতন রূপ যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই দিনই প্রথম শুনিলাম—

"আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়?
ওরা কার কথা কয় বনময়?"

এবং

"কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন
দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে
খেলা কেন তব যায় ঘুচে!"

সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, এই "কিশলয়ের বারতা" ও "কুসুম-চরণ-চিহ্নে"র গানের উৎস কবিকে ও আমাকে একই সঙ্গে স্পর্শ করিয়াছিল। আমার নাড়া-খাওয়া মন "অগ্নিদূত"কে আহ্বান করিয়াই শান্ত হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন 'সুন্দরে'র অজস্র গান। আলিপুর হাওয়া-আপিসের অরণ্যময় পরিবেশই যে এই উৎস, তাহা প্রমথনাথের সম্পাদকীয় দপ্তরে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের ভাষণের নিম্নোদ্ধৃত অংশ দৃষ্টে বুঝিতে পারিলাম—

"এবার অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর পশ্চিম কূলে ব'সে ম্লান প্রাণের আলোকে অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে দূরে আপনাকে ও বিশ্বকে দেখবার অবকাশ পেয়েছিলুম। কলকাতায় যেখানে ছিলুম সেখানে শহরের পাথরে-বাঁধানো শুষ্কতা ছিল না, চারদিক গাছপালায় ছিল শ্যামল। সেখানে এবার অনেক দিন পরে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন স্পর্শ করে দেখতে পেলুম। হঠাৎ গাছপালার তন্দ্রা ছুটে গেল, বিশ্বযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তাদের কাছে এসে পৌঁছল, সাজসজ্জার সাড়া প'ড়ে গেল; ফিকে সবুজে, গাঢ় সবুজে, নীলে, লালে, সোনালীতে প্রত্যেকে নিজের বিশেষত্ব নিয়ে আনন্দিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে এল; দেখে আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল। কোথা থেকে এ ডাক এল, যার সাড়া সমস্ত পৃথিবীর বুক থেকে উঠছে! আকাশের কোন্ গূঢ় অলক্ষ্য চঞ্চলতা দক্ষিণ

হাওয়াকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে! তরুলতার প্রাণশক্তি রূপের লীলায় দিকে দিকে বিচিত্র হয়ে উঠল। প্রত্যেক গাছ আপনার স্বরূপকে পরিস্ফুট ক'রে তুলছে। প্রাণ যেখানে আপন বিশেষত্বের ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্য, সেইখানে সে বিশ্বকে উদারভাবে আহ্বান করে। এক ধারে অশ্বত্থ, তারি পাশে শিরীষ, তারি পাশে কাঞ্চন—তারা সকলেই রূপে স্বতন্ত্র অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতাতেই তাদের পরস্পরের ভাবের মিল। আকাশ-বীণার একই আলোকের সুরে তাদের নিজ নিজ বিভিন্ন রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। অরণ্যব্যাপী প্রাণের আনন্দ-সঙ্গীতে তাদের অবিরোধ মিলন। প্রত্যেক গাছ আপনার বিশেষ আতিথ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপন আত্মীয়তা জানাচ্ছিল। তা না হ'লে গাছ দেখে আমার মনে কোনো ভাব আসত না। যখনই সে নিজেকে পূর্ণ করলে, তখনই সে আমাকেও আহ্বান করলে—তার আপনার পূর্ণতা আমারও পূর্ণতাকে উদ্বোধিত করলে।" [পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত]

নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমিও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আসিয়াই পূর্বোল্লিখিত উন্নত বেতন ও পদমর্যাদার দ্বারা সম্মানিত হইলাম। 'প্রবাসী'-কার্যালয়েই কাজের বহর এত বাড়িয়া গেল যে, বিশ্বভারতীর সেবা কদাচিৎ করিতে পারিতাম। একদিন সেখানে গিয়া শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে প্রধানত 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র কবিতাগুলি লইয়া। আমার অনুলিখিত ডায়ারির শেষাংশও জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছে, সুতরাং পুস্তকাকারে প্রকাশের বাধা নাই। প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ নয় বৎসরকাল কবির কোনও কাব্যগ্রন্থ বাহির হয় নাই, সেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বলাকা' প্রকাশিত হইয়াছে; 'পলাতকা' (১৯১৮) এবং 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২) অবশ্য হিসাবের মধ্যে ধরিতেছি না। নূতন কবিতাগুলির সঙ্গে কাজেই পুরাতন ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতাগুলিও ছাপাইবার প্রস্তাব হইল। আধুনিক পুরাতন খুঁজিতে খুঁজিতে

অতি পুরাতন অনেকগুলি কবিতাও আবিষ্কৃত হইল—অনেকগুলি স্বদেশী আমলের বিখ্যাত কবিতা—যাহা এতাবৎকাল পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমার খাতায় নকল ছিল, আমিই সেগুলি সরবরাহ করিলাম। বইখানির তিন ভাগ হইল, "পূরবী"-অংশে হালী পুরাতন কবিতা, "পথিক"-অংশে নূতন ডায়ারির কবিতা এবং "সঞ্চিতা"-অংশে হারাইয়া যাওয়া পুরাতন কবিতা। কলিকাতা বিশ্বভারতী আপিসের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়া শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি 'পূরবী' বাহির হইল। যথাসময়ে এক কপি হাতে পাইয়া পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। অসংখ্য ভুল এবং বিশ্রী ভুলে ভরা বইখানি আমার শিরঃপীড়ার কারণ হইল। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন। অবিলম্বে সংশোধিত কপিখানি সরাসরি তাঁহার নিকট দাখিল করিলাম। তিনি অতি সংযত ধীরস্থির পুরুষ; সেদিন দেখিলাম, রাগে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং তখনই কাহাকে যেন ডাকিয়া বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করিতে করিতে হুকুম দিলেন, সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নতুন ক'রে ছাপাও। এই সকল ভুলের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব অনবধানতা দুই এক ক্ষেত্রে ছিল, সেগুলির প্রতিও আমি সভয়ে ও সাবধানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। এই ধরনের ভুল কবি মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা দোষের হইবে না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন এবং রামমোহন লাইব্রেরিতে স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে গোড়াগুড়ি এই পংক্তি কয়েকটি ছিল—

> "সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
> আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
> দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
> রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার।..."

আঠারো অক্ষরের পয়ার। পয়ারের ধর্ম অনুযায়ী চার বা আট অক্ষরের পরে যতি স্বাভাবিক ও নিরাপদ। ছয় বা দশ অক্ষরের পর যতি দিতে গেলেই বিপদ অনিবার্য; "দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত…" পংক্তিতেও সেই বিপদ ঘটিয়াছে, যতি পরিবর্তনের ফলে দুইটি অক্ষর আপনা হইতেই বাড়িয়া গিয়া পংক্তিটি কুড়ি অক্ষরে দাঁড়াইয়াছে। ইহা ভুল। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেও কয়েকবার এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন, 'পূরবী'তেও অন্যত্র এই ভুল ঘটিয়াছে। অমন যে ছন্দ-সাবধানী মোহিতলাল, তিনিও 'বিস্মরণী'র "সুইনবার্নের অনুসরণে" কবিতায় যতিভঙ্গের জন্য এই অক্ষরাতিশয্যদোষ এড়াইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ আমারই 'পূরবী'তে স্বয়ং এই সংশোধন করিলেন—

"দিয়ে গেলে গীতচ্ছন্দ; কাননের পল্লবে কুসুমে…"

পরবর্তী সংস্করণ ছাপিবার সময় আমার বইখানিই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্য সকল ভুল আদর্শানুযায়ী সংশোধিত হইলেও "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতার এই পংক্তি সংশোধিত হয় নাই, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তেও ভুল থাকিয়া গিয়াছে। "গ্রন্থ-পরিচয়ে" শ্রীপুলিনবিহারী সেন অবশ্য ভুলটির উল্লেখ করিয়া অন্য সংশোধন দিয়াছেন।

শ্রীনিকেতনে কৃষিকর্মের মত আর একটি কঠিন ও কৌতুককর কাজে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতার বিশ্বভারতী আপিসেই হাত দিয়াছিলেন—গণভোটের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-বিচার। তাঁহার অদম্য স্ট্যাটিসটিক্স্-বুদ্ধি এই ধরনের "একটা নতুন কিছু করা"র দিকে তাঁহাকে এই কালে অবিরত প্ররোচিত করিতেছিল; তিনি বিশ্বভারতীর উপর দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। এই পরীক্ষা যদি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারেই শেষ হইত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। তিনি ভোট-মাহাত্ম্য বিচারে

তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ 'চয়নিকা' ছাপিতে বসিলেন। আমরা প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম, কিন্তু স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ কখনও যুক্তি মানে না। ফাল্গুন মাসে (১৩৩২) সেই বিপুলকায় বিচিত্র 'চয়নিকা' বাহির হইয়া রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রতিকার করিতে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে তাঁহার 'স্বয়ং'-নির্বাচিত 'সঞ্চয়িতা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবি গণ-'চয়নিকা'র সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেন।

বাহিরের সঙ্গে সংযোগ আমার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, 'প্রবাসী' কার্যালয়ই আমাকে ধীরে ধীরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। মাসিক পঁচাত্তর টাকা তখন আমার প্রয়োজনের অতিরিক্তই মনে হইয়াছিল। বাবা, মা বা অপর কেহ আমার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না, গৃহিণী ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত কখনও ধানবাদে মাতুলালয়ে, কখনও শ্যামবাজারে পিত্রালয়ে দোল খাইয়া ফিরিতেছিলেন। আকস্মিক সমৃদ্ধির মোহে সংসার পাতিবার বাসনা স্বতই হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র সাতাশ নম্বর বাদুড়বাগান লেনের মেসে আমাকে আর যেন ধরে না, বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের অপঘাত-মৃত্যু এবং মোহিতলাল মজুমদারের মেস-ত্যাগেও মনটা উদাস হইয়াছিল। বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, যিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে একুশ-কামান-গর্জন-সম্বর্ধিত প্রথম অস্ত্রোপচারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের অন্যতম বংশধর। কথায় কথায় জানিলাম, তাঁহাদের বাহির-মির্জাপুর রোডের বাড়ির নীচের অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে। মাসিক ভাড়া ত্রিশ। একা অতখানি সামলাইতে পারিব না ভাবিয়া শিল্পীবন্ধু এবং মেসের রুমপ্রতিবেশী শ্রীহরিপদ রায়ের সঙ্গে একযোগে বাড়ি ভাড়া লইব স্থির হইল। তখন আমার আসবাব ও বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত মন্দ নয়; হরিপদ রায় তো চিরকালই খুদে লাট। আমার

জীবনে যে কয়েক জন খাঁটি অ্যারিস্টক্র্যাটকে আমি দেখিয়াছি, তিনি তাহাদের অন্যতম ও প্রথম। তাঁহারও লটবহর বড় কম নয়। একদিন প্রাতে আমাদের মালবাহী ক্যারাভ্যান বাদুড়বাগান লেন হইতে বাহির হইয়া আপার সারকুলার রোড অতিক্রম করিয়া রামমোহন রায় রোড ধরিয়া বাহির-মির্জাপুরের দিকে চলিল, পিছনে পিছনে জলভরা কুঁজা হস্তে আমরা দুই হাফ-গৃহস্থ পরস্পর সহযোগে পূরা গৃহস্থালী পাতিতে চলিলাম। হঠাৎ আমার পিছনে টান পড়িল। ফিরিয়া দেখি, আমার বাঁকুড়া কলেজ হস্টেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিরণচন্দ্র দত্ত, উস্কখুস্ক রুক্ষ বেশ; আমার প্রশ্নাতুর বিস্মিত দৃষ্টির কোনও জবাব সে দিল না; কোনও রকমে শ্রান্ত দেহ টানিয়া নীরবে আমার পশ্চাদ্ধাবন করিল। চার নম্বর বাহির-মির্জাপুর রোডে আমরা তিনটি প্রাণী একতলায় অধিষ্ঠিত হইলাম। কিরণচন্দ্র কুচবিহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস.এর খুল্লতাতপুত্র; চারু বাবুদেরই কলিকাতা গঙ্গাধর বাবু লেনের বাড়িতে আরাম-আলস্যে থাকিয়া সে লেখাপড়া করিতেছিল। কিরণেরই সম্পর্কে চারুচন্দ্র দত্তকে আমি দাদা বলিতাম, তিনিও কনিষ্ঠবৎ আমাকে স্নেহ করিতেন। বুঝিলাম, পারিবারিক কলহের ফলেই কিরণ দেওয়ানা হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহাকে আর ঘাঁটাইলাম না, চুপচাপ নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে দিলাম।

হরিপদ রায়ের চেষ্টায় গোবিন্দ নামধেয় এক মদ্রদেশীয় কমবাইণ্ডহ্যাণ্ড জুটিল, সে-ই একাধারে আমাদের ঠাকুর চাকর ঝি দারোয়ান সব। হরিপদ রায় স্বয়ং অত্যন্ত সুগৃহিণী, রান্নায় দ্রৌপদী বলিলেও হয়। তিনি একদিন গুরুতর একটা ভোজের আয়োজন করিলেন। তাঁহার গৃহিণী দূর বরিশালে শ্বশুরালয়ে ছিলেন; তাঁহার এক শ্যালিকা এবং আমার গৃহিণী সেই ভোজে আমন্ত্রিত হইয়া আমাদের সংসারাশ্রমের গোড়াপত্তন করিলেন।

কিরণ তখনও অবিবাহিত, সুতরাং সে বৈঠকখানায় রহিল। সেই প্রায় "ব্যাচিলার্স ডেনে" অকস্মাৎ নারীসমাগম হওয়াতে পাড়ায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী পুনর্জীবনে এই হরিপদ রায়ের স্থান প্রায় সর্বাগ্রে; ইনি বর্তমানে একজন প্রসিদ্ধ কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, কিন্তু গোড়ায় অবিরত উৎকৃষ্ট কার্টুন আঁকিয়া মাসিক 'শনিবারের চিঠি'কে মাসে মাসে ইনি সমৃদ্ধ না করিলে ইঁহার এত দ্রুত প্রতিষ্ঠা হইত না। আমাদের লেখার সঙ্গে রেখায় তিনি সমানে তাল রাখিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখিতেন। 'শনিবারের চিঠি'র মাসিক প্রথম পর্যায়ে ইনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নব পর্যায়ে ফেনী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পি. সি. এল. ও কাফী খাঁ নামে খ্যাত) হরিপদ রায়ের স্থলাভিষিক্ত হন। আমারই আকর্ষণে তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া শুধু কার্টুন-শিল্পী হিসাবে কলিকাতার সাময়িক-পত্রজগতে ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং অশেষ যোগ্যতার সহিত আজ এই পথেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এই দুই শিল্পীর কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়।

আমার এই বাহির-মির্জাপুরী জীবনের একটি প্রায় নিখুঁত চিত্র "গল্প" নাম দিয়া ১৩৩২ সালের পৌষের 'প্রবাসী'তে বাহির করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, এখানে বেশিদিন আমাদের থাকা হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার কারণ সেই "গল্প" হইতেই একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

> পেয়ালার [চায়ের] ঠন্‌ঠন্‌ যত দ্রুততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক সত্তর-পঁচাত্তর টাকা কোথায় ফুঁকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল, এবং একদিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম, এ লাটীয় চাল চলিবে না—পুনর্মূষিক হইতে হইবে। মেস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শশুরের

কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম, তিনি খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ি এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগবাজারে [শ্যামবাজারে] তাঁহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া যতীনকে [বাড়িওয়ালা] নোটিশ দিলাম। গোবিন্দকেও অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।

আশ্বিন মাসের (১৩৩২) মাঝামাঝি এই ঘটনা ঘটিল। হরিপদ রায় বরিশালে পূজাবকাশ যাপন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন, কিরণও ছুটিতে দেশে গেল। আমি দিনাজপুর হইতে হঠাৎ তারযোগে মায়ের নিদারুণ অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটি লইয়া সেখানে চলিয়া গেলাম। আমাদের সাধের সংসার সূত্রপাতেই ছারখার হইল।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র মরুবালুতলে প্রথম অন্তর্ধানের (৯ ফাল্গুন ১৩৩১) পর ১৩৩২এর আশ্বিন পর্যন্ত এই আট মাস কালে সাহিত্যের দিক দিয়া আমার অনেক লাভ হইয়াছিল—অধিকাংশই মোহিতলালের দৌলতে, একটি শুধু শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয় ছিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রতিবেশী। প্রায় সামনাসামনি ঘর। দুই বাড়িতে নিত্য যাতায়াত ছিল। বসু মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী আমার গৃহিণীকে নাতনী বলিতেন, আমি হইলাম তাঁহাদের নাতজামাই। রসরাজ বহুদিন আমাকে ধরিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের আড্ডায় লইয়া যাইতেন। বহু পুরাতন কাহিনী, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ব্যাজস্তুতিমূলক কথা তাঁহার নিকটে শুনিতে পাইতাম। যে বার শেষ জেলেপাড়ার সং হয় সে বার আমরাই দুই জনে মিলিয়া সঙের গানগুলি লিখিয়াছিলাম; দাদাশ্বশুর-নাতজামাইয়ের সম্পর্ক ইহা দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। এই কালে অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র যখন ফল্গু-অবস্থা, তখন তিনি আধুনিক প্রেমের কবিতা পাঠে অপ্রসন্ন হইয়া "শ্রীকবরীরঞ্জন

গ্যাংগার্জি" এই বেনামে কয়েকটি অতি সাংঘাতিক ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়া আমাকে প্রকাশার্থ দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশ করিতে পারি নাই, একটি মাত্র আজও আমার সংগ্রহে আছে, নাম "ঢুলীনী-দোলন"; সবটা ছাপিবার সাহস নাই, শেষ চারিটি পংক্তি এই—

"মজালে, গজালে বুঝি তাজা ভালবাসা—
কালো-কোলো ঢুলীনীর এই যাওয়া-আসা।
পোয়েটিক প্রেম লিখি ঢেলে দিয়ে দেল,
হই-হবো হই-হবো ম্যাট্রিক্ ফেল ॥"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহিতলাল আমাকে এক রকম হাতে ধরিয়া ইঁহাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন; আর একটি বিচিত্র মানুষের সহিত তাঁহারই দৌলতে আলাপ হইল—তাঁহার অতিপ্রিয় ছাত্র শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী। প্রথম দর্শনে করুণানিধানের যে ভাবে-ভোলা দিগম্বর মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার পর পূরা ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, তিনি এখনও ঠিক তেমনটি আছেন। যে উত্তপ্ত সমাদরে তিনি সেদিন আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া "ভাই সজনী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আজিও উত্তাপ সমান আছে, সমাদরের এতটুকু ব্যত্যয় হয় নাই। কাব্যই জীবন—ইহা তাঁহার মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে নহে। তিনি অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুসন্ত শ্রেণীর মানুষ, অথচ খাঁটি কবি; ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কান যেমন এক দিকে নিখুঁত যন্ত্রের মত কাজ করে, তেমনই অন্য দিকে তাঁহার মন ভাব সম্পর্কে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। যেখানে ভাবের স্পর্শ নাই সেখানে কবিতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না; শুধু ছন্দের ঝঙ্কার তাঁহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে—এ বিষয়ে তাঁহার বিচার অতিশয় নির্মম ও কঠিন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কেও ভাল লাগিয়াছিল। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম;

এইটুকুও বুঝিয়াছিলাম, তিনি হিসাবী ভদ্রলোক। তাঁহার কাব্যবুদ্ধি তাঁহার বিষয়বুদ্ধিকে কখনই পরাভূত করিতে পারে নাই। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার মান-অভিমান অনেক সময় পীড়াদায়ক বলিয়া ঠেকিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অনাবিল কাব্য ও সাহিত্য প্রীতি আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সান্নিধ্যে আমি খুব বেশি আসি নাই; কিন্তু যখনই গিয়াছি, তিনি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহনেরই মিতা-সুবাদে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সহিত আমাদের পরিচয়। তাঁহার কাব্যে যেমন একটা বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা সুপরিস্ফুট, মানুষটির মধ্যেও তেমনই উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি ছিল না, তাঁহার মুখের শান্ত সংযত মৃদু হাসি তাঁহার উদাসীন নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও আমাদের আকর্ষণ করিত। এই সংসার-মরুভূমিতে তিনি 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', ও 'মরুশিখা' দেখাইয়া হয়তো আমাদিগকে নির্ভয় হইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই, তাঁহার বিজ্ঞান দর্শনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যে দুর্জ্ঞেয় শক্তির বিরুদ্ধে 'মরীচিকা'য় "ঘুমের ঘোরে" তাঁহার অভিযান, বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে পাইতেছিলাম তিনি শেষ জীবনে ধীরে ধীরে সেই শক্তিরই নিকট ধরা দিয়াছিলেন, অবশ্য তাঁহার সূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির (হাতুড়ে অনুসন্ধান নয়!) দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া বুঝিয়া। এই কয়জন কবির মধ্যে একমাত্র তিনিই 'শনিবারের চিঠি'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া আমাদের সুখদুঃখনিন্দা-প্রশংসার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ৩১এ ভাদ্র তাঁহার মৃত্যুদিবস পর্যন্ত লেখক হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সৌজন্য ও শালীনতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একত্রে এমন ভদ্রতা, সাহিত্যবুদ্ধি, রুচিবোধ ও সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার মাথা

হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক কষ্টসহিষ্ণুতার সাক্ষ্য বহন করিত; কিন্তু তাঁহার মুখের প্রসন্ন হাসি ক্ষণেকের তরেও মিলায় নাই। তিনি যে জাপানে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার রচিত 'জাপান' ও 'চিত্রবহা'য় যতটুকু আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তাঁহার আতিথেয়তায়, তাঁহার গৃহশ্রীতে, সেখানে ধূপদীপের সুন্দর সন্নিবেশে। তিনি খুব ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁহার উচ্চকণ্ঠ কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি তখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'চিত্রবহা' রচনা করিতেছেন, আমরা সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া একটু একটু করিয়া শুনিতেছি, সঙ্গে আহার্যের যে সামান্য আয়োজন থাকিত পরিবেশন-পারিপাট্যে তাহা পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিত। আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত আমি এখানেই প্রথম পরিচিত হই। দেবীপ্রসাদ অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং আমাদের পরস্পর অন্তরঙ্গ হইতে বিলম্ব হয় নাই। দেবী-প্রসঙ্গ আমার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া আছে, যথাস্থানে তাহা নিবেদন করিব।

সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর দিনটি আমার মনে পড়ে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—বাতি দুই দিকে জ্বলিয়া দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার কথা; দেখিলাম, তিনিও দুই দিকে জ্বলিয়া দ্রুত ফুরাইয়া গেলেন। বর্ধিষ্ণু পিতার সন্তান তিনি; পিতার সহিত সত্য ও নীতি লইয়া সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, কিন্তু তিনি সত্যচ্যুত হইয়া পিতার আশ্রয়ে বাস করেন নাই—বীরের ন্যায় তাঁহার সত্যকে লইয়াই পৃথক হইয়াছিলেন। অনেক দুঃখ পাইয়াছেন, কিন্তু কখনও অনুশোচনা করেন নাই। চাকুরি করিয়াছেন এবং সামান্য অবসরকালে সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন; বাহিরে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করেন নাই, অন্তরে বাণীর আশীর্বাদ পাইয়াছিলেন কি না তিনিই বলিতে পারেন। আমরা

তাঁহার মধ্যে একজন আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিককে পাইয়া শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। হয়তো ইহাই তাঁহার নীরব সাধনার নীরব পুরস্কার

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে বিচিত্র মানুষ বলিয়াছি। বেঁটেখাটো মানুষটি অথচ বিদ্যার জাহাজ। সাত সমুদ্র তেরো নদ র খবর তাঁহার নখাগ্রে ছিল, ফরাসী-সাহিত্যের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং সারা পৃথিবীর সামরিক বিদ্যার তিনি ছিলেন মানোয়ারী জাহাজ। তাঁহার ভাল-লাগা এবং মন্দ-লাগা গুরু মোহিতলালের মতই অতি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ছিল; একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির ছিলেন, বিপুল সমারোহে কাজ আরম্ভ করিয়া মধ্যপথে থামিয়া যাওয়া তাঁহার একটা বিলাস ছিল; আরম্ভ করিয়া তিনি শেষ করিতেন না, গাছে উঠিয়া নিজেই মই ফেলিয়া দিতেন। তখনই ইউরোপীয় জ্ঞান ও আদর্শকে এত উচ্চে স্থান দিতেন যে, দেশের সব কিছুর প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব তাঁহার কথায় বার্তায় প্রকাশ পাইতেছিল। এই ভাবেরই চরম পরিণতি তাঁহার 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান'। মনোরথের উত্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে পতনের ফলে অর্থাৎ ফ্রাস্ট্রেশনের দরুন তাঁহার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া তাঁহাকে কাজেকর্মেও খর্ব করিয়াছিল, নতুবা তাঁহার মত হিমালয়-প্রতিভা হ্রস্ব বিন্ধ্যগিরি হইয়া কখনই থাকিতেন না; নিশ্চয়ই তাঁহার সাধনার দ্বারা স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বসাহিত্যকে প্রসন্ন করিতেন, আঘাত করিয়া উল্লাস করিতেন না। তিনি পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'র কর্ণধারগণের অন্যতম প্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহার সরস বিদ্যাবত্তার ফলে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই 'শনিবারের চিঠি'র আপন হইতে পারেন নাই।

মাটি পাইলাম, মাটিতে আসন বিছাইয়া সাধনা আরম্ভ করিলাম। অকস্মাৎ যে প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছিল, যে প্রবাহ আমাদেরই দোষে মরুবালুতলে লুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতাম,

তাহাকে পুনরায় সমতলক্ষেত্রে বহমান করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম। 'প্রবাসী'তে গল্প কবিতা প্রবন্ধ পুস্তক-পরিচয় পঞ্চশস্য লিখিতাম, কিন্তু তাহাতে আমার মন ভরিত না। 'শনিবারের চিঠি'র উপকরণ আমার জীর্ণশীর্ণ বাক্সে খাতার পাতায় সঞ্চিত হইতেছিল। দরিদ্রা শবরীর মত আমি ব্যাকুল প্রাণে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

মায়ের কঠিন ব্যাধির খবর পাইয়া 'শনিবারের চিঠি'র চিন্তা-ভাবনা কলিকাতায় ফেলিয়া আমি দ্রুত দিনাজপুরে উপস্থিত হইলাম। উনিশ শ পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস।

ষোড়শ তরঙ্গ

অলৌকিক

রান্না করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া জ্বলন্ত উনানের উপর পড়িয়া মা বিশ্রীভাবে পুড়িয়া গিয়াছিলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন; বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন বাবা অস্থিরচিত্তে বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন; দাদারা, বউদিরা ও ছোট ভাই মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন।

মায়ের এই মূর্ছারোগের একটা অলৌকিক ইতিহাস আছে। আমার জীবনে আমি বহু বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার মধ্য দিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে; আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে একজন বিচিত্র-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ বলিয়া জানেন। আমার সেই সকল অভিজ্ঞতা আমার সাহিত্যিক আত্মস্মৃতির পর্যায়ভুক্ত নহে। তাঁহারা অনেকেই আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আমি কখনও অলৌকিক কোনও ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কি না? আমি বিজ্ঞানের ছাত্র; আচারে-ব্যবহারে, ভ্রমণে-পর্যটনে, খাদ্যে-পানীয়ে কালাপাহাড় বলিয়া পরিচিত মহলে আমার অখ্যাতি আছে। তবু আজ অস্বীকার করিতে পারি না অলৌকিক শ্রেণীর দুইটি ঘটনার আমি সাক্ষী হইয়া আছি। দুইটি ঘটনাই আমার মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, আমার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সাহিত্যবুদ্ধি ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ঘটনা দুইটির উল্লেখ আমার সাহিত্যজীবনে অবান্তর নহে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ-ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীতে আমার মেজদাদা নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমরা পালা করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলাম। সেদিন সকালে

বাবা আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া মেজদার শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া একতলা বাড়ির ছাদে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাবিজড়িত চোখে পাখা করিতে করিতে ঠিক মাথার উপরে বাবার ভারি পায়ের শব্দ শুনিতেছিলাম। মেজদা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ বাবার পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। প্রতিবেশী বন্ধু যতীনকাকা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া মেজদার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে আসিল, আজই শেষ হয়ে যাবে। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ঘুমজড়ানো চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল। সে কি ?—বলিতে বলিতে যতীনকাকা বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন, বাবাও ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি আড়ালে থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিলাম। বাবা যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য এই : মা তাঁহার পালা শেষ করিয়া পাশের ঘরে একটু গড়াইয়া লইতে গিয়াছেন, বাবা একা পুত্রের শিয়রে বসিয়া রাত্রির শেষ প্রহর জাগিতেছেন। সহসা একটা অস্বাভাবিক লাল আলোতে সমস্ত ঘরটা উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত চমকিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইতস্তত চাহিলেন, কোথাও কিছু নাই। মুমূর্ষু মেজদা হঠাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যেন অভ্যাগত কাহাকেও সম্বর্ধনা করিয়া বলিলেন, এই যে আমি যাচ্ছি।—বলিয়া তিনি আবার বালিসে মাথা রাখিলেন, লাল আলো মিলাইয়া গেল। বাবা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। সর্বশেষে বাবা বলিলেন, দাদার (অর্থাৎ আমার জ্যাঠামহাশয়ের) মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ঠিক এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। দাদা সেদিন মৃতা পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, আজ অজুর কাছে কে আসিয়াছিল জানি না।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত না হইতেই সত্যই সব শেষ হইল। আমাদের ক্ষুদ্র সুখী সংসারে সেই প্রথম মৃত্যু প্রবেশ করিল। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দিদি নিতান্ত শিশু অবস্থায় বিদায় লইয়াছিলেন, সে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করে নাই। মেজদার মৃত্যুতে

বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বাবা খুবই বিচলিত হইলেন। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন। মৃত্যুর পরদিন দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্বে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা মায়ের শয়নঘর অর্থাৎ বড় ঘরের মেঝেতে চৌকিতে বসিয়া মেজদারই প্রসঙ্গ আলাপ করিতেছিলাম। মা দুধ গরম করিতে সামনেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একটা খালি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণ শীর্ণ মেজদাদা আসিয়া বসিয়াছেন। বাবা চিৎকার করিয়া মাকে ডাকিলেন, ওগো, কে এসেছে দেখে যাও। মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে শোওয়ার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়া মেজদাকে দেখিয়াই "বাবা আমার" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুধের বাটি ছিটকাইয়া ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করিতে করিতে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। আমার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখি, মেজদা অন্তর্ধান হইয়াছেন। মায়ের মূর্ছার সেই সূত্রপাত। তাহার পর ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। মা কোথাও স্তব্ধ হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিতাম, বিপদ আসিতেছে। তিনি, কি জানি, সম্ভবত মেজদাকে দেখিতে পাইতেন এবং একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।

মৃত মেজদাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। বাবা মেজদার নাম ধরিয়া ডাকাতেই আমরা হিপ্‌নোটাইজ্‌ড হইয়াছিলাম, ঘটনাটিকে কখনই সেই ভাবে উড়াইয়া দিতে পারি নাই। পরে এই বিষয়ে বহু বই পড়িয়াছি, বড় বড় নামকরা পথভ্রষ্ট (?) বৈজ্ঞানিকদের আলোচনাও দেখিয়াছি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি। বিভূতিকে বাহিরে কখনই আমল দিই নাই, ঠাট্টা করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গুধারার মত মৃত্যুপরপারের এই টুকরা রহস্যটি

আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করিয়াছে। সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গেই মানুষের আরম্ভ নয়, এবং চিতায় দগ্ধ হইয়াও যে তাহার শেষ নয়—এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়মূল। যাঁহারা এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—আমার মেজদাদা, আমার মা, আমার বাবা, আমার বড়দাদা—তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্তমান আছেন, আমি যেমন গতজন্মে বর্তমান ছিলাম এবং পরজন্মে থাকিব। এই বিশ্বাস আমার কাব্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। যথা—

মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।
মৃত-জীবিতের মাঝে হে বন্ধু, কিসের ব্যবধান,
মৃত্যুরে কে জানিয়াছে, কে পেয়েছে জীবন-সন্ধান?
মরণ-তীর্থের যাত্রী মায়ের কোলের শিশু
একাকার নির্মম বিচারে!
মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।

কে জেনেছে সবখানি আকাশে?
অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণ-মৃত্যু কান্না-হাসি সম্ভব-বিলয়,
রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি, বুঝি শুধু আভাসে।
কে জেনেছে সবখানি আকাশে?

'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্রে মাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলাম—

জননী, কঠোর মৃত্যু তোমারে ঢেকেছে অন্ধকারে,
হ'ল সে অনেক দিন—
দেখিতে পাই না দেহ-ক্ষয় করা সেই করুণার ধারা।
ওপার হইতে এপারে আমারে তুমি এনেছিলে মাতা,
হারাইয়া আজ গিয়াছ আমার জ্ঞান-বুদ্ধির পারে;

বুঝিতেও নাহি পারি,
যে পথে চলেছি সেই পথে মোর ক্লান্ত দিনের শেষে
রেখেছ কি পেতে স্নেহ-কোলখানি তব ?
বুঝিতে পারি না, তবু আছে আশ্বাস।

জননী, আমার জন্মদিবসে তুমি রচেছিলে সেতু
আমার আঁধারে আলোকে, আমার অতীতে বর্তমানে।
তুমি নাই তাই এত ব্যবধান আলোকে অন্ধকারে,
ব্যবধান-মুখে তড়িৎ-তীব্রজ্বালা।
যেখানেই থাকো জননী, আবার সেতু কর নির্মাণ,
সহজ-ব্যথায় আমারে প্রসব কর তুমি পরপারে।

এবং সেদিন একটি গানে এই কথাটাই স্পষ্টতর করিয়াছি—

জনম-মরণ পা-ফেলা আর পা-তোলা তোর ওরে পথিক,
স্মরণ যদি রাখিস তবে পদে পদে ভুলবি না দিক।
নয়কো শুরু আঁতুড় ঘরে
শেষ নয়কো চিতার 'পরে
আগেও আছে পরেও আছে এই কথাটা বুঝে নে ঠিক।

এই বিশ্বাসের সমর্থন আমি পাশ্চাত্ত্য আধুনিক বিজ্ঞানেও পাইয়াছি; সার্ অলিভার লজ প্রমুখ স্পিরিচুয়ালিস্টদের কথা বলিতেছি না; অ্যালেক্সিস ক্যারেল, জে. বি. রাইন, কেনেথ ওয়াকার, জে. ডব্লিউ. এন. সালিভান প্রমুখ খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরা নিছক বিজ্ঞানের পথে মানুষের হদিস না পাইয়া "আন্‌নোন্" বা অজ্ঞাতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্যারেল বলিয়াছেন, মানুষ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে স্বশরীরে প্রিয়-সমাগমে আসিতে পারে, স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তাও বলিতে পারে।* আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উচ্চ বিজ্ঞান মানুষের আত্মার

* Alexis Carrel: 'Man, the Unknown'—"Mental Activities" অধ্যায়।

রহস্যসন্ধানে পরাজিত হইয়া চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকদের মনে অজ্ঞাতের যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত জাগাইয়া তুলিতেছে, মানুষের আদিমতম ছন্দোবদ্ধ চিন্তাধারায় সেই অজ্ঞাতই আশ্চর্য রকম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের কথা বলিতেছি। এই বিচিত্র ব্যাপার কি করিয়া সম্ভব হইল, আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সম্ভব যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ঋষি বামদেব-রচিত সূক্তে আছে। বামদেব আমাদের ভৌতিক ইহজীবনকে বলিয়াছেন—গর্ভবাস। মৃত্যুতে আমরা যেখানে ভূমিষ্ঠ হই সেখানে আমরা পূর্ণ পরমাত্মাকে অবগত হইব, এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া বামদেব বলিতেছেন,

> "ভাই সকল! তোমরা কি বলিতেছ? দ্যুতিমান স্বর্গে জন্মলাভ করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইবে? আমি বলি যে, তাদৃশ জন্মলাভের পূর্বে এই গর্ভবাসকালেই (মাংসময় দেহে বর্তমান থাকিয়াই) আমি পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছি।"*

বামদেবের আত্মকাহিনী বড়ই বিচিত্র। জীবনে অশেষ দুঃখ-নির্যাতন ভোগ করিয়া তিনি একদিন মনে মনে স্থির করিলেন,

> "সকল লোকে যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, আমি সে দ্বার দিয়া বাহির হইব না। আমি মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়া (অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া) বাহির হই (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করি)।"

এই কথা মনে উদিত হইবামাত্র তাঁহার অন্তর্যামী ইন্দ্র বলিলেন,

> "ঋষি, তুমি যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করিতেছ· না, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ বিধাতৃবিহিত জন্মলাভের পথ। যত মনুষ্য স্বর্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন, সকলকেই এই দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইয়াছে। এখনও তোমার অবয়ব সকল পূর্ণ হয় নাই, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ধিত হইলে তুমিও এই পথেই ভূমিষ্ঠ হইবে। বিদীর্ণ হইয়া

---

* এই পৃষ্ঠার ও পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিগুলি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের অনুবাদ।

বাহির হইব বলিয়া যে পথের চিন্তা করিতেছ, এই পথের অনুসরণ করিয়া তোমার মাতার (দেহের) পতন সাধন করিও না। উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির করিলে কি সন্তান বাঁচে?"

বামদেবের চৈতন্য হইল। তিনি দুঃখ দারিদ্র্য যন্ত্রণার মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই দৈহিক মর্ত্যজীবনের কঠোরতার মধ্যে এই পরম সত্য উপলব্ধি করিলেন যে, "যেমন গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে শিশুর অবয়ব পুষ্টি হয়, তেমনিই সাংসারিক ক্লেশপুঞ্জের মধ্যে মানুষের আত্মা দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া স্বর্গে জন্মলাভের উপযুক্ত হয়।" এই মহাজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষি বামদেব ভবিষ্যতের মানবসমাজের জন্য যে আশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন, চারি সহস্র বৎসরের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া তাহা আজিও আমাদের বরাভয় দান করিতেছে—

"আমি উদরান্নের অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি, দেবতার উপাসনা করিয়া ধনলাভ করিতে পারি নাই। প্রাণসমা পত্নীকে জনসমাজে লাঘব প্রাপ্ত হইতে দেখিলাম। (সে যাহা হউক) প্রভু পরমেশ্বর শ্যেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে আমাকে মধু আনিয়া দিয়াছেন।"—৪।১৮।১৩

জড়বিজ্ঞানও আজ উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়া জড়ত্বের জটিলতা ত্যাগ করিয়া সেই মধু-সন্ধানী হইতেছে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ইহাই সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সংবাদ।

প্রথম সংসার পত্তনে যে বন্ধু সহসা আবির্ভূত হইয়া নীরবে আমার সঙ্গ লইয়াছিল, আমার জীবনের দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা সেই কিরণচন্দ্র দত্তকে লইয়া। তখন বাঁকুড়া হস্টেলে থাকি, আই. এ., আই. এস-সি.র টেস্ট পরীক্ষা আসন্ন। সকলেই পরীক্ষা-প্রস্তুতির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। কিরণ একটু বেশি রকম। সে প্রায় দিবারাত্রি বইয়ে-মুখে বসিয়া থাকে, উচ্চৈঃস্বরে লজিক অথবা ইংরেজী পাঠ্য মেকলের 'হিস্ট্রি অব ইংলণ্ড' প্রথম ভাগ

আওড়ায়। পাঠে অতি-নিষ্ঠার জন্য সে আমাদের হিংসা ও পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিল। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠিক পূর্বে এইভাবে পড়িতে পড়িতে সে হঠাৎ গোঁ-গোঁ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল। এক নাগাড়ে সাত দিন মুহূর্তের জন্য তাহার জ্ঞান ফিরিল না। হস্টেলের ডাক্তার, শহরের সেরা ডাক্তার সকলেই পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন, আমরা কয়েকজন—কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিবারাত্র পালা করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলাম। পড়াশুনায় আমার একেবারেই মন ছিল না। আমার ভালই লাগিল এবং এই সেবাদলের নেতৃত্বভার আমিই গ্রহণ করিলাম। অসুখের গোড়ায় রোগীর কাছে বসিয়া আমরা শুধু "ওয়াচ" বা পর্যবেক্ষণ করিতাম, সম্পূর্ণ অজ্ঞান রোগীকে লইয়া আর কিছু করিবার ছিল না। দ্বিতীয় দিনে অজ্ঞান অবস্থাতেই কিরণের মুখে কথার খই ফুটিতে লাগিল। শুরু হইল মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া। বইটির প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত সে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া গেল। বইটি আমারও পাঠ্য, সুতরাং কিরণের কেরামতি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। হলফ করিয়া বলিতে পারি, সজ্ঞানে কিরণ বইটির দশ লাইনও একসঙ্গে মুখস্থ বলিতে পারিত না। ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সে কোথায় পাইল। বেশিক্ষণ ভাবিবার সুযোগ মিলিল না। কিরণ আমাদের আরও চমকিত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত জীবন-নাট্যের হুবহু পুনরভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। অর্থাৎ সুদূর শৈশব হইতে আধুনিকতম বর্তমান পর্যন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছে সেগুলিতে তাহার নিজের ভূমিকা সে নিজেই যথাযথ পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল, ভাবভঙ্গি কণ্ঠের উঁচুনীচু পরদা সমেত। অনেকগুলি ঘটনায় আমরাও জড়িত ছিলাম, মনে মনে মিলাইয়া দেখিলাম এক চুল এদিক ওদিক হইতেছে না। কিরণ বাল্য ও শৈশব মেমারিতে

তাহার ভগিনীপতির নিকট কাটাইয়াছিল, আমাদের সহপাঠী নিতাই দাঁ সেখানে তাহার সঙ্গী ও সহপাঠী ছিল। মেমারির ঘটনার নিখুঁতত্বে নিতাই সাক্ষ্য দিল। এমন সব গূঢ় গোপনীয় কথাবার্তাও রোগী বলিতে লাগিল যে, অন্তরঙ্গ দুই-তিন জন ছাড়া আর কাহাকেও তাহার কাছে রাখা সমীচীন বোধ করিলাম না। কথাবার্তা অবশ্য কেবল তাহার একলার। যেন টেলিফোনের এক দিকের কথাই আমরা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। যাহা ঘটিয়াছিল অর্থাৎ যে যে শব্দ কিরণ যেভাবে প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল পুনরাবৃত্তিতে তাহার কোথাও এতটুকু ভুল হইল না। মনে হইল, যেন কেহ কিরণের জীবন-নাট্য রচনা করিয়া তাহার অংশ তাহাকে "পার্টে"র মত লিখিয়া দিয়াছিল, সেই লেখাটি হাতে পাইয়া সে আবার তাহা অভিনয়োপযোগী স্বেদকম্পসহকারে পাঠ করিয়া চলিয়াছে, কমা-সেমিকোলোনেরও কোথাও অদলবদল হইতেছে না। আমাদের জ্ঞাত ঘটনার সহিত মিলাইয়া লইয়া এই উক্তি আমি জোরের সঙ্গে করিতেছি। ব্যাপার দেখিয়া আমরা দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। কিরণের তদানীন্তন অভিভাবক তাহার ভগিনীপতি শিববাবুকে তার করিলাম। কিন্তু রোগীর দায়িত্ব আমাদের হাতেই রহিল।

বাঁকুড়ার কোনও ডাক্তার কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। পরম্পরায় সংবাদ পাওয়া গেল, মেজর বিয়ানি নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ তুর্কী ডাক্তারকে যুদ্ধকালে বাঁকুড়ায় "ইনটার্ন্‌ড্‌" রাখা হইয়াছে, তিনি রেললাইনের ওপারে একটি গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় আছেন। আমরা একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া লইয়া আসিলাম। তিনি আসিয়াই অজ্ঞান রোগীকে আকণ্ঠ গরম জলে ডুবাইয়া মাথায় বরফ প্রয়োগ করিতে করিতে জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিরণ তাহার কিছুই জানে না। সে সুখনিদ্রা হইতে

জাগরিত হইয়াই প্রথম কথা বলিল, আমার বই। তাহাকে বই হাতে দিয়া আশ্বস্ত করিলাম।

কিন্তু অনন্ত জীবনের যে আশ্বাস সে আমাকে দিল, তাহার তুলনা হয় না। তুর্কী ডাক্তারকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি সংক্ষেপে জবাব দিয়াছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক-কোটরে সমস্ত জ্ঞানই সঞ্চিত থাকে, কোটর-দ্বার সকলের পক্ষেই চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়, কাহারও কাহারও পক্ষে যদি পুনরায় খোলে তখনই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

জড়বাদী ডাক্তারের এই জবাবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই। ভারতীয় যোগ সম্পর্কে দেশী ও বিলাত অনেক বই পড়িয়া ঘটনাটির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অতীতস্মর হইতে পারে, কিরণ তাহার প্রমাণ। মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করিলে শুধু অতীতস্মর নয়, জাতিস্মরও হইতে পারে। জন্মজন্মান্তরে সে কি ছিল, কি করিয়াছে সে তাহা হুবহু স্মরণ করিতে পারে, অনেকে স্মরণ করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কোনও কোটরে নয়, কারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সে কোটরও ধ্বংস হয়, আত্মার সঙ্গেই এই জন্মান্তর-স্মৃতি জড়িত থাকে, যোগবলে বলীয়ান মানুষ অথবা ভাগ্যবান অবতারকল্প পুরুষ সেই স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন। কিরণের ঘটনায় এই "অলৌকিকে"র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি, ইহা জড়বিজ্ঞান বা ডাক্তারী শাস্ত্রের আয়ত্তে নয়।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মা ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিলেন। মায়ের কাছে বসিয়াই "হসন্ত তরফদার" ব্যঙ্গচিত্রটি রচনা করিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ইচ্ছা ছিল, আরও কিছুদিন মায়ের কাছে কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিব। কিন্তু অক্টোবর মাসের শেষ তারিখে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পাইলাম। চিঠিটি ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বভাব ও স্বাভাবিক ভঙ্গির পরিচয় আছে বলিয়া এখানে পুনর্মুদ্রিত করিলাম—

"15 Rammohan Roy Road
Calcutta 29. 10. 25

My dear Sajani,

I am very sorry to hear about your mother's condition. I shall do the needful. As to your scribbling I have not yet received anything. I shall do what I can with " " [হসন্ত] when I can lay my hands on it. Kalida [Kalidas Nag] has gone to Gidney in Chhota Nagpur to keep company with the wild animals there. When he gets back (about 1. 11. 25) I shall send you all about Karl Spitteler. I am going to be branded on the 23rd Nov. Try to come before that. I have got your Vol. of Kalidas.

Yours affly
Khududa"

এই সময়ে আমি ডক্টর কালিদাস নাগের সাহায্যে রমাঁ্যা রলাঁ্যা, কার্ল স্পিট্‌লার প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিক ও সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তদের সম্বন্ধে 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম, রলাঁ্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজী প্রশস্তিরও (রলাঁ্যার ষষ্টিতম জন্মদিবসে প্রদত্ত) অনুবাদ করিয়াছিলাম, অনুবাদকের নাম দিই নাই। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমার অনুবাদটিকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হিসাবে তাঁহার জীবনীভুক্ত করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, ইহাতে আমি গৌরব বোধ করিয়াছি। ক্ষুদুদার পত্রে মনস্বী কার্ল স্পিট্‌লার সম্পর্কিত উপকরণ আমার নিকট প্রেরণের কথা আছে। আমি ততদিন পর্যন্ত দিনাজপুরে অপেক্ষা করিলাম না, নবেম্বরের গোড়াতেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। এবং আসিয়াই "কার্ল স্পিট্‌লার—বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা" লিখিয়া ফেলিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অগ্রহায়ণের (১৩৩২) 'প্রবাসী'তে সেই তেরো পাতার সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি বাহির হইল। কয়েক-দিনের মধ্যেই ক্ষুদুদার বিবাহ; আমাদের 'শনিবারের চিঠি'র দলের সেই প্রথম আনন্দোৎসব। ইতিপূর্বে কালিদাসদার বিবাহে ক্ষুদুদা,

হেমন্ত ও আমি দীর্ঘ দীর্ঘ উপহার-কবিতা লিখিয়া কম্পোজ করিয়া লম্বা লম্বা প্রুফের কাগজে তুলিয়া আলপিন আঁটিয়া বিলি করিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন অভিনব বিবাহোপহার আর কুত্রাপি বিলি হয় নাই। শ্বশুরদা গোড়া হইতেই সাবধান হইলেন। তিনিই ছাপাখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, খিড়কিপথে আমাদের অভিযান সহজেই রোধ করিতে পারিলেন। এই বিবাহে আমি সর্বপ্রথম সামাজিক ব্যাপারে টেবিল-চেয়ার ও খাওয়ার টেবিলে নিউজ-পেপাররোলের ব্যবহার দেখিয়াছিলাম।

শ্বশুরালয়ে অবস্থান আমার স্বাধীনতা সাংঘাতিক ভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। মনমরা হইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে বৈঠকখানায় আমারই হস্টেল-মেস-জীবনের দীর্ঘকালের শয্যাসঙ্গী ছারপোকা-শোণিত-লাঞ্ছিত ফসিলায়িত তুলার তোষকটিকে বালিশ করিয়া চিত হইয়া কড়িকাঠ গনিতেছিলাম, সহসা সদর দরজায় তিন জোড়া পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। হল্লা করিতে করিতে কিরণ ও রতন (দিনাজপুরের বন্ধু) প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমার আই. এস-সি.-সহপাঠী বাঁকুড়া হস্টেলের বন্ধু গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—তাহারা ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে একটি বাসা ঠিক করিয়া এক মাসের ভাড়া আগাম জমা দিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেখানে স্থানান্তরিত করিতে আসিয়াছে। শ্বশুর মহাশয় গৃহে ছিলেন না, হাঁ-না কি বলিব ভাবিতেছি, কিরণ আমার সেই বহুমূল্যবান তোষকটিকে কুক্ষিগত করিয়া হুকুম দিল, আয়। আমি কপালকুণ্ডলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নবকুমারের মত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। সেই দিনই আমার অসার সংসারে সার শ্বশুর-মন্দিরবাস খতম হইল।

সাহিত্যচর্চার দিক দিয়া ভালই হইল সন্দেহ নাই। তিন বোহেমিয়ানে মিলিয়া ১।১ই ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের মধ্য ব্লকের দ্বিতল ফ্ল্যাটে রীতিমত ল্যাটিন কোয়ার্টার ফাঁদিয়া বসিলাম,

গৌরীশঙ্কর ফাউ। রতন পিতৃদত্ত মাসোহারার সাহায্যে এবং কিরণ জমিদারির আয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ওকালতির তকমা লইবে, বাহিরে তাহাই প্রকাশ থাকিল—কিন্তু আসলে তাহারা অল্প মূলধনে কলিকাতা শহরে বৃহৎ ব্যবসায় ফাঁদিবারই মতলব করিয়াছিল। রতন বোম্বাইয়ের সিডেন্‌হাম কলেজ ফেরতা, কিরণের বুদ্ধি সর্ববিষয়েই প্রখর ও চৌকস। আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ততদিনে একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, আমার কাজ-কারবার সকলই মা-সরস্বতীর এলাকাভুক্ত হইয়াছে। তিন বন্ধুর তিনখানি ঘর, রান্নাঘর স্বতন্ত্র, মাসিক ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা। যে সামান্য আসবাব আমার ছিল তাহাই সকলের আসবাব। দীর্ঘকাল মাটিতে খবরের কাগজ বিছাইয়া শয়ন করিতাম, একটিমাত্র মগে শৌচক্রিয়া ও রন্ধনক্রিয়া চলিত, তিনখানি ভাঙা সান্‌কি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আহার করিতাম। এই অবস্থায় গৌরীশঙ্করকে লইয়া বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক। সে বিবাহিত, বাড়িতে ঝগড়া করিয়া ভাগ্যান্বেষণে পথে বাহির হইয়াছে—একটা হেস্তনেস্ত না করিয়া ফিরিবে না। আমাদের আড্ডাটাই তখন পথ অথবা পান্থশালা। গৌরীকে রান্নাঘর আশ্রয় করিতে হইল। সে পাড়াগাঁয়ের ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমাদের হেঁসেলের ভার সম্পূর্ণ তাহার উপর বর্তাইল। সে লেখাপড়ায় ভাল ছেলে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় জিলা-স্কলারসিপ পাইয়াছিল, আই. এস-সি.তেও ফার্স্ট ডিভিশনে উপরের দিকে নাম ছিল; কিন্তু সহায়সম্পদহীন অবস্থায় আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমরা শুধু তাহারই আশ্রয় নয়, পরে আরও কয়েকজন ভাগ্যান্বেষীর অবলম্বন হইয়াছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত রীতিমত একটা "এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো" খুলিয়া বসিয়াছিলাম। বেকার গৌরীশঙ্করকে ক্রমশ আরামপ্রিয় হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই বৎসরেই বড়দিনের দিন আমরা এই বলিয়া বাড়ি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম, একটা যাহা হউক কিছু চাকরি না জুটাইয়া

সে ফিরিতে পারিবে না। সে প্রথমে হগ্ সাহেবের বাজারে কুলিগিরির চেষ্টায় লাইসেন্স অভাবে বিফলমনোরথ হইয়া খিদিরপুর অঞ্চলে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা-নির্মাণক্ষেত্রে ইট বহিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চায়; সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ স্টোর্সের বাড়ি, একজন খাস বিলাতী সাহেব তদারক করিতেছিলেন। আসল গৌরীশঙ্করকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই, তিনি সেই দিনই তাঁহার সহকারী হিসাবরক্ষকরূপে তাহাকে বহাল করিয়াছিলেন। গৌরী যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া আজ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বড়বাবুর পদ অলঙ্কৃত করিতেছে। গৌরীর গৌরব আমাদের হিসাবে সর্বপ্রথম জমা, পরে আরও অনেক আছে। বর্তমান কালেও বেকার থাকিতে থাকিতে যাঁহাদের আশাভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহারা গৌরীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতে পারিবেন।

ডিসেম্বর মাসে নূতন সংসার পাতিয়াছিলাম। ওই মাসেই কানপুরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন, সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী। রামানন্দবাবু মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র জন্য সরোজিনী নাইডুর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিবার আদেশ দিলেন। আমি অনন্যচিন্ত হইয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটি জীবনী রচনা করিলাম, তাঁহার কয়েকটি কবিতারও কবিতায় অনুবাদ দিলাম। নূতন বাড়িতে ইহাই আমার প্রথম সাহিত্যকীর্তি। পরে স্বয়ং সরোজিনী দেবীকে সেই প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে হইয়াছিল। তিনি কবিতা-অনুবাদের বিশেষ তারিফ করিয়া স্বহস্তলিখিত একটি ইংরেজী কবিতা উপহার দিয়া আমাকে পুরস্কৃত করেন। আমার সাহিত্যিক-জীবনে ইহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

নূতন এজমালি বাড়ি আমাকে যেমন নানা ভাবে অসুবিধায় ফেলিয়াছিল, তেমনই ব্যাপক অবিচ্ছিন্ন আড্ডার মধ্যে 'শনিবারের চিঠি'-পুনঃপ্রবর্তনের উৎসাহ ও উপকরণ এখানেই সংগৃহীত

সপ্তদশ তরঙ্গ

পুনর্জীবন

বর্ধমান-রাজের এলাকায় কিরণের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল। সেকালে ইংরেজ-রাজত্বে সূর্যাস্ত হইত না, কিন্তু বর্ধমান-মহারাজের রাজত্বে খাজনা দাখিলের দিন সূর্যাস্ত হইলে অপারগ হতভাগ্য পত্তনিদারের জমি লাটে উঠিত। সামনে চোত্-কিস্তি। কিরণের হাজার পাঁচ-ছয় টাকা খাজনা চৈত্রের শেষ তারিখে জমা দিবার কথা; কোনও রকমে বত্রিশ শো টাকা জোগাড় হইয়াছিল। ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল ১৯২৬) গুড ফ্রাইডের দিন ওই টাকা লইয়া কিরণ দেশে যাইতেছিল, গুণ্ডা-পকেটমারের আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমি তাহার সঙ্গে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাইতেছিলাম হ্যারিসন রোডের ট্রামে। সময় বৈকাল। কলেজ স্ট্রীট জংশনে ওয়াই. এম. সি. এ.র কাছাকাছি একটা হট্টগোল শুনিলাম; দোকানপাট সশব্দে বন্ধ হইতেছে। হাওড়ার দিক হইতে একখানা ট্রাম আসিতে দেখা গেল, জানালার খড়খড়ি বন্ধ কিন্তু সর্বাঙ্গে ইষ্টকাঘাতের চিহ্ন। সর্বত্র একটা ত্রাস ও আতঙ্কের ভাব। আমাদের ট্রাম হইতে অনেক যাত্রী নিঃশব্দে নামিয়া গেল, জানালার খড়খড়িও তুলিয়া দেওয়া হইল। ট্রাম-চালক ইতস্তত করিতেছিল, মোড়ের পুলিস তাহাকে আশ্বাস দিয়া অগ্রসর হইতে বলিল, চাহিয়া দেখিলাম—আমরা সাকুল্যে চারজন প্যাসেঞ্জার। একটু আগাইয়া তদানীন্তন হ্যালিডে স্ট্রীট অধুনা সেন্ট্রাল অ্যাভে-নিউয়ের জংশনে পৌঁছিয়াই স্থানীয় পরিবেশদৃষ্টে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সুবিখ্যাত দীনু মিঞার মসজিদের সম্মুখে রক্তারক্তি কাণ্ড,—আস্ত, ভাঙা ও গুঁড়া ইষ্টকখণ্ডে চারিদিক আকীর্ণ। মাথাফাটা, নাকভাঙা লোকেদের রিক্‌শাযোগে অথবা হাঁটাইয়া হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে।

পূর্বদিকে পেল্লায় পেল্লায় জোয়ান মুসলমান, পশ্চিমে ততোধিক ষণ্ডা ভোজপুরীর দল, আহত অবস্থাতেও খাঁচায় বদ্ধ সদ্য-ধৃত ব্যাঘ্রের মত ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জন করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপর্ব তখন শেষ, স্ত্রীপর্বে ক্রন্দন-আস্ফালন চলিতেছে। পানের দোকান ছাড়া সমস্ত বাড়িঘর রুদ্ধদ্বার, একটা ভয়াবহ থমথমে ভাব আসন্ন নব সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে। ব্যাপার কি? এ পারের কুহু এবং ও পারের কেকাধ্বনি শ্রবণে বেপথু অন্তরে এইটুকু মাত্র বোধ জন্মিল যে, দীনু মিঞার পবিত্র মসজিদে ধার্মিক মুসলমানেরা একান্তে আল্লাভজনা করিতেছিলেন, বাদ্যভাণ্ডসহকারে একটি বিধর্মীদের শোভাযাত্রা তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করাতে নিমেষমধ্যে ধর্মস্থান আল্লার নামে কেল্লায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং অবিশ্রান্ত ইষ্টক-বোমায় শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া ধার্মিকেরা খোদার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি ও প্রতিরোধশক্তি পথে ঘাটে অনর্থের সৃষ্টি করিতে ছাড়ে নাই। ট্রাম অগ্রসর হইয়া অনাবিল বিধর্মী এলাকায় প্রবেশ করিলে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু মনে মনে ভয় রহিয়া গেল যে মামলা এখানেই থামিবে না। পোল পার হইয়া স্টেশনে পৌঁছিতেই কিরণ বলিল, দুর্ভাগ্য আমার নিত্যসঙ্গী, পথে কি হইবে বলা যায় না। টাকাগুলা তোর কাছেই থাক্‌, বাকি টাকা যোগাড় করিয়া আসিয়া আমি এখানকার কাছারিতেই জমা দিব।

কিরণ তো "গুডবাই" করিয়া চলিয়া গেল। আমি সেই পবিত্র গুড ফ্রাইডের দিন ট্যাঁকে দুই শতাধিক তিন হাজার টাকা লইয়া ওয়ালফোর্ড কোম্পানির বিপুলকায় বাসে চাপিয়া স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া এসপ্ল্যানেডে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন সাংঘাতিক অবস্থা। চিৎপুর লাইনের একখানা সম্পূর্ণ খালি ট্রাম একজন হিন্দু ড্রাইভার কাঁপিতে কাঁপিতে লইয়া আসিয়াছে, কন্‌ডাক্টারকে মারিয়া দুমড়াইয়া একটি বেঞ্চের তলায় গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, ফালতু ভিড় অকারণ জটলা করিতেছে, কেহ বলিতেছে—লোকটা বাঁচিয়া আছে, কেহ বলিতেছে—মরিয়াছে। সম্মুখেই কার-মহলানবীশের দোকান, আমি ছুটিয়া গিয়া বুলা মহলানবীশকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করিতে বলিলাম। অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া মুমূর্ষু লোকটাকে হাসপাতালে লইয়া গেল। তাহার পর আর ট্রাম আসিতে দেখা গেল না, কিন্তু রক্তাক্তকলেবর কয়েকজন লোককে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে দেখিলাম। বুঝিলাম, নাখোদা মসজিদ অঞ্চলে হাঙ্গামা থামে নাই। ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে কি করি, কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে ম্যাডান থিয়েটার অ্যাণ্ড প্যালেস অব ভ্যারাইটিজে সন্ধ্যার শোয়ে যীশুখ্রীষ্টের জীবনী দেখিতে ঢুকিলাম; প্রেম ও শান্তির দূতের জীবনালেখ্য দেখিয়া উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে যদি শান্তি পাই। ইন্‌টারভাল হইয়া গেল, ছবিও প্রায় সমাপ্তির দিকে, অকস্মাৎ বাহিরে অতি নিকটেই "মার্-মার্ কাট্-কাট্ আল্লাহো আকবর" রব উঠিল। বিধর্মীরা সেদিন পর্যন্ত "বন্দে মাতরম্" বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট আওয়াজকে অবলম্বন করিতে পারে নাই। কয়েকটা ঢিলজাতীয় পদার্থ প্যালেস অব ভ্যারাইটিজের টিনের চালে বজ্রপাতের মহড়া দিল, ছবিহীন অন্ধকারে দর্শকেরা সকলেই সভয়ে ও শশব্যস্তে পায়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরুপায়ভাবে "আলো আলো" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে অনেক টাকা, আমি ভয়ে আধমরা হইয়া গেলাম। হল্লা বেশিদূর অগ্রসর হইল না। ছবি শেষ হইল। আমিও এ-গলি ও-গলি করিয়া কোনক্রমে পা বাঁচাইয়া ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের বাসায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম।

পরদিন প্রাতে সংবাদপত্র খুলিয়া চক্ষুস্থির! বুঝিতে পারিলাম, আগুন নিভে নাই, সারা রাত্রি ধিকিধিকি করিয়া কলিকাতা শহর জুড়িয়া জ্বলিয়াছে, হতাহতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। দীমু

মিঞার মসজিদ যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহাকে গ্যাঁড়াতলা বলে, আমরা নাম দিলাম—ব্যাট্‌ল অব গ্যাঁড়াতলা। তিন দিন চলিয়া ব্যাট্‌ল থামিল; কিন্তু তখন কে জানিত ইহা ব্যাট্‌ল নয়—ওয়ার, এবং দীর্ঘ বিশ বৎসর চলিয়া ভারত-বিভাগে ইহার পরিসমাপ্তি। দুই দিন যাইতে না যাইতে সেকেণ্ড ব্যাট্‌ল অব গ্যাঁড়াতলাও লাগিয়া গেল। এই কালেই বিখ্যাত 'ছোলতানে'র জন্ম হইল।

পথ-ঘাট নির্জন, ট্রাম-বাসও ক্বচিৎ চলে। এই অবস্থায় আমাকে প্রত্যহ ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন হইতে সারকুলার রোড ধরিয়া মেছুয়াবাজার স্ট্রীট পার হইয়া ৯১নং আপার সারকুলার রোডে 'প্রবাসী' আপিসে যাইতে হইত। অধিকাংশ দিনই ট্রাম-বাস মিলিত না, পদব্রজে যাইতাম। একদিন মেছুয়াবাজারে চৌরাস্তার ঠিক দক্ষিণে অতর্কিতভাবে একটা নিদারুণ হাল্লার মাঝখানে পড়িয়া গেলাম। সম্মুখেই "শান্তি-কুটীরে" মোটর-বাসের কারবারী সোভান সাহেব থাকিতেন। তিনি বারান্দা হইতে দেখিয়া আমার বিপদ বুঝিতে পারিলেন এবং ছুটিয়া আসিয়া আমাকে টানিয়া নিজের কম্পাউণ্ডের ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না, সেই দিন পরিচয় হইল। তাঁহাকে আমি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। মানবীয় সহৃদয়তার বশে তিনি সেদিন আমাকে রক্ষা না করিলে এই আত্মকাহিনী লিখিবার অবকাশ আমার মিলিত না। সেদিন পর্যন্ত আমি কোমরে জামার তলায় একটি পিস্তলাকার ভারী লৌহদণ্ড লইয়া চলাফেরা করিতাম। তখনও তাহা কোমরেই ছিল, অধিকন্তু ছিল কাছায় বাঁধা কিরণের বত্রিশ শো টাকা। সোভান সাহেবের ব্যবহারে সাধারণ ভাবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল, লৌহদণ্ডটি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া কয়লা-ভাঙার কাজে লাগাইলাম। টাকাটাও সেদিন অশোক চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় রাখিয়া দিলাম।

আপিস যাতায়াতের পথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা হইতেই এই দাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়াছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা লিখিয়াও ফেলিলাম। সেগুলি প্রকাশ করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। 'প্রবাসী'তে কাজ করি, কিন্তু 'প্রবাসী' সে সব ছাপিবে না। একমাত্র অবলম্বন আমাদের নিজস্ব 'শনিবারের চিঠি' তখন মৃত। তাহাকে পুনর্জীবন দান করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিলাম না। তাহারই আয়োজন করিতেছি, শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে ডাকিলেন, প্রশ্ন করিলেন, 'শনিবারের চিঠি'র পুনঃপ্রকাশের কোনও মতলব আমাদের আছে কি না। মনে হইল, তিনি সর্বজ্ঞ, আমাদের মনের কথা টের পাইয়াছেন। হাতে স্বর্গ পাইলাম। বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ, একটা দাঙ্গা-সংখ্যা বাহির করিব মনে করিতেছি। তিনি বলিলেন, মারামারি সম্বন্ধে লেখা দিও, কিন্তু সংখ্যাটির নাম দিও—জুবিলী-সংখ্যা। আমি কিছু লেখা দিব।

জুবিলী-সংখ্যা নামের মানে তখন বুঝি নাই, তবু খোদ কর্তার সমর্থন, উৎসাহভরে লাগিয়া গেলাম। দুই দিন পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দুইটি বেনামী রচনা আমার হাতে আসিল। আবরণী-চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "সজনীকান্ত, অসুস্থ শরীরে এইগুলি লিখিলাম। তোমাদের চলে কি না ভাল করিয়া দেখিয়া তবে ছাপিতে দিবে।" সোল্লাসে ছাপিতে দিলাম। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' বন্ধ হওয়ার ঠিক পনের মাস ছয় দিন পরে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুনর্জীবিত অসাময়িক 'শনিবারের চিঠি'র "জুবিলী-সংখ্যা" মহাসমারোহে বাহির হইল। ১৯২৬ সনের দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কারণ এই যে, ইহাই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রথমটি দাঙ্গা-সংক্রান্ত; সার্ আবদার রহিম সাহেব তখন ইংরেজের মসনদে প্রধান অমাত্য। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিলেন, "পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল-ধ্বংস-ফতোয়া"। এই রচনা কখনই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে না; কিন্তু সংযত সরস ব্যঙ্গাত্মক রচনার নমুনা হিসাবে লেখাটি সর্বসাধারণের দরবারে আর একবার দাখিল করা উচিত বিবেচনায় এখানে খানিকটা পুনর্মুদ্রিত করিলাম—

"আরবদেশে মেদিনা নামে একটি শহর আছে। নগরকে ফার্সীতে শহর ও সংস্কৃতে পুর বলে। এই জন্য কাফেররা মেদিনা শহরকে বাংলা দেশের মেদিনীপুর মনে করে। পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের জন্ম হয় বাস্তবিক আরবদেশের মেদিনা শহরে, কিন্তু কাফেররা ভুল করিয়া বলে তিনি পয়দা হন মেদিনীপুরে। আরবদেশে জন্ম বলিয়া তিনি আক্ছার আরবী জবানেই গুফ্‌ত্‌গু করেন, কিন্তু কাফেররা বুঝিতে না পারিলে বাংলা লব্‌জ্‌ও ইস্ত্‌মাল করেন।

তাঁহার বাড়ীর নিকট একটি মস্‌জিদ আছে। তাহার মোল্লা ছাহেব একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জনাব, মস্‌জিদের ছাম্‌নে কেহ গাওনা বাজনা গোলমাল আওয়াজ করিলে কি করিব?' পীর হালিম বলিলেন, 'তাড়াইয়া দিও।' মোল্লা ছাহেব ফের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী, মোটর ভেঁপুর আওয়াজ হইলে কি করিব?' পীর তাঁবেদার মনের কথা গোপন রাখিয়া বলিলেন, 'ওগুলার জান্ নাই, উহারা জানোয়ার নহে। উহাদের আওয়াজ মস্‌জিদে শুনা গেলে গুনাহ্‌ হয় না, যাহাকে কাফেররা পাপ বলে।'

মোল্লা ছাহেব ফের পুছিলেন, 'মানুষের ত জান্ আছে। মানুষে মস্‌জিদের ছামনে গোলমাল করিলে মারধর করিয়া তাড়াইব কি?' পীর ছাহেব আবার আসল কারণ ছিপাইয়া বলিলেন, 'মানুষের জান্ আছে বটে, কিন্তু মানুষ জানোয়ার নহে। জানোয়ারে আওয়াজ করিলে যেমন করিয়া হউক তাড়াইয়া দিও।'

তাহার পরদিন মোল্লা ছাহেব ফের হাজির হইয়া বলিলেন, 'মস্‌জিদের ছাম্‌নে কাকগুলা বড় আওয়াজ করে, ছাম্‌নের বাগানে কোকিলগুলাও কুহু কুহু করে। কি করিব?'

তাঁবেদার হালিম ছাহেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'কাক্‌ ও কোকিল কাফের কি না তাহা আগে ঠিক কর। তাহারা কোন্‌ জবানে কথা বলে?' মোল্লা ছাহেব পণ্ডিত দীনদয়াল শর্মা হইতে মৌলানা শৌকত আলী পর্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কাক-কোকিলের ভাষার কোন সন্ধান পাইলেন না। তাহা হালিম ছাহেবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন উপায় কি?' পীর ছাহেব বলিলেন, 'কাক ও কোকিল আমাদের খানা খায় কি?' মোল্লা ছাহেব বলিলেন, 'কাককে আমাদের গোস্তের হাড় ও টুক্‌রা ঠোকরাইতে দেখিয়াছি বটে, কোকিলকে দেখি নাই।' তখন পীর ছাহেব আঁধারে আলোক পাইয়া খুসী হইয়া বলিলেন, 'কাক কাফের নহে, কোকিল কাফের, কোকিল কুহু কুহু করিলেই মারিবে, কাককে কিছু বলিও না।' মোল্লা ছাহেব বলিলেন, 'কোকিলকে ত প্রায় দেখাই যায় না, আওয়াজই শোনা যায়। মারিব কেমন করিয়া?' পীর তাঁবেদার হালিমের তখন হঠাৎ মনে পড়িল কলেজে পড়িয়াছিলেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন :—

'O Cuckoo! Shall I call thee Bird
Or but a wandering Voice...'

তিনি বলিলেন, 'কোকিল দেখিতে নাই বা পাইলে? ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, কোকিল চিড়িয়া নহে, সেরেফ একটা মুসাফির-আওয়াজ মাত্র। যেদিক হইতে কুহু কুহু ডাক শোনা যাইবে সেই দিকে আল্লার নাম করিয়া ঢিল ছুঁড়িবে এবং তাহার পর গিয়া দেখিবে কোন জানোয়ার মরিল কি না।...'"

রামানন্দবাবুর দ্বিতীয় লেখাটির শিরোনামা "'শনিবারের চিঠি'র জুবিলী সংখ্যা"। আরম্ভটি এই—

"উনপঞ্চাশ বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে। সেইজন্য আমরা উহার এই জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি।"

এই নামকরণের আসল রহস্যটি একটু পরেই আছে এই শিরোনামায়: "প্রবাসী-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা"—

"সর্বসাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, 'ভারতী'র সম্পাদিকা পণ্ডিতানী সরলা দেবী চৌধুরাণী 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা হন। সেইজন্যই তিনি 'ভারতী'র ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত সম্পাদককে শুধু 'রামানন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ষীয়সীদের দুটি সদ্‌গুণ আছে। এক নম্বর, তাঁহারা নিজেদের বয়স বাড়াইয়া বলেন, এই জন্য 'ভারতী'র পুনঃ পুনঃ পুনর্জন্মের মোট সময় যোগ করিলেও যদিচ উনপঞ্চাশ বৎসর হয়, তথাপি পঞ্চাশ পূর্ণ হইলে যে জুবিলী লোকে করে, তাহা 'ভারতী'র সম্পাদিকা প্রাপ্তে তু উনপঞ্চাশ বর্ষেই করিয়াছেন, এবং তাহাও উনপঞ্চাশের মধ্যে অনেক মাস বাদ পড়া সত্ত্বেও। বস্তুতঃ উনপঞ্চাশ সংখ্যাটার নানা সুপ্রভাব আছে।

দু নম্বর, বর্ষীয়সীরা নাতি-প্রনাতিদের বয়স কমাইয়া বলেন। যথা, 'ভারতী'র সম্পাদিকা দেবী-চৌধুরাণী মহোদয়া কেবল যে তাঁহার মাসতুতো নাতি 'প্রবাসী'-সম্পাদককে বালকের প্রাপ্য ডাকনাম দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন তাহা নহে, প্রনাতি 'প্রবাসী'র বয়স পূরা পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা অল্প বেশী হইলেও তাহা চব্বিশ বৎসর বলিয়াছেন।"

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ইহা তাহার একটি সদ্দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, উহার ফলে 'শনিবারের চিঠি' অসাময়িক ভাবে হইলেও পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। শুধু তাই নয়, এই বিচ্ছিন্ন সংখ্যাটিতেই বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার প্রথম সাহিত্যিক রূপ দিল 'শনিবারের চিঠি'। এই সকল রচনার অনেকগুলি কালের প্রবাহে হারাইয়া গেলেও ইহাদের কাজ নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় নাই। "মুসলমান" নামক আমার একটি পুস্তকাকারে অপুনর্মুদ্রিত দীর্ঘ কবিতা হইতে দুইটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি—

…মসজেদে নামাজ পাঠে ভেবেছ তুষিবে ভগবান
হৃতগর্ব নত মুসলমান?
প্রীতি নাই, প্রেম নাই, ধর্ম শুধু নররক্তপাতে?
যে বলে বলুক মোল্লা আল্লা তব খুশি নন তাতে।

মোল্লার রচিত শাস্ত্রে আপন বুদ্ধিরে বলি দিয়া
ধর্ম্মেরে জবাই করা—নররক্তে প্লাবিয়া দুনিয়া
আল্লা নাম নিয়া—
এই শিক্ষা দিতে নবী অবতীর্ণ হলেন ভূতলে,
শাস্ত্র এই বলে ?

পরধর্ম হিংসা করি নিজধর্ম ক'রো না সন্ধান,
পর-অসহিষ্ণু মুসলমান !
দেখ বিশ্ব ছুটিয়াছে জ্ঞানের বর্তিকা উচ্চে ধরি,
ধর্মভানে অতীতেরে কেহ নাই একান্ত আঁকড়ি ;
যে দেশে জন্মেছ সেই দেশের কল্যাণে মুক্তি তব,
যে ভাষা মায়ের ভাষা আনিবে তা জ্ঞান নব নব
অতুল বৈভব।
যে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে ফিরো না তাহারে স্কন্ধে টানি
প্রীতি-সূত্র মানি।...

দাঙ্গা বা জুবিলী সংখ্যা কলিকাতার সদ্য-লাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইল, এই প্রথম কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হইল। সুতরাং এক মাসের মধ্যেই পরবর্তী আষাঢ় (১৩৩৩) মাসেই আর একটি বিশেষ সংখ্যা—"বিরহ সংখ্যা" বাহির করিয়া ফেলিলাম। অতি-আধুনিক সাহিত্যের ন্যাকামি ও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ যৌন আবেদনের বিরুদ্ধে আমাদের সেই প্রথম সর্বোদয়-অভিযান, শুধু আমাদের নয়—প্রকাশ্যে সেই সর্বপ্রথম অভিযান। ইহারও ছয় মাস পরে পৌষ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীঅমল হোম "অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য" নামক নিবন্ধ পাঠ করেন।

'কল্লোল' তখনও উদগ্র হইয়া উঠে নাই, ১৩৩২ সালের শেষ পর্যন্ত তাহার কলধ্বনিই কানে বাজিতেছিল। তখন বাংলা-সাহিত্যে ক্রিমিনলজি-সাইকলজির নামে বিবিধ নূতনত্বের সম্পাদন করিয়া

আসর মাত করিয়া রাখিয়াছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; সেনগুপ্ত মহাশয়ই প্রধান। নূতন বৎসরের গোড়া হইতে জল-'কল্লোল' হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল। আমি "Orion বা কাল-পুরুষ" নামক একটি দীর্ঘ নীহারিকা-নাটক রচনা করিয়া বিরহ-সংখ্যায় শ্রীকেবলরাম গাজনদারের বেনামীতে প্রকাশ করিলাম। "অবতরণিকা"য় লিখিলাম —

…আমরা নূতন যুগের প্রবর্তন করিতে চাই। পুরাতনের দিন চলিয়া গিয়াছে, ক্রিমিনলজি ও সাইকো-এনালিসিসের শুষ্ক পাতায় যৌন সম্বন্ধীয় আধুনিক থিওরিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা সরস নাটকে তাহাদিগকে সজীব ভাবে জগতের সম্মুখে ধরিতে চাই।·· শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ও ঢাকা-প্রবাসের পর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের গুরু এবং কলিকাতার 'কল্লোল'-সম্প্রদায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শুভা', 'শাস্তি', 'পাপের ছাপ', 'ব্যবধান', 'দত্তগৃহিনী' প্রভৃতি পুস্তক ও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নষ্টচন্দ্র', 'হাইফেন' ও কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত ফোটো-চিত্র-সম্বলিত 'রূপের ফাঁদ' প্রভৃতি পুস্তকগুলির ভিতর দিয়া আমাদের সূক্ষ্ম প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে এবং 'কল্লোলে'র নব নব রূপ আমাদিগকে নব নব ভাবের আহার্য যোগাইতেছে। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে পাপ হইবে।

মানব যন্ত্রবিশেষ মাত্র নহে; দম দিয়া তৈলরূপ আহার্য জোগাইয়া দিলেই কল নির্বিবাদে চলিতে পারে; কিন্তু মানুষের হৃদয় বলিয়া আর একটি সূক্ষ্ম জগৎ আছে। সেখানে সে রচনা করে, সে গ্রহণ করে, সে বিলাইয়া দেয়। সে ভালবাসে, সে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়; সে বাঁচিতে চায়—সে নিঃশেষে মরিতে চায় না। সে ডোবে, সে ওঠে, সে কাঁদে, সে কাঁদায়; সেখানে সে চিরবুভুক্ষু। আর একটি বা একাধিক হৃদয়-জগৎকে সে গ্রাস করিতে চায় এবং একাধিক দেহকে সে ভোগ করিতে চায়। কিন্তু সে তাহা পারে না, সমাজ ও শাস্ত্র, লোকাচার ও লোকলজ্জা সঙীন উঁচা করিয়া বসিয়া আছে। হৃদয়কে পীড়া দেওয়াই

তাহাদের উদ্দেশ্য। কখনো কখনো এই সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙিয়া ফেলিয়া মানব-হৃদয় মহাসাগরের কল্লোল শুনিতে পায়—আমরা সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমরা এই বাঁধভাঙার কাহিনী লিপিবদ্ধ করি।

তথাকথিত অতি-আধুনিকতার বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের প্রথম ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ।

১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'কালি-কলম' বাহির হইতেছিল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র 'কল্লোলে'র দল ভাঙিয়া শ্রীমুরলীধর বসুর সঙ্গে যোগ দিয়া 'কালি-কলম' প্রকাশ করিয়াছিলেন, বরদা এজেন্সির শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী হন পরিবেশক। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র এই দুই জনই ছিলেন 'কল্লোল'-দলে সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টা ও শিল্পী, 'কল্লোলে'র হালচাল ও পরিবেশ তাঁহাদের শিল্পসাধনার আর অনুকূল ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সরিয়া পড়িলেন। বাকি যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা প্রধানত ঘষিতে-ঘষিতে-প্রস্তর-ক্ষয়-করার দল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের অনেকেই ঘষিতে ঘষিতে নিজেরাই ক্ষয় হইয়া গিয়াছেন। যে দুই-একজন টিঁকিয়া আছেন, তাঁহারা খুব সময়ে বুদ্ধি করিয়া ধর্মের ধাতুতে তলা বাঁধাইয়া ব্যক্তিগত দৌর্বল্য সারিয়া লইয়াছেন।

'কালি-কলম' শুরু হইতেই 'কল্লোল' অপেক্ষা মার্জিত ও ভদ্র রুচির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু প্রথম সংখ্যাতেই হাবিলদারী "কামকণ্টকব্রণ"-দুষ্টতার জন্য আমাদের আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল। রাধিকা যেমন সারা বৃন্দাবন কৃষ্ণময় দেখিতেন, হাবিলদার-কবি তেমনি সারা বনভূমি "সুরত-কেলি"ময় দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া "প্রলাপ" বকিয়াছিলেন—

"করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি।...
আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা।
হ'ল অশোক শিমুলে বন পুষ্পরজা।"

এতটা আমরা বরদাস্ত করিতে পারি নাই, 'কালি-কলমে'র সহিত আমাদের মোহিতলাল ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও। বিরহ-সংখ্যাতেই 'কালি-কলম'কেও শত্রু করিয়া ফেলিলাম।

অসাময়িক হইলেও আমি মনে মনে নিয়মিত মাসিকের মহড়া দিয়া চলিয়াছিলাম। জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ় বাহির করিলাম বটে, কিন্তু পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ হইতে আরও চার মাস লাগিল—কার্তিকে "ভোট-সংখ্যা"। বাংলা দেশে নূতন ইলেকশনের দামামা বাজিতেছে, চারিদিকে শুনিতেছি, "সবার উপরে ভোটই সত্য তাহার উপরে নাই।" চিত্তরঞ্জন গত, কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির তখন প্রবল প্রতাপ। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ভোট-ব্যাপারটাকেই নস্যাৎ করিয়া ভোট-সংখ্যা বাহির করিলাম, ছাপিলাম চার হাজার। দলে দলে দলাদলির জন্য চার হাজার কপিই গরম চানাচুরের মত বিকাইয়া গেল। আরও কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইল। অর্থাৎ ফণ্ডে টাকা জমিল। নিয়মিত মাসে মাসে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে আরও দশ মাস সময় লাগিল। এই কালেও আমি নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। রবি মৈত্র তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনিই আমাকে সঙ্গে করিয়া গোলদীঘির পাশে অবস্থিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আপিসে লইয়া গেলেন। 'আনন্দবাজারে'র সহিত 'শনিবারের চিঠি'র একটা যোগ স্থাপিত হইল এবং আর একটি বিচিত্র ঘটনাচক্রে পূর্ব-পরিচিত শরৎচন্দ্রের সহিতও ঘনিষ্ঠ হইয়া গেলাম।

অতি-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লইয়া একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম "কচি ও কাঁচা"; নিদারুণ ব্যঙ্গাত্মক আঘাত ইহাতে ছিল। বন্ধু ও পরিচিত সাহিত্যিক মহলে নাটকটি পড়া হইল। মোহিতলাল প্রমুখ অনেকেই খুব

তারিফ করিলেন। খ্যাতি শত্রুশিবিরেও পৌঁছিল। একদিন স্বয়ং 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)-সমভিব্যাহারে আমার বাসায় দর্শন দিলেন এবং একথা-সেকথার পর নাটকটি শুনিতে চাহিলেন। আমি সোৎসাহে পড়িয়া শুনাইলাম। দীনেশ-রঞ্জন অতিশয় ভদ্র পয়োমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনে যাহাই থাকুক, মুখে লেখাটির বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং 'কল্লোলে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশার্থ প্রার্থনা করিলেন। প্রস্তাবের অসম্ভবতা বুঝিয়াও আমি অনুগৃহীত হইলাম। আমার বাল্যবন্ধু 'কল্লোলে'র একাধিক গল্প-লেখক দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় মনীশ ঘটকের সহিত আলাপ ছিল। মনীশ শক্ত জোরালো মানুষ, ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড়ের দলে নয়, সে অকুণ্ঠচিত্তে "কচি ও কাঁচা"র ব্যঙ্গকে অতিশয় সক্ষম রচনা বলিয়া স্বীকার করিল। পরে মাসিকের প্রথম সংখ্যা হইতে "কচি ও কাঁচা" প্রকাশিত হইয়া বিষম কোলাহল ও হট্টগোলের সৃষ্টি করে; মামলা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁহারই অনুরোধে চতুর্থ অঙ্কের পরবর্তী অংশ আর প্রকাশ করা হয় না। সে বৃত্তান্ত পরে বলিব।

ইতিমধ্যে নানা কারণে ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের একাধারে সন্ন্যাস-আতুরাশ্রমটি ভাঙিয়া গেল। রতন আইন পাস করিয়া বিদায় লইল, কিরণের সেই শিবপুরেই বিবাহ হইয়া গেল। এবার সত্যকার সংসার পাতিতে হইবে। বন্ধু সুবলচন্দ্রের আগ্রহ ও চেষ্টায় ঘোষ লেনে তাহার বাড়ির পাশে একটি বাড়ি ভাড়া করা হইল, কিরণ ও আমি সপরিবারে সেখানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে এই বাড়িটি সত্যসত্যই পয়া। এখানেই এক প্রভাতে চা-পান করিতে করিতে যোগানন্দদা ও আমি—সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক—'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম।

তৎপূর্বে আর দুইটি কাজ করিয়াছিলাম। সমসাময়িক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

গত ২৪শে মাঘ [১৩৩৩] আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ-নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথাবার্তার পর মোহিতবাবু বাংলা-সাহিত্যে বর্তমান দুর্নীতি বিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন যে, বাংলা-সাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এ বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিতপটুত্ব তাঁহাকে কোন বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত জন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সাধারণের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনি ভুঁইফোঁড় লেখক, কোনো দিন কোনো বিষয়ে পড়াশুনা করেন নাই, এমন কি তিনি ইংরেজী পর্যন্ত ভাল জানেন না। সেই জন্য এই সকল স্বভাব-সাহিত্যিক দল তাঁহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া থাকে। তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা না থাকিলেও রেঙ্গুনে অবস্থানকালে সেখানকার লাইব্রেরিতে এমন কোনো ইংরেজী বাংলা পুস্তক ছিল না যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। পতিত ও পতিতাদের সম্বন্ধে তিনি তাঁহার লেখায় যে সহৃদয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়াই এই অভিনব দুর্নীতিসমর্থক সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁহাকে নিজেদের দলে টানিয়া থাকে। "কিন্তু", তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, "আমি আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি, তার প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখেছি, আমি কখনো ফাঁকি দিয়ে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি

অযথা লিখি না—একটি কথাও বদলাতে পারি না। আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমি পাপের বিকৃত জঘন্য রূপ দেখাবার জন্যেই পাপচিত্র এঁকেছি, সাহিত্যের রুচির বা নীতির কোনো আইন কখনো অমান্য করি নি।"…অন্যান্য আরো অনেক কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছাক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, সেই সাহিত্যকে লইয়া এ ভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে, কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, মোহিতলালের প্রবন্ধটি মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, শরৎচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ। আমি রবীন্দ্রনাথকেও টলাইতে চাহিলাম। ১১ ইয়োরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন হইতেই ২৩শে ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখে শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে এক দীর্ঘ পত্রাঘাত করিলাম। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার 'কল্লোল-যুগে' আমার পত্র ও রবীন্দ্রনাথের জবাব উদ্ধৃত করিয়াছেন।* আমি আর তাহা করিব না। তখনকার বাংলা-সাহিত্যে আমার মতে যে সকল অনাচার চলিতেছিল, আমি সেই সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই আগেকার সাহিত্য-সমালোচনা হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তাঁহাকে সচেতন ও সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম—

"পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।…কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা?…যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?"

ঠিক দুই দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জবাব পাইয়াছিলাম:

* মাসিক 'শনিবারের চিঠি' প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৪, প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল ক'রো না। কেন করি নে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে। ...সুসময় যদি আসে আমার যা বলবার বলব।"

সুসময় আসিতে বিলম্ব হয় নাই; ১৩৩৪ সনের আষাঢ় মাসে বাংলা-সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় করিয়া মহাসমারোহে ষড়ঋতুর কানামাছি খেলার নৃত্যচ্ছন্দে 'বিচিত্রা' আবির্ভূত হইল। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তবলা ও শ্রীঅমল হোম বাঁয়া সঙ্গত করিয়া এবং সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সানাইয়ের পোঁ ধরিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন যে, মনে হইল দীনবন্ধুর "দীনাহীনা-পিঁচুটি-নয়না" বঙ্গবাণী অকস্মাৎ পাটরাণীর পদে বৃতা হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি রকমে এই কানামাছি খেলার বুড়ী হইয়া বসিলেন। কলিকাতার পথঘাট, প্রাচীর ও প্রান্তর 'বিচিত্রা'র বিচিত্র বিজ্ঞাপনী-কলরবে মুখর হইয়া উঠিল। সাহিত্যে "অভিজাত" কথাটা সেই প্রথম শুনিলাম। বস্তুত, বাংলা-মাসিকপত্রের এক বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত 'বিচিত্রা' আনিয়া দিল।

দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক এই কারণে যে, ইহা লইয়া বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক ও গুরুতর আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ইহার ফলে এমন বহু-শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি বাংলা-সাহিত্যের উপর পতিত হয় যাঁহারা এতাবৎকাল মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষাই করিয়া আসিতেছিলেন। নানা দিকের মতবিরোধ স্পষ্ট ও মুখর হইয়া আবর্ত ও কোলাহলের সৃষ্টি করে, এবং 'শনিবারের চিঠি'কেই কেন্দ্র করিয়া শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও কৃতী ব্যক্তিরা এই কলহের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

আমার ব্যাকুল পত্র-আবেদনের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধে "আধুনিক সাহিত্যে"র বিরুদ্ধে কি লেখেন তাহা আজ নূতন করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য, তাঁহাদেরই মধ্যে অতি-সেয়ানা কেহ কেহ শাসনকে সম্মানভাবে গায়ে মাখিয়া আজকাল সোল্লাসে নৃত্য করিতেছেন দেখিতেছি। দুই যুগেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, আসল খবর এ যুগের পাঠকেরা বড় একটা রাখেন না। তাঁহাদিগকে ভুল বোঝানো হইতেছে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং বাধ্য হইয়া আসলের খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা [আমার নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য] এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলচে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট্-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসঙ্গত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্তব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সঙ্গীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়। কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।

·· যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে!' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী!'

ইহার জের দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং সম্ভবত এখনও চলিতেছে। যাঁহারা সেদিন প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই যথাসময়ে মত পরিবর্তনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্মকে মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নূতনেরা আসিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নজির খাটিবে না, অন্য নজির দিতে হইবে।

শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয়ের কাহিনী পূর্বে বলি নাই। সে কাহিনীও বিচিত্র এবং "জড়"কেন্দ্রিক। ১৩৩১ সালের ফাল্গুনে

যখন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' সন্থ বন্ধ হইয়া যায়, তখন বড়ই দমিয়া গিয়াছিলাম। দমনেরই রূপান্তর বিদ্রোহ বা বিপ্লব। আমিও বিদ্রোহ করিলাম—ভগবানের বিরুদ্ধে। কোয়াণ্টাম থিয়োরি, রিলেটিভিটি ও রেডিও-অ্যাকৃটিভিটি তখনও মাথায় গজগজ করিতেছে, অধিকন্তু কাগজ-পরিচালনায় মার খাইয়াছি। সুতরাং তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলাম—কেহ নাই, কিছু নাই, নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, চাপিয়া পিষিয়া মারিতেছে, আমরা বৃথা ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছি। চিৎকারটি স্বভাবতই একটি দীর্ঘ কবিতার রূপ লইল—"জড়"। লিখিলাম—

প্রকৃতির নিয়ন্তা সে জড় মূক প্রকৃতি আপান,
ঈশ্বরের খেলা ইহা অক্ষমের ভ্রমান্ধ কল্পনা,
কেহ জাগরূক নাই ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য গনি,
দণ্ডহাতে এতদিন বিশ্বে কেহ করে নি চালনা।

আপনি চলেছে সৃষ্টি বীজ হতে হতেছে অঙ্কুর,
কদর্যতা বীভৎসতা পাপপুণ্য কোথা কিছু নাই,
অন্ধ কবি ভাবে—শোনে কত মধু অন্তহীন সুর,
ধূলিরে ভাবে না ধূলি, ভাবে ছাই নহে শুধু ছাই।

আছে সুর উঠে তাহা নিখিলের গতির প্রবাহে,
জন্ম আর মৃত্যু আছে এইমাত্র নিয়ম অনাদি ;
প্রেমিক ধূলির সনে আপন যোগের গান গাহে,
অস্তিত্ব নাহিক যার, পায়ে তার চিত্ত রাখে বাঁধি।

কভু কি দেখেছ তুমি আর্ত যবে পীড়িত ধরণী
মানুষের হাহাকারে মেঘ হতে ঝরিয়াছে জল,
তোমার হৃদয়ে যবে উঠে ব্যর্থ ক্রন্দনের ধ্বনি
থেমেছে কি ক্ষণতরে প্রকৃতির নিত্য কোলাহল ?

দেখেছ কখনো তুমি নীলাকাশ হয়েছে মেদুর,
রৌদ্রতাপে দগ্ধ যবে শস্যভরা শ্যাম বসুন্ধরা,
রোগ-যন্ত্রণায় রোগী শোনে কভু তারকার সুর,
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রজনী কি পলায় সত্বরা ?

প্রাণহীন জড়ে ল'য়ে কল্পনার নাহিক অবধি,
ছন্দ গান কবিত্বের প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত !
যে কাঁদে সে কাঁদে, আর যে হাসে সে হাসে নিরবধি,
জর্জর যে বেদনায় সে হতেছে নিত্য জর্জরিত !

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে প্রচণ্ড রাগ-অভিমানের বশে পদ্যটি রচিত, "ভিট্রিয়লিক ভল্‌টেয়ার" আমার অজ্ঞাতসারে কাঁধে চাপিয়াছিলেন। তখন বাদুড়বাগান মেসেই আমার অবস্থান। শ্রীযতীশচন্দ্র সেন ও জীবনদা পদ্যটির তারিফ করিলেন। যতীশচন্দ্রের ঘরে তখন প্রভাসচন্দ্র ঘোষের নিত্য যাতায়াত। তিনিই তখন 'নব্যভারত' পরিচালনা করিতেছেন। আদি সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী নাই, তৎপুত্র প্রভাতকুসুমও গত। প্রভাতকুসুমের সহধর্মিণী ফুল্লনলিনী দেবী মৃত 'নব্যভারত'কে পুনরুজ্জীবিত করিলেন, প্রভাস ঘোষ প্রধান সহায়—যতীশ সেন, জীবনময়ও সঙ্গে আছেন। ১৩৩১-এর বৈশাখ হইতে 'নব্যভারত' বেশ সজীব ভাবেই বাহির হইতেছিল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি প্রভাসদা আমার "জড়"পদ্যটি কাড়িয়া লইয়া গিয়া চৈত্র-সংখ্যায় শেষ রচনা হিসাবে বেনামী ["শ্রী—"] ছাপাইয়া দিলেন। এই "জড়"-বিকারই 'নব্যভারতে'র কাল হইল। সমাজে তুমুল সোরগোল উঠিল। সম্পাদিকা বিরক্ত হইলেন। কাগজ অনতিবিলম্বে বন্ধ হইয়া গেল।

'নব্যভারতে'র যাহাই হউক, আমার লাভ হইল। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' তখন ধারাবাহিক ভাবে ইহাতে বাহির হইতেছিল। শরৎচন্দ্র নিজে একজন উপন্যাসের আসামী, তিনি আগ্রহের সঙ্গে 'নব্যভারত' পাঠ

করিতেছিলেন। যে কোনও কারণে তাঁহার তৎকালীন জড়ীভূত দৃষ্টি আমার "জড়ে"র উপর পড়িল। তনি এত খুশি হইলেন যে, বিশেষ অনুসন্ধানে শিবপুরের প্রতিবেশী শ্রীকালিদাস নাগ মারফৎ লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিলেন। কালিদাসদা পরিচয়-পত্রসহ আমাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বাজে-শিবপুরের বাড়িতে গেলাম। ভেলিকে দেখিলাম এবং শরৎচন্দ্রের পিঠ-চাপড়ানি খাইয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম পরিচয় এই পর্যন্ত।

তাহার পর, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র পাকাপাকি অবস্থানের জন্য রংপুর-মাহিগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আসিলেন। পত্রযোগে নিবিড় পরিচয় জন্মিয়াছিল, কলিকাতায় আসিতেই আমরা একাত্ম হইয়া গেলাম। তাঁহার মত আশাবাদী সাহিত্যিক আমি আর দেখি নাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ঢিলাঢালা—হচ্ছে-হবে-গোছের মানুষ, সুচিরকাল অপেক্ষা করার স্থৈর্য তাঁহার ছিল। রবি ছিলেন অস্থিরপ্রকৃতির সক্রিয় আশাবাদী। 'শনিবারের চিঠি'র অভাবে আমাকে মনমরা দেখিয়া তিনি আমার পিঠে সজোরে থাবা মারিয়া সোৎসাহে বলিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, চল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, সেখানেই ব্যবস্থা হবে। গোলদীঘির পূর্বপারে এখন যেখানে বিশ্বভারতী পুস্তকালয় সেই বাড়িতে কিংবা তাহারই আশেপাশে কোনও একটা বাড়িতে তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আপিস। রবি 'আনন্দবাজারে' নামে বেনামে লিখিতেন। প্রথম দিনেই টের পাইলাম, শ্রীমাখনলাল সেন, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রবিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আমিও সেই দিন হইতেই স্নেহাশ্রিত হইলাম। ব্যবস্থা হইল শনিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য নিদিষ্ট থাকিবে;

তাহাতে আমরা শনিমণ্ডলী যাহা খুশি লিখিব। কয় সপ্তাহ 'শনিবারের চিঠি' এইভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ক্রোড়স্থ হইয়া বাহির হইয়াছিল সঠিক তাহা বলিতে পারিব না, পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়া বাহির করাও আজ দুর্ঘট, তবে এইটুকু বেশ মনে আছে মাসাধিক কাল তো বটেই। এইভাবে ক্ষেত্রান্তরে উপ্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আর একটু প্রসার বাড়িল, আমার লাভ হইল বেশ কয়েকজন নূতন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত এইখানেই পরিচিত হইয়াছিলাম। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই স্নেহ আমি বরাবর সমানে পাইয়া আসিয়াছি।

যাহা হউক, যে কাহিনী বলিতেছিলাম। ১৩৩২-এর চৈত্রে কলিকাতায় যে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত শুরু হয় তাহার জের টানিয়া আমরা ১৩৩৩-এর জ্যৈষ্ঠে জুবিলী বা দাঙ্গা সংখ্যা বাহির করিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেই জের মিটে নাই। "শুদ্ধি-আন্দোলন" নাম দিয়া আমি তখনই একটা দুর্দান্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উক্ত 'শনিবারের চিঠি'তে পত্রস্থ করিতে দেন নাই। লেখাটি আমার এতই প্রিয় ছিল যে, প্রায় সর্বদা তাহা পকেটে পকেটে ফিরিত। লোক পাইলেই পড়িয়া শুনাইতাম। 'আনন্দবাজার'-আপিসে ভাদ্র মাসের কোন একদিনে রবির আগ্রহাতিশয্যে প্রবন্ধটি খুব হৃদয়গ্রাহী করিয়া পড়িলাম। সত্যেনদা ও প্রফুল্লবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন; রবি তো ওই কাজেরই কাজী ছিল, সুতরাং তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। সেখানে আর একটি আমার অজ্ঞাত-পরিচয় যুবক বসিয়া ছিলেন; প্রবন্ধ পাঠ সাঙ্গ হইলে তিনি বিনীতভাবে আমার নিকটে প্রবন্ধটি প্রার্থনা করিলেন। সত্যেনদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি 'হিন্দু-সঙ্ঘ' সাপ্তাহিকের সম্পাদক অনুজাচরণ সেনগুপ্ত। তিনি বলিলেন, পূজার বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি

ছাপিবেন। আমি সানন্দে দীর্ঘকাল পরে প্রবন্ধটির ভারমুক্ত হইলাম। ১৯শে আশ্বিন ১৩৩৩ (৬ অক্টোবর ১৯২৬) বুধবার 'হিন্দু-সঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাহির হইল। এক খণ্ড হাতেও আসিল। আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম, আমার "শুদ্ধি-আন্দোলন" বাহির হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিলাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা" নামক একটি প্রবন্ধ "শুদ্ধি-আন্দোলনে"র পাশাপাশি ছাপা হইয়াছে। সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই আমার উল্লাস বাধাগ্রস্ত হইল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, শরৎচন্দ্র ও আমার প্রবন্ধের জন্য অনুজাচরণ ধৃত হইয়াছেন, 'হিন্দু-সঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, বিচারেরও বিলম্ব হইল না। অনুজাচরণের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল। অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। এই অবস্থায় কালিদাসদা সংবাদ আনিলেন, শরৎচন্দ্র আমার সাক্ষাৎকামী। সেই দিনই হাওড়া টাউন হলে কোনও সভায় সায়াহ্নে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করিবেন, আমাকে সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে। অনুজাচরণের কঠোর শাস্তি এই আহ্বানের আনন্দ অনেকখানি খণ্ডিত করিয়া দিল, তবুও গেলাম।

উত্তর দ্বার দিয়া ঢুকিয়া সিঁড়িপথে দোতলায় উঠিলেই চওড়া বারান্দা এবং তাহারই সংলগ্ন প্রকাণ্ড হল। লোকে লোকারণ্য। শরৎচন্দ্র সভা আলো করিয়া সভাপতির আসনে বসিয়া আছেন। আমি বারান্দা ও হলের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভার শালীনতা ভঙ্গ করিয়া আমাকে বেশ জোরেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া চৌকি হইতে নামিয়া পাশের উত্তরপূর্ব কোণের বিশ্রামঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সভায় বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পরে বুঝিয়াছিলাম, সভাপতির আসনে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তিতে

কালযাপন করিতেছিলেন, আমাকে উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি বাঁচিয়া গেলেন। তাঁহার এই সভা-ভীতি বরাবরই ছিল।

আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে বিশ্রামকক্ষে উপনীত হইলাম। একটা আরাম-কেদারায় তিনি ততক্ষণে বসিয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দ গড়গড়ায় সাজা কলিকা বসাইয়া তাঁহার হাতে সট্‌কা তুলিয়া দিয়াছে। আমি আসিতেই তিনি আমাকে প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া পাশের চৌকিতে বসিতে আদেশ করিলেন। হলের গুঞ্জন অনুযোগের আকারে সভার উদ্যোক্তাদের মুখে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, আর কাউকে বসিয়ে দাও গে, সজনীর সঙ্গে আমার জরুরী কাজ আছে। আমি তাঁহার নিকট ঘণ্টাখানেক ছিলাম, ইহার মধ্যে তিনি আর সভামঞ্চে প্রবেশ করিলেন না। সকলকে বিশ্রামকক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলেন, শুধু আমি আর তিনি রহিলাম। একান্তে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমাদেরও ধরবে না কি হে? দেখ তো কি কাণ্ড! মনে হইল, তিনি সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছেন। তিনি আমার লেখার অন্তর্নিহিত যুক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। নানা কথাবার্তার মধ্যে এই দ্বিতীয় দিনেই আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে তাঁহার সামতাবেড়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই মোহিতলালকে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের ২৪ তারিখ তাঁহার রূপনারায়ণাবাসে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম এবং আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনুজাচরণ সেনগুপ্ত কারামুক্তির কিছুকাল পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লালদীঘির ধারে তদানীন্তন কলিকাতার পুলিস-কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া স্বদলীয় বোমার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নাম রহিল না বটে, কিন্তু আমার মনোমন্দিরে তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে।

শরৎচন্দ্রের রচনাটি ("বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা") 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু আমার "শুদ্ধি-আন্দোলনে"র প্রয়োজন আমাদের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একেবারেই শেষ হইয়াছে। তাই অতীত ইতিহাসের টুকরা হিসাবে তাহার কিঞ্চিৎ এই 'আত্মস্মৃতি'তে ধরিয়া রাখিলাম—

> ভারতবর্ষে মুসলমান প্রভাব আরম্ভ হইবার সময় হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু উৎপীড়িত হইয়াছে, উৎপীড়ন করে নাই। মুসলমানধর্ম রাজধর্ম বলিয়া, উৎপীড়ক ধর্ম বলিয়া ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুর এই সংখ্যাহ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ, হিন্দুর সামাজিক অত্যাচার ও অবিবেচনা। সম্প্রতি সেগুলি দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, এইটাই ভারতবর্ষের পরম শুভ লক্ষণ। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন এই সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।
>
> অবশ্য এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, শুদ্ধি-আন্দোলন নিছক সামাজিক দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রচেষ্টা ; ইহার অন্য একটি দিকও আছে ; ইহা শুধু আত্মরক্ষা করিবার উপায় নহে, আক্রান্ত ব্যক্তির উদ্ধারসাধনও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মুসলমানের সহিত বিরোধ বাধিতেছে শুদ্ধি-আন্দোলনের এই দিকটি লইয়া।···
>
> জয়চাঁদের সময় হইতে জে. এম. সেনগুপ্ত মহাশয় পর্যন্ত সকল তথাকথিত হিন্দুই আপনার পায়ে আপনি কুঠার হনন করিয়া আসিতেছেন—জ্ঞানোন্মেষ কবে হইবে ব্যথিত হইয়া তাহাই ভাবিতেছি। দেখিলাম মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকল মহাপুরুষই ভয়ে হউক বিশ্বাসে হউক মুসলমানের অন্যায় আবদার সহিয়া আসিতেছেন। চিত্তরঞ্জন মরিয়া বাঁচিয়াছেন, নতুবা আজ তাঁহার প্যাক্টের দুর্দশা দেখিয়া মর্মাহত হইতেন। গান্ধীজী খিলাফতের জন্য প্রাণপাত করিলেন, তবুও সোহাগিনী মুসলমানের মন রাখিতে পারিলেন না দেখিয়া

'ছুৎমোর' বলিয়া কোণা লইলেন। আর আজিও এত দেখিয়া শুনিয়াও ইহারা সেই প্রাচীন ভুল করিতেছেন দেখিয়া চোখে জল আসে।···

বাংলা দেশে দেখিতেছি স্বরাজ্য দলের মত আর একটি দল প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়া থাকেন। কম্যুনিস্ট বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন জানি না, কিন্তু আমরা তাঁহাদের পরিচালিত পত্রিকা পড়িয়া ও দুই-এক স্থলে তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, মধ্যবিত্ত লোকের ধ্বংসসাধন করিয়া সমাজের তথাকথিত নিপীড়িত জাতিকেই দেশের পরিচালনার ভার দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য। আশ্চর্য এই যে, এই মতবাদ তাঁহারা যাহাদের কাছে প্রচার করিতেছেন তাহারাও মধ্যবিত্ত।···

গত এপ্রিল মাস হইতে পর পর যে কয়েকটি দাঙ্গা বাংলার উপর হইয়া গেল তাহাতে হিন্দু এই বুঝিয়াছে যে, ক্ষমা ও প্রেম নিরীহের মহত্ত্ব নহে, দুর্বলতা মাত্র; হিন্দু যদি সবল হইত, ঠেঙ্গানির উত্তর যদি সে ঠেঙ্গানি দিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে প্রীতি-মৈত্রীর কথা অপ্রাসঙ্গিক হইত না বটে, কিন্তু এখন যখন মার খাইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই তখন প্রীতির বার্তা প্রচণ্ড উপহাস ছাড়া কিছুই নয়।···

ভারতের হিন্দুর অবমাননা ও লোকক্ষয়-রোগের একমাত্র প্রতিকার শুদ্ধি-আন্দোলন ও সংগঠন। হিন্দু দলবদ্ধ হউক। প্রাণ দিয়া ধর্ম রক্ষা করুক। যদি বীরের মত মরিতে প্রস্তুত না থাকে, অলক্ষ্যে ছুরি খাইয়া মরিতে হইবে। যদি মৃতপ্রায় এই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা তুমি আমি প্রত্যেকেই না করি, তাহা হইলে সকলের মুসলমান হইয়া মুসলমান সাম্যবাদের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া হাসান-হুসেন বলিয়া বুকে করাঘাত করত পরের মাথায় লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাই চরম পথ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভাল।

অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানিত, বাহিরে আসিবার মন্ত্র শিখে নাই বলিয়া প্রাণ হারাইল। হিন্দু-সমাজ বাহিরে যাইবার মন্ত্র জানে, ভিতরে প্রবেশ করিতে জানে না বলিয়াই এমন লাঞ্ছিত ও হীনবল হইতেছে। বহির্গত হিন্দুকে সমাজ-গোষ্ঠীতে

ফিরাইয়া আনিবার শুদ্ধিই একমাত্র উপায়। এই শুদ্ধি-আন্দোলনকে মূর্খের মত নিন্দা করিয়া আমরা যেন আত্মহত্যার পাতকী না হই।
—'হিন্দু-সঙ্ঘ,' ১৯ আশ্বিন ১৩৩৩

স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা আটাশ বৎসর পূর্বের রচনা; হিন্দু যদি সত্যই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ ভারত-বিভাগের সর্বনাশা অবস্থার উদ্ভব হইত না।

যাহা হউক, এক দিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি এবং অন্য দিকে শরৎচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত সংগ্রহ করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র মাসিকরূপে পুনর্জন্মের তোড়জোড় করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে (শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন এবং তাহার পরেও পরবর্তী অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে আধুনিক সাহিত্যে বাহির-হইতে-আমদানি-করা নকল "কারি-পাউডরে"র বিরুদ্ধে শক্ত প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহা তাঁহার 'সাহিত্যের পথে' পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবাল্য সাধনার দ্বারা তাঁহার জন্মার্জিত সংস্কার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং সাহিত্যধর্মে তিনি দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, কখনও তাঁহার মতের নড়চড় হয় নাই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

১৩৩৪ সালের ৯ ভাদ্র তারিখে আমার জন্মদিনে মাসিক 'শনিবারের চিঠি' বিবিধ শঙ্কা ও সংশয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক পূর্ববৎ শ্রীযোগানন্দ দাস, আমি তাঁহার সহকারী। প্রথম প্রবন্ধ আমার সেই রবীন্দ্রনাথের নিকট আবেদন, তাঁহার আশ্বাস ও শরৎ চন্দ্রের সহিত "ইণ্টারভিউ"-প্রসঙ্গ লইয়া—নাম "আধুনিক বাংলা সাহিত্য"। স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন "নব যুগান্তর" কবিতা এবং "পুরুষসিংহম্‌" প্রবন্ধ। তাহার পর, পর পর আমার দীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা "অঙ্গুষ্ঠ," শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গল্পের প্যারডি "সব শেয়ালের এক—",

সম্পাদক মহাশয়ের চুট্‌কি কবিতা "বাদলাতে", যাহার প্রথম দুই পংক্তি প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

"বাদলাতে যদি মন ভারী
মুড়িতে মেখে নে লঙ্কা নুন—"

তাহার পর আমার সেই "কচি ও কাঁচা" নাটকের ভূমিকা ও প্রথম অঙ্ক, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা "তোমাদের প্রতি", "সংবাদ-সাহিত্য" (আমার), 'প্রবাসী'র বেতালের "বৈঠক"কে ঠাট্টা করিয়া হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের "চাতালের বৈঠক," অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প "আজি হ'তে কিছু বর্ষ পরে" এবং সর্বশেষে মোহিতলাল মজুমদারের "পত্র"। মাসিকের প্রথম সংখ্যার ইহাই সূচী। বলা বাহুল্য, "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" ও "পুরুষসিংহম্‌" ছাড়া বাকি সবগুলিই বেনামী রচনা। মোট চৌষট্টি পাতা, মূল্য দুই আনা। কর্মাধ্যক্ষ শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ঠিকানা—৯১ আপার সারকুলার রোড (প্রবাসী আপিসের ঠিকানা)। প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল চার পাতা—তিন পাতা মলাটের এবং এক পাতা ভিতরের। বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—বেঙ্গল কেমিক্যাল, দি ইণ্ডিয়ান ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং, বুক কোম্পানি ও এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। এই সংখ্যার মলাটেই ত্রিবর্ণ মুরগির প্রথম আবির্ভাব, মুরগির সঙ্গে মলাটে শনিগ্রহ যুক্ত হন আরও অনেক পরে। গত পঁচিশ বৎসর বহু লোকে বহুবার মুরগির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে মুখে ও পত্রযোগে প্রশ্ন করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক, দীর্ঘ নিশাবসানে প্রত্যুষের আভাস ইত্যাদি নানা গুরুগম্ভীর ও মুখরোচক ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোনটিই সত্য হইত না। আসল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ্য পার্টি, এবং আদর্শ ছিল তদানীন্তন বাঙালী প্রেমিক সম্প্রদায়ের "যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে"-বয়েৎ মুদ্রিত চিঠির কাগজ। মোটের উপর ইহা ছিল আমাদের নিছক ছেলেমানুষী খেয়াল। বাজার-প্রচলিত চিঠির কাগজে ছাপা

থাকিত পারাবতের মুখে চিঠি—আমাদের পত্রিকার নাম যখন 'শনিবারের চিঠি' তখন তাহারও বাহক দরকার, মুরগির চাইতে ভাল বাহন তখন আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। মুরগির গলায় স্বরাজ্য মেলব্যাগ ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রেমিকের হস্তধৃত চিঠিতে লেখা হইল, "যাও পাখি বোলো তারে।" চিত্রকর তখনকার বিখ্যাত কার্টুনিস্ট বিনয়কৃষ্ণ বসু। ভিতরের প্রথম পাতায় 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের আঁকা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সেই চাবুক-মার্কা ছবি। ইহাই মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যার মোট পরিচয়।

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধটি ছিল নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ লক্ষ্য অলক্ষ্য কাহারও নাম ছিল না, ছিল নিত্য-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের কথা। তাহাতেই শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিচলিত হইয়া ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় গুরুতর প্রতিবাদ জানাইলেন ("সাহিত্য-ধর্মের সীমানা"), কিন্তু ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার প্রবন্ধে অনেকগুলি নাম একসঙ্গে কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভীরু শরৎচন্দ্র প্রমাদ গনিলেন, বিশেষ করিয়া নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত আমি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন। তাড়াতাড়ি সামলাইবার জন্য আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী'তে (১৩৩৪) "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া বসিলেন। ফাঁদাই বটে, কারণ প্রবন্ধটি "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"-প্রবাদের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহা তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' পুস্তকে তাঁহার জীবৎকালে মুদ্রিত হইয়াছে, যে কেহ পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> "শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির

উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানত আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশ-চন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পালাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারি জন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাও না তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে। তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল।"

ইহা শরৎচন্দ্রের নিছক ব্যঙ্গোক্তি নহে, সকল সাধু ব্যক্তির ন্যায় তিনিও উকিলের জেরাকে অতিশয় ভয় করিতেন—মস্ত উকিলের তো কথাই নাই। হাওড়া টাউন হলেরও সেই "আমাদেরও ধরবে না কি হে?" এই ভয়েরই প্রকাশ। তাঁহার ব্যাঘ্রভীতি যতই থাকুক, সত্য কথা এই যে আমি তাঁহাকে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিই নাই। তিনি নরেশচন্দ্রের রচনাকে কখনই অনবদ্য জ্ঞান করিতেন না, তর্কের ঝোঁকে হঠাৎ বিড়ালকে বাঘ কল্পনা করিয়া বসিলেন।

ফলে কোলাহল জমিয়া উঠিল। আমার বয়স তখন অল্প, এই বিবদমান সম্প্রদায়ের সর্বকনিষ্ঠ আমি। আমার স্বভাবত গরম রক্ত আরও গরম হইয়া উঠিল, আমি প্রবল বেগে তাঁহাকেই আক্রমণ করিলাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে; আমরা অর্থাৎ অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও আমি ঘন ঘন ট্রেনযোগে ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়-পানিত্রাস-ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং যে শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা নৈতিক কারণে একদা 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, তাঁহারই গল্পের অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ সাদরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন। ঠিক এই গভীর মিলনাত্মক দৃশ্যে বিচ্ছেদের ছায়াপাত হইল। সমালোচনার নামে আমি শরৎচন্দ্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিলাম। সে আঘাতের কথা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্ভবত ভুলিতে পারেন নাই, পারিলেও আমি তাহা জানিতে পারি নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি তাঁহার মৃত্যুর পর একাধিক বার।

শুধু আর একবার তাঁহার স্নেহস্পর্শ পাইয়াছিলাম। ঘটনাটি আকস্মিক। আমার মনের মণিকোঠায় সেদিনের স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঁকুড়া শহরে মায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আমি মায়ের শ্রাদ্ধে বাঁকুড়া যাইতেছিলাম। কাছা গলায় খালি পায়ে হাওড়া স্টেশনে বাঁকুড়াগামী ট্রেনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার একজন। আগাইয়া গিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম—স্বয়ং শরৎচন্দ্র। প্রশ্ন করিলেন, কোথায় চলেছ? আমার সেই বেশ নিশ্চয়ই তাঁহার স্নেহের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল। সমস্ত নিবেদন করিলাম। তিনি সস্নেহে আমাকে তাঁহার কামরায় আহ্বান করিলেন। আমি সবিনয়ে আমার নিম্নশ্রেণীর টিকিটের কথা জ্ঞাপন করাতে তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, বেশি ভাড়া দেওয়া যাবে, তুমি এস। আমার সঙ্গে বন্ধু সুবলচন্দ্র ও অজিতনারায়ণ শ্রাদ্ধে যোগদানের জন্য বাঁকুড়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে জানাইয়া আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য শরৎচন্দ্রের সহযাত্রী হইলাম—দেউলটি পর্যন্ত।

সেই শ্রাবণ শেষের বর্ষণমুখর একটি রাত্রি। সশব্দে ট্রেন চলিতেছে—বি. এন. আর.এর ট্রেন। শরৎচন্দ্র কথা বলিতেছেন, আমি নির্বাক শ্রোতা হইয়া বসিয়া আছি। বাংলা দেশের কোথায় সদ্য একটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর বেদনার উত্তেজনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার একটি কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমি না বলিলে এ কথা আর কাহারও জানা সম্ভব নয়। তিনি কম্পিত গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, দেখ, ধর্মটা বড় নয়, বড় হইতেছে মনুষ্যত্ব, ধর্ম রাখিতে গিয়া আমরা অমানুষ হইয়া পড়িয়াছি। যদি বাংলা দেশের সমস্ত হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াও মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে পারে, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহাদের প্রতিদিনকার এই হীনতাবরণ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তিনি এই প্রসঙ্গে যে সকল অভিজ্ঞতা-প্রসূত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণে আছে, কিন্তু প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সেদিন সাহিত্য সম্পর্কে একটিও কথা হয় নাই। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে এই জটিল সমস্যাই দেউলটি পর্যন্ত তাঁহার ভাবপ্রধান চিত্তকে অধিকার করিয়া ছিল। ইহার পর তিনি দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার সহিত আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার ঘটে নাই।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

সংগ্রাম

মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত মাসিক 'শনিবারের চিঠি'ও ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হইল। বালক অভিমন্যুও তাহাকে বলা চলে। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' 'ধূপছায়া' 'উত্তরা' চোখা-চোখা অস্ত্র লইয়া মার্-মার্ করিয়া আসিল ; শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-রাধাকমল প্রমুখ সপ্তরথীও এই কৌরব-অক্ষৌহিণীর সঙ্গে যোগ দিলেন। কুরুক্ষেত্র জমিয়া উঠিল। সেদিন অভিমন্যু-বধ সম্ভব হয় নাই শুধু এই কারণেই যে, কৌরব-অক্ষৌহিণী সমবেত ভাবেও অভিমন্যুর সমকক্ষ ছিল না এবং সপ্তরথীরও কৌরবপক্ষে আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল না। অন্তত শরৎচন্দ্রের যে ছিল না, তাহার প্রমাণ 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্মে"র প্রতিবাদে লিখিত "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" প্রবন্ধেই আছে—

> "…কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটেই হইল আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাকি যে ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] আসল উপদেশটি সকল সাহিত্যসেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত।"

আসলে ইহাই হইল শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা। কিন্তু তিনি তর্কের ভান করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পরিহাস করিবার লোভ সংবরণ

করিতে পারেন নাই, কোনও কারণে সাময়িকভাবে তিনি কবিগুরুর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আসল মনের কথাটা বাদ দিয়া আমি তাঁহার ধানাই-পানাই লইয়াই তাঁহাকে এই বলিয়া আঘাত করিলাম—

> মনস্তত্ত্ববিদেরা এক প্রকার কম্প্লেক্স-এর কথা উল্লেখ করেন, যাহার প্রভাবে পড়িয়া লোকে বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা কহে। মিথ্যা বলিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত কোনও লাভ নাই, তবু মিথ্যা বলিবার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারে না। আইন-আদালতে এই শ্রেণীর মিথ্যা সাক্ষী অনেক দেখা যায়, সাহিত্যের আদালতেও সম্প্রতি দেখা দিয়াছে।

এই আঘাত শরৎচন্দ্র সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আমার প্রতি এমনই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালে যত্রতত্র আমাকে পাগল বলিয়া অভিহিত করিয়া মনের ঝাল মিটাইতেন। তাঁহার ভক্ত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রে তাঁহার এই উক্তি একাধিক বার প্রচারিত হইয়াছে—আমি বিশ্বাস করি নাই, ব্যক্তিগত আক্রোশে শরৎচন্দ্র এতখানি আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীঅতুল বসুর মুখে যখন সেই কথাই শুনিলাম, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ১৯৩৪ সনে শ্রীঅতুল বসু তেলরঙে আমার একটি পোর্ট্রেট আঁকেন। কলিকাতা যাদুঘরে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে উহা প্রদর্শিত হয়। শরৎচন্দ্র প্রদর্শনী দেখিতে দেখিতে আমার ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিল্পী অতুল বসুকেই বলেন, "দেখেছ, লোকটার চোখে পাগলের দৃষ্টি, একেবারে পাগল! হবে না, ওর মা যে পাগল ছিলেন।" আশ্চর্য, আমার মায়ের মূর্ছারোগ যে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্করোগে পরিণত হইয়াছিল শরৎচন্দ্র সে খবরও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিস্মিত হইবার কারণ এই যে, প্রায় ঠিক এই সময়েই আমি তাঁহার নিকট স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার

কোম্পানির হইয়া বই বেচিতে গিয়া সবিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় আমি 'বঙ্গশ্রী'র চাকুরিতে ইস্তফা দিই। শ্রীপরিমল গোস্বামী তখন 'শনিবারের চিঠি'র বেতনভোগী সম্পাদক, এবং আমারই মত অসহায়। তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে মন সরে না, অথচ অন্নসংস্থানের অন্য উপায়ও জানা নাই। শ্রীনিখিল দাস স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানির নামকরা সেল্‌স্‌ম্যান, আমি এক সময় তাঁহার একজন বড় ক্রেতা ছিলাম, পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তিনি ভরসা দিলেন, কুচ পরোয়া নাই, দুই জনে বই বেচিয়া কমিশন ভাগাভাগি করিয়া লইব; একসঙ্গে খাটিলে আয় মন্দ হইবে না। আমি তখন নিমজ্জমান, যে কোনও কুটাই আমার হস্তধার্য। সুতরাং নিখিল দাস সজনী দাস—দুই দাসে মিলিয়া দাস অ্যাণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত হইল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-স্থিত "ভারত-ভবনে" একটি কামরা ভাড়া লইয়া রীতিমত সাহেবী মেজাজের অফিস হইল, টেলিফোন হইল। নিখিলদার একখানা মোটরকার ছিল, নানা কারণে তিনি তাহা নিজেই চালাইতেন, কখনও ড্রাইভারের সাহায্য লইতেন না। আপিস তালাবদ্ধ করিয়া দুই দাসে শিকারে বাহির হইতাম। দিনান্তে আপিসে ফিরিয়া চা-চুরুট খাইতে খাইতে যখন হিসাব খতাইতাম, আমার চারিদিকে চা-চুরুটের ধূম্রজালের সঙ্গে ভাবনার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত। যাহা হউক, একদিন দুই জনে মিলিয়া শরৎচন্দ্রকে তাঁহার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে বধ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে পাইয়া বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। সেই আস্ত রেঙ্গুন লাইব্রেরি গিলিয়া খাওয়ার গল্প আরও সরস করিয়া বলিলেন এবং এক সেট বহুমূল্য বিজ্ঞানের বই নগদ দামে খরিদ করিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। সেদিন স্নেহবিগলিত শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে শ্রীঅতুল বসুর নিকট পূর্বোক্ত কাহিনী শুনিয়া আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল,

পাগলকে সর্বরকমে তুষ্ট করিয়া ভয়ে ভয়ে সেদিন বিদায় করেন নাই তো! জবাব দিবার জন্য শরৎচন্দ্র তখন আর ছিলেন না।

যৌবনের উত্তেজনা বড় ভয়ঙ্কর, শক্তির উন্মাদনাও কম ভয়ঙ্কর নয়। আমরা একে একে প্রখর ব্যঙ্গে সপ্তরথীকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলাম। এই কালের 'শনিবারের চিঠি' যাঁহারা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন, কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণই না আমরা মাত্র তিন-চার জনে ঘটাইয়াছিলাম। আমরা কয়েক জন একক, 'শনিবারের চিঠি' একা—বিরুদ্ধ পক্ষে বড় বড় মহারথী, একুনে সাতাশটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে "ত্রাহি ত্রাহি" রব উঠিয়াছিল ; সেকালের "অতি-আধুনিক" ও আধুনিকত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার পরিচয় মিলিবে।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার 'কল্লোল যুগে' অনবধানতা অথবা বিস্মৃতি-বশত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে কিছু ভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। আমিই রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন সাহিত্যের অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম—ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ "সরাসরি খারিজ ক'রে দিলেন আর্জি।" আমার আবেদনের দুই-তিন মাসের মধ্যেই তিনি যে "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আমার আবেদন-পত্র ও তাঁহার জবাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি-পত্র 'কল্লোল যুগে' পুনর্মুদ্রিত করিয়া সেই সত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও "আর্জি খারিজ" করার কথা অন্তত তাঁহার লেখা উচিত হয় নাই।

সত্য কথা এই যে, আমার আবেদনের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধ ঠিক আণবিক বোমার মত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ 'বিচিত্রা'য়। বোমা নিক্ষেপ করিয়া তিনি মালয় ভ্রমণে চলিয়া যান, ফিরিয়া আসেন কার্তিকের মাঝামাঝি। তাঁহার আরও মারাত্মক বোমা

"সাহিত্যে নবত্ব" ১৯২৭ সনের ২৩শে আগস্ট 'প্লানসিউস' জাহাজে নির্মিত হইয়া অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র "যাত্রীর ডায়ারি" শিরোনামায় নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে তিনি লেখেন—

> "শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুরাই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে;—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর।' ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।"

হিরোশিমার পরে নাগাসাকি: "সাহিত্য-ধর্মে" আহত আধুনিক সাহিত্যিকেরা "সাহিত্যে নবত্বে"র আঘাতে মর্মাহত হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই সভা আহ্বান করিতে হইল তাঁহার জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা-ভবনে"। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার অপরাধ আরও গুরুতর হইয়া উঠিল ২৩ পৌষ ১৩৩৪ তারিখে লেখা তাঁহার একখানি পত্র 'শনিবারের চিঠি'র মাঘ (১৩৩৪) সংখ্যায় মুদ্রিত হইবার ফলে। পত্রটি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। ইহাতে 'শনিবারের চিঠি'র ও আধুনিক তরুণদের সাহিত্যিক মামলার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"শনিবারের চিঠি"তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর অস্ত্র তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে।···

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক-সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝতে পারি কচি ভাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে-অস্থানে বাহাদুরি ক'রে বেড়ায়, 'আমরা তরুণ, আমরা তরুণ' ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করি নে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ জ্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মতো দগদগে তার রঙ। শুধু তাই নয়, তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিনে পাস করতে হয় না,—বিধাতার

দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে 'ছায়েবানুগতা,' ওরা যদি দোষ ক'রে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত ক'রে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হ'লে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো ব'লে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্মিণীর সহধর্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা ক'রে দেখো। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

ভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আমরা কার্তিক সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র "মণি-মুক্তা" বিভাগে কোনও মহিলা-লেখিকার গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আহ্বান করিলাম। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তাঁহার জবাব পাইলাম—

"কল্যাণীয়েষু—

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তা হ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম—কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম্ দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি ["সাহিত্যে নবত্ব"] সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েছে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প ব'লেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব

"শনিবারের চিঠি"তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গীতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর অস্ত্র তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে।...

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক-সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝতে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে-অস্থানে বাহাদুরি ক'রে বেড়ায়, 'আমরা তরুণ, আমরা তরুণ' ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করি নে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ জ্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মতো দগদগে তার রঙ। শুধু তাই নয়, তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিনে পাস করতে হয় না,—বিধাতার

দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে 'ছায়েবানুগতা,' ওরা যদি দোষ ক'রে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত ক'রে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হ'লে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো ব'লে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্মিণীর সহধর্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা ক'রে দেখো। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, আমরা কার্তিক সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র "মণি-মুক্তা" বিভাগে কোনও মহিলা-লেখিকার গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আহ্বান করিলাম। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তাঁহার জবাব পাইলাম—

"কল্যাণীয়েষু—

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তা হ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম—কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম্‌ দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি ["সাহিত্যে নবত্ব"] সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েছে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প ব'লেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব

না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেণ্ট, আর আমার আরোগ্য-স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ঈস্টইণ্ডিজ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করিতেছিলেন—শুধু বিশ্রাম নয়, তাঁহার বিচিত্র গানে গানে ঋতুরঙ্গশালা মুখর হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতার সাহিত্য-প্রাঙ্গণে যে কোলাহল আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, যাহা আসলে আমাদের আহ্বান ও তাঁহার উত্তর "সাহিত্য-ধর্মে"রই জের, তাহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে পত্রাঘাত করিতেছিলাম তর্কের কোলাহলে নামিতে নয়, সম্পূর্ণ দলাদলি-নিরপেক্ষভাবে চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে। তিনি লিখিলেন—

"কল্যাণীয়েষু,

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার এখনো লিখতে বসতে পারি নি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

"আপনারা এমন কিছুই ভাল লেখেন নি যাতে সহসা বাংলা-সাহিত্যের একটা নতুন দিক খুলে গেছে—তা হ'লে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অন্তত তাঁর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আপনাদের কোথাও না কোথাও স্বীকার করতেন। কারণ, তিনি বরাবরই বাংলা-সাহিত্যের অথবা রূপকলার যেখানে যা নতুন অভ্যুদয় হয়েছে, তাকেই আপনার উদার স্নেহস্পর্শে ধন্য করেছেন—তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে মঙ্গলআশিসের শুভবাণী বর্ষণ করেছেন।…রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া আপনাদের ওপর নেই, এতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের সাহিত্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, থাকলেও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। বাংলা-সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক লেখা যে আর্ট হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যথাসময়ে তিনি তাকে যথাভাবে স্বীকারও করেছেন।"

আরও একটি সমসাময়িক সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিতেছি। সাক্ষী 'প্রগতি' পত্রিকা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, ঢাকার 'প্রগতি'-বাদী হইলেও উভয়েই কলিকাতার 'কল্লোলে'র দুইটি উত্তাল ঢেউ। সম্পাদকীয় "মাসিকী"তে 'প্রগতি' সেদিন লিখিয়াছিলেন—

"'শনিবারের চিঠি' দেশের লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করবেই বা না কেন? বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যাকে সস্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা—সে পত্রিকার কিছুমাত্র মর্যাদা বা মূল্য নেই এ-কথা কেমন ক'রে বলি? 'চিঠি'র লেখকদের রচনাভঙ্গীর চাতুর্য, জ্ঞানের অদ্ভুত বিস্তার, কোনো বিশেষ লিখনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করবার আশ্চর্য শক্তি, হাস্যরসের ওপর অধিকার—এ-সব কাকে না মুগ্ধ করেছে? প্যারডি করায় এঁদের বেশ হাত আছে, কবিতা লিখতে গিয়ে এঁদের ছন্দপতন হয় না, এঁরা অনায়াসে অজস্র লিখতে পারেন, এ-সব গুণ কি উপেক্ষণীয়?"

কিন্তু আসল সত্য কথা হইতেছে এই যে, মাসিক 'শনিবারের চিঠি' সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল সম্পূর্ণ একক, একান্ত আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া। তাহার নিয়মিত লেখকসংখ্যা প্রারম্ভে

না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্তে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হ'ল সার্জিকাল ডিপার্টমেণ্ট, আর আমার আরোগ্য-স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ঈস্টইণ্ডিজ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করিতেছিলেন—শুধু বিশ্রাম নয়, তাঁহার বিচিত্র গানে গানে ঋতুরঙ্গশালা মুখর হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতার সাহিত্য-প্রাঙ্গণে যে কোলাহল আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, যাহা আসলে অস্মাদের আহ্বান ও তাঁহার উত্তর "সাহিত্য-ধর্মে"রই জের, তাহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে পত্রাঘাত করিতেছিলাম তর্কের কোলাহলে নামিতে নয়, সম্পূর্ণ দলাদলি-নিরপেক্ষভাবে চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে। তিনি লিখিলেন—

"কল্যাণীয়েষু,

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার এখনো লিখতে বসতে পারি নি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

"আপনারা এমন কিছুই ভাল লেখেন নি যাতে সহসা বাংলা-সাহিত্যের একটা নতুন দিক খুলে গেছে—তা হ'লে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অন্তত তাঁর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আপনাদের কোথাও না কোথাও স্বীকার করতেন। কারণ, তিনি বরাবরই বাংলা-সাহিত্যের অথবা রূপকলার যেখানে যা নতুন অভ্যুদয় হয়েছে, তাকেই আপনার উদার স্নেহস্পর্শে ধন্য করেছেন—তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে মঙ্গলআশিসের শুভবাণী বর্ষণ করেছেন।...রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া আপনাদের ওপর নেই, এতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের সাহিত্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, থাকলেও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। বাংলা-স্যাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক লেখা যে আর্ট হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যথাসময়ে তিনি তাকে যথাভাবে স্বীকারও করেছেন।"

আরও একটি সমসাময়িক সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিতেছি। সাক্ষী 'প্রগতি' পত্রিকা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, ঢাকার 'প্রগতি'-বাদী হইলেও উভয়েই কলিকাতার 'কল্লোলে'র দুইটি উত্তাল ঢেউ। সম্পাদকীয় "মাসিকী"তে 'প্রগতি' সেদিন লিখিয়াছিলেন—

"'শনিবারের চিঠি' দেশের লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করবেই বা না কেন? বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যাকে সস্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা—সে পত্রিকার কিছুমাত্র মর্যাদা বা মূল্য নেই এ-কথা কেমন ক'রে বলি? 'চিঠি'র লেখকদের রচনাভঙ্গীর চাতুর্য, জ্ঞানের অদ্ভুত বিস্তার, কোনো বিশেষ লিখনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করবার আশ্চর্য শক্তি, হাস্যরসের ওপর অধিকার—এ-সব কাকে না মুগ্ধ করেছে? প্যারডি করায় এঁদের বেশ হাত আছে, কবিতা লিখতে গিয়ে এঁদের ছন্দপতন হয় না, এঁরা অনায়াসে অজস্র লিখতে পারেন, এ-সব গুণ কি উপেক্ষণীয়?"

কিন্তু আসল সত্য কথা হইতেছে এই যে, মাসিক 'শনিবারের চিঠি' সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল সম্পূর্ণ একক, একান্ত আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া। তাহার নিয়মিত লেখকসংখ্যা প্রারম্ভে

মুষ্টিমেয়—মোহিতলাল, অশোক, যোগানন্দ ও আমি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রমুখ শক্তিমানেরা পরে একে একে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু শুরুতেই এমন প্রবল বিক্রমে আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, মনে হইয়াছিল সপ্তরথীশাসিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মহড়া আমরা লইতে পারিব, অবশ্য জনার্দন রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে আছেন—এই বিশ্বাস আমাদিগকে কম বলীয়ান করে নাই।

প্রথম সংখ্যা মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পরিচয় দিয়াছি, দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আবার আসিয়া জুটিলেন, এবারেও বিষয় সেই মুসলমানী সাহিত্য—"তারিখ-ই-বাঙ্গালা।" বাংলা দেশের পূর্বতন শাসন-পদ্ধতি আরও পাঁচ শো বছর বজায় থাকিলে কি ঘটিতে পারিত তাহার আভাস এই কল্পিত ইতিহাসে ছিল। আরম্ভটি এইরূপ—

> "এই যে নক্সা দেখিতেছ ইহার নাম বাঙ্গালা মুলুক। এই দেশের উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে সমন্দর, পূর্বে আছাম ও পশ্চিমে বিহার শরিফ। সেকালে এই দেশে হিন্দু নামে এক জাতি বসতি করিত। তাহারা বোত পরস্তি করিত। ইট-পাথরের মূরত গড়িয়া তাহাকে ছেজদা করিত। আজ সহর কলিকাতা, যেখানে তোমাদের দেশের বাদশাহ বাস করেন, সেইখানে তাহাদের এক বোত ছিল তাহার নাম কালী। আজ যেখানে বাঁটু জুতাওয়ালার মছজেদ দেখিতে পাইতেছ সেইখানে এই বোতের ঘর ছিল।..."

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এই মাস হইতেই নিয়মিত আমাদের আসরে যোগ দিলেন ও পরবর্তী কার্তিক সংখ্যার জন্য তিনি কয়েকটি সাহিত্য-প্রসঙ্গ লিখিয়া আনিয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ছাত্র-গৌরবে মোহিতলালের গর্ব ও আনন্দের অবধি ছিল না। নীরদচন্দ্র তখন পর্যন্ত ইংরেজীনবিস ছিলেন, বাংলা লিখিতেন না। মাতৃভাষা-সাধনার প্রথম প্রয়াসই তাঁহার এমন

ঊনবিংশ তরঙ্গ

"সমবেতা যুযুৎসবঃ"

তরুণেরা সেদিন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রৌঢ় বয়স উত্তীর্ণ হইয়া আজিও ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন যে, 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কথাটা ঠিক নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে। "সাহিত্যের আদর্শ" সম্বন্ধে আমরা সূত্রপাতেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলাম—

> "সাহিত্যের যদি কোনও নীতি থাকে—তাহা প্রেম, সৌন্দর্য ও জ্ঞানের নীতি। এই নীতি শাস্ত্রগত নয়, ইহা জ্ঞানবান ও হৃদয়বান হৃদয়ের অন্তরনিহিত নীতি, ইহা লোকব্যবহারঘটিত সংস্কার নহে। সাহিত্যও একটি অপূর্ব জ্ঞানযোগ। ইহা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব—পূর্ণদৃষ্টির সহায়। **সাহিত্য অশ্লীল হইতে পারে না।** যেখানে এই অশ্লীলতার বাধা রসাস্বাদে সত্যকার বাধা হইয়া দাঁড়ায় সেখানে কবির Inspiration বা দিব্যানুভূতিই মিথ্যা—তাহা জাগে নাই; সেখানে তাঁহার ভাবদৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ।...সাহিত্যই আধুনিক মানবের জীবন-বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিল মানবপ্রাণের অসীম কাকুতি, মানব-চরিত্রের অপার রহস্য, মন্থিত জীবনসিন্ধুর সুধা ও ফেন-গরল—এ সকলই সাহিত্যের অধিকারভুক্ত। এখন কবির দায়িত্বের অবধি নাই। **জীবনের কিছুকেই তিনি বর্জন করিতে পারেন না।** তাঁহাকে সেই প্রেমিক হইতে হইবে, যাঁহার চক্ষে—"সকল সলিল তীর্থ-সলিল, জীবের আনন চন্দ্রানন।"...কিন্তু আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তাহার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে।...যাহা কিছু সুন্দর তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের আক্রোশ।... মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান যদি দুর্নীতি না হয়,—ভগ্নজানু, বক্রমেরুদণ্ড, বিকলচক্ষু প্রভৃতি যদি শক্তিমত্তার লক্ষণ হয়, তবে শাস্ত্র ও

মুষ্টিমেয়—মোহিতলাল, অশোক, যোগানন্দ ও আমি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রমুখ শক্তিমানেরা পরে একে একে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু শুরুতেই এমন প্রবল বিক্রমে আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, মনে হইয়াছিল সপ্তরথীশাসিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মহড়া আমরা লইতে পারিব, অবশ্য জনার্দন রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে আছেন—এই বিশ্বাস আমাদিগকে কম বলীয়ান করে নাই।

প্রথম সংখ্যা মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পরিচয় দিয়াছি, দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আবার আসিয়া জুটিলেন, এবারেও বিষয় সেই মুসলমানী সাহিত্য—"তারিখ-ই-বাঙ্গালা।" বাংলা দেশের পূর্বতন শাসন-পদ্ধতি আরও পাঁচ শো বছর বজায় থাকিলে কি ঘটিতে পারিত তাহার আভাস এই কল্পিত ইতিহাসে ছিল। আরম্ভটি এইরূপ—

> "এই যে নক্সা দেখিতেছ ইহার নাম বাঙ্গালা মুলুক। এই দেশের উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে সমন্দর, পুর্বে আছাম ও পশ্চিমে বিহার শরিফ। সেকালে এই দেশে হিন্দু নামে এক জাতি বসতি করিত। তাহারা বোত পরস্তি করিত। ইট-পাথরের মূরত গড়িয়া তাহাকে ছেজদা করিত। আজ সহর কলিকাতা, যেখানে তোমাদের দেশের বাদশাহ বাস করেন, সেইখানে তাহাদের এক বোত ছিল তাহার নাম কালী। আজ যেখানে বাঁটু জুতাওয়ালার মছজেদ দেখিতে পাইতেছ সেইখানে এই বোতের ঘর ছিল।···"

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এই মাস হইতেই নিয়মিত আমাদের আসরে যোগ দিলেন ও পরবর্তী কার্তিক সংখ্যার জন্য তিনি কয়েকটি সাহিত্য-প্রসঙ্গ লিখিয়া আনিয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ছাত্র-গৌরবে মোহিতলালের গর্ব ও আনন্দের অবধি ছিল না। নীরদচন্দ্র তখন পর্যন্ত ইংরেজীনবিস ছিলেন, বাংলা লিখিতেন না। মাতৃভাষা-সাধনার প্রথম প্রয়াসই তাঁহার এমন

ঊনবিংশ তরঙ্গ

"সমবেতা যুযুৎসবঃ"

তরুণেরা সেদিন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রৌঢ় বয়স উত্তীর্ণ হইয়া আজিও ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন যে, 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কথাটা ঠিক নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণীলেহনের বিরুদ্ধে। "সাহিত্যের আদর্শ" সম্বন্ধে আমরা সূত্রপাতেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলাম—

> "সাহিত্যের যদি কোনও নীতি থাকে—তাহা প্রেম, সৌন্দর্য ও জ্ঞানের নীতি। এই নীতি শাস্ত্রগত নয়, ইহা জ্ঞানবান ও হৃদয়বান হৃদয়ের অন্তরনিহিত নীতি, ইহা লোকব্যবহারঘটিত সংস্কার নহে। সাহিত্যও একটি অপূর্ব জ্ঞানযোগ। ইহা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব—পূর্ণদৃষ্টির সহায়। **সাহিত্য অশ্লীল হইতে পারে না।** যেখানে এই অশ্লীলতার বাধা রসাস্বাদে সত্যকার বাধা হইয়া দাঁড়ায় সেখানে কবির Inspiration বা দিব্যানুভূতিই মিথ্যা—তাহা জাগে নাই; সেখানে তাঁহার ভাবদৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ।...সাহিত্যই আধুনিক মানবের জীবন-বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিল মানবপ্রাণের অসীম কাকুতি, মানব-চরিত্রের অপার রহস্য, মন্থিত জীবনসিন্ধুর সুধা ও ফেন-গরল—এ সকলই সাহিত্যের অধিকারভুক্ত। এখন কবির দায়িত্বের অবধি নাই। **জীবনের কিছুকেই তিনি বর্জন করিতে পারেন না।** তাঁহাকে সেই প্রেমিক হইতে হইবে, যাঁহার চক্ষে—"সকল সলিল তীর্থ-সলিল, জীবের আনন চন্দ্রানন।"...কিন্তু আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তাহার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে।...যাহা কিছু সুন্দর তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের আক্রোশ।...মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান যদি দুর্নীতি না হয়,—ভগ্নজানু, বক্রমেরুদণ্ড, বিকলচক্ষু প্রভৃতি যদি শক্তিমত্তার লক্ষণ হয়, তবে শাস্ত্র ও

সমাজনীতি বহুগুণে শ্রেয়; সাহিত্যের মুক্তবায়ু অপেক্ষা কারাগৃহের রুদ্ধশ্বাস অধিকতর স্বাস্থ্যকর। যাহাকে বাঁধিয়া রাখা উচিত তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই। যে ফুল ফুটাইতে পারে না সে গাছ ছিঁড়িয়া বাগান উৎসন্ন করে; যে গান করিতে পারে না, সে বাদ্যযন্ত্র আছড়াইয়া কোলাহল করে—ধুনুরীর ধুননযন্ত্র বাজাইয়া তুলা উড়াইতে থাকে। সত্য-সুন্দরকে চিনিবার শক্তি যাহার নাই, সে ভানমত র ভেল্কী দেখাইয়া রাস্তায় লোক জড় করে।…" —সত্যসুন্দর দাস : 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৩৪

মোহিতলালের এই অকপট উক্তি যে সেদিনকার চিন্তাশীল বাঙালীকে 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রমাণ—বৎসর শেষ না হইতেই আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম (শ্রীরাজশেখর বসু), শ্রীসুশীলকুমার দে প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা মাসিকের রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অবতরণ করিলেন; রবীন্দ্রনাথ মৈত্র নূতন করিয়া "বাস্তবিকা"র আসর খুলিয়া বসিলেন, এবং শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রথমে লেখক ও পরে সম্পাদকরূপে ইহাতে যোগ দিলেন। আর একজন লেখক আমরা পাইলাম, তিনি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত পাঠক" এই বেনামীতে তিনি "সাহিত্য-বিকারের প্রতিকার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন, যাহা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক সমাজকে এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিল। এমন সার্থক তীব্র ব্যঙ্গ যাঁহার হাতে বাহির হইয়াছিল তিনি অনুরূপ আর কিছু লিখিলেন না—ইহা আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। আর দুইজন অতি শক্তিমান লেখককে আমি আকর্ষণ করিলাম—একজন, ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং অন্যজন ডাক্তার লেখক শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বাংলা-কাব্যসাহিত্যের উপর তখন যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র অত্যন্ত প্রভাব। তরুণেরা এমন কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা

"আরও লজ্জার কথা হ'ল এই,—ঠিক যে যুগে বাংলার তরুণের ললাট কলঙ্কমসীলিপ্ত, আধুনিক ইতিহাসের যে সময়টিতে বাংলার তরুণের তীব্রতম ব্যর্থতা দিকে দিকে অঙ্কিত,…ঠিক সেই সময় তরুণের এই জয়ঢক্কা বাজান হচ্চে। আজ বাংলার তরুণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে,—জীবনের ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন পথ কেটে বার হবার সাধনা নানা দিকে ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই সে একমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে কালি-কলমের সাহায্যে তার তরুণত্ব সপ্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে। চীনের তরুণ, তুরস্কের তরুণ জীবনযাত্রায় তাদের পিছিয়ে ফেলে জয়োল্লাস করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেল! তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযান-গীতি সম্পর্কে মৌন হয়ে প্রবীণ পারস্যের যৌন-গজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, এর জন্য বাংলার সমস্ত তরুণ দায়ী। কর্মের সংগ্রামে তরুণ চারদিক থেকে হঠে এসেছে; সেই বিফলতার ছায়া আজকের সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে যে নূতনত্ব প্রকাশ করছে, তাকে একটি অসামান্য সাফল্যের অগ্রদূত ব'লে নিঃসঙ্কোচে প্রচার করা মর্মান্তিক পরিহাস।… হায় বাংলার তরুণ! তোমারই মুখের পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বিদেশী সিগারেটের ধূমে কুণ্ডলায়িত হয়ে পশ্চিম আকাশে ফুল ফোটাচ্ছে! যে জীবনের সাধনায় বিফল, সে সাহিত্যে আশাতীত সফলতা লাভ করছে, এ কি সত্য হতে পারে? ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড কোনো দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনের নব নব তরুণ অনুভূতি ও বিচিত্র প্রকাশকে তো বাধা দেয় নি। কিন্তু তোমার ভাষা পর্যন্ত যে ক্রমে ভাঙা শিরদাঁড়ার কুচো হাড়ের মত এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে, সে কি শুধুই ভাবের আতিশয্যে, না, জীবনের বিফলতায়! আরও আশঙ্কার কথা এই, তোমার সব ত্রুটি তারুণ্যের আড়ালে ঢেকে রাখবার জন্য প্রবীণ বন্ধুর অভাব হবে না। কিন্তু এই বন্ধুত্ব কি একান্তই স্নেহপ্রসূত? প্রবীণে প্রবীণে যে সব মনোমালিন্য বহুদিন থেকে সঞ্চিত হয়েছিল, তোমাকে আশ্রয় ক'রে, সাহিত্যের আদর্শ বিচারের অছিলায়, সেই সব লুকানো অগ্নি তোমারই তোষামোদের ইন্ধন পেয়ে আজ দীপ্তিমান হয়ে উঠছে না, সে বিষয়ে কি নিঃসন্দেহ হয়েছ?"

সমাজনীতি বহুগুণে শ্রেয়; সাহিত্যের মুক্তবায়ু অপেক্ষা কারাগৃহের রুদ্ধশ্বাস অধিকতর স্বাস্থ্যকর। যাহাকে বাঁধিয়া রাখা উচিত তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই। যে ফুল ফুটাইতে পারে না সে গাছ ছিঁড়িয়া বাগান উৎসন্ন করে; যে গান করিতে পারে না, সে বাদ্যযন্ত্র আছড়াইয়া কোলাহল করে—ধুনুরীর ধুননযন্ত্র বাজাইয়া তুলা উড়াইতে থাকে। সত্য-সুন্দরকে চিনিবার শক্তি যাহার নাই, সে ভানমতীর ভেল্কী দেখাইয়া রাস্তায় লোক জড় করে।...” —সত্যসুন্দর দাস: 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৩৪

মোহিতলালের এই অকপট উক্তি যে সেদিনকার চিন্তাশীল বাঙালীকে 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রমাণ—বৎসর শেষ না হইতেই আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম (শ্রীরাজশেখর বসু), শ্রীসুশীলকুমার দে প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা মাসিকের রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অবতরণ করিলেন; রবীন্দ্রনাথ মৈত্র নূতন করিয়া “বাস্তবিকা”র আসর খুলিয়া বসিলেন, এবং শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রথমে লেখক ও পরে সম্পাদকরূপে ইহাতে যোগ দিলেন। আর একজন লেখক আমরা পাইলাম, তিনি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় “শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত পাঠক” এই বেনামীতে তিনি “সাহিত্য-বিকারের প্রতিকার” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন, যাহা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক সমাজকে এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিল। এমন সার্থক তীব্র ব্যঙ্গ যাঁহার হাতে বাহির হইয়াছিল তিনি অনুরূপ আর কিছু লিখিলেন না—ইহা আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। আর দুইজন অতি শক্তিমান লেখককে আমি আকর্ষণ করিলাম—একজন, ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং অন্যজন ডাক্তার লেখক শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বাংলা-কাব্যসাহিত্যের উপর তখন যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র অত্যন্ত প্রভাব। তরুণেরা এমন কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা

"আরও লজ্জার কথা হ'ল এই,—ঠিক যে যুগে বাংলার তরুণের ললাট কলঙ্কমসীলিপ্ত, আধুনিক ইতিহাসের যে সময়টিতে বাংলার তরুণের তীব্রতম ব্যর্থতা দিকে দিকে অঙ্কিত,...ঠিক সেই সময় তরুণের এই জয়ঢক্কা বাজান হচ্চে। আজ বাংলার তরুণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে,—জীবনের ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন পথ কেটে বার হবার সাধনা নানা দিকে ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই সে একমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে কালি-কলমের সাহায্যে তার তরুণত্ব সপ্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে। চীনের তরুণ, তুরস্কের তরুণ জীবনযাত্রায় তাদের পিছিয়ে ফেলে জয়োল্লাস করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেল! তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযান-গীতি সম্পর্কে মৌন হয়ে প্রবীণ পারস্যের যৌন-গজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, এর জন্য বাংলার সমস্ত তরুণ দায়ী। কর্মের সংগ্রামে তরুণ চারদিক থেকে হঠে এসেছে; সেই বিফলতার ছায়া আজকের সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে যে নূতনত্ব প্রকাশ করছে, তাকে একটি অসামান্য সাফল্যের অগ্রদূত ব'লে নিঃসঙ্কোচে প্রচার করা মর্মান্তিক পরিহাস।... হায় বাংলার তরুণ! তোমারই মুখের পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বিদেশী সিগারেটের ধূমে কুণ্ডলায়িত হয়ে পশ্চিম আকাশে ফুল ফোটাচ্ছে! যে জীবনের সাধনায় বিফল, সে সাহিত্যে আশাতীত সফলতা লাভ করছে, এ কি সত্য হতে পারে? ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড কোনো দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনের নব নব তরুণ অনুভূতি ও বিচিত্র প্রকাশকে তো বাধা দেয় নি। কিন্তু তোমার ভাষা পর্যন্ত যে ক্রমে ভাঙা শিরদাঁড়ার কুচো হাড়ের মত এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে, সে কি শুধুই ভাবের আতিশয্যে, না, জীবনের বিফলতায়! আরও আশঙ্কার কথা এই, তোমার সব ত্রুটি তারুণ্যের আড়ালে ঢেকে রাখবার জন্য প্রবীণ বন্ধুর অভাব হবে না। কিন্তু এই বন্ধুত্ব কি একান্তই স্নেহপ্রসূত? প্রবীণে প্রবীণে যে সব মনোমালিন্য বহুদিন থেকে সঞ্চিত হয়েছিল, তোমাকে আশ্রয় ক'রে, সাহিত্যের আদর্শ বিচারের অছিলায়, সেই সব লুকানো অগ্নি তোমারই তোষামোদের ইন্ধন পেয়ে আজ দীপ্তিমান হয়ে উঠছে না, সে বিষয়ে কি নিঃসন্দেহ হয়েছ?"

তরুণ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের আস্ফালন এবং শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-রাধাকমলের গায়ে-পড়া ওকালতির লজ্জাকর মর্মকথাটা যতীন্দ্রনাথ যে ভাবে ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ করেন নাই। ইহার কারণ, তিনি আন্তরিক ভাবে দেশের তরুণদের শুভকামী ছিলেন, তাহাদের ব্যর্থতার লজ্জা তাঁহাকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছিল, শিখণ্ডীরূপে তরুণদিগকে সম্মুখে রাখিয়া কোনও হীনতর উদ্দেশ্য সাধন—feeding fat some ancient grudge-এর মতলব তাঁহার ছিল না। যে সকল অবাস্তব বিকৃত সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান-চেষ্টার নামে বিকৃত রুচির ব্যাপক প্রচার তথাকথিত অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা কয়েকটি সাময়িকপত্রে করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধেও যতীন্দ্রনাথ এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—

> "ব্যষ্টিগত জীবনের সমষ্টিই সমাজ। যে সমস্যা সমাজে আজও প্রকট নয়, জীবনে তা সত্য না হতে পারে; আর সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়তো বিলেতের আমদানী বায়োস্কোপের মতই অসার্থক।...সমাজ ও রুচিকে আঘাত দিলেও সাহিত্য হতে পারে—এ কথা সত্য; কিন্তু তাদের আঘাত দিলেই সাহিত্য হয় না—এ কথা ততোধিক সত্য।"

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম.বি. তখন 'বঙ্গবাণী'র আসরে খ্যাতিমান। তাঁহার সামাজিক নাটক 'একাল,' উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট,' 'দশচক্র,' গল্প "সিরাজীর পেয়ালা" বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেছে। ১৩৩৩ হইতে ১৩৩৪এর মাঘ মাসের মধ্যেই তাঁহার গল্প-উপন্যাস-প্রতিভা তাঁহার প্রাচীনতর কীর্তি 'বেপরোয়া'কে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কবিতা ও কার্টুন-ছবি সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' জলধরদাদা সার্টিফিকেট দিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র রচনাভঙ্গি ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা এই গুণী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিল, আকর্ষণের বিশেষ কারণ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার অভিযান। বাংলা দেশের ব্যর্থ তারুণ্যের দম্ভকে

তিনি বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণা ও অনুকম্পার সঙ্গে দেখিতেন। 'বেপরোয়া'তেও তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তিনি সুদূর মফস্বল হইতে (সম্ভবত ময়মনসিংহ, সেখানে তখন তিনি সিভিল সার্জন) "আমিও আছি" বলিয়া সাড়া দিলেন। ফাল্গুন সংখ্যার জন্য আসিয়া পৌঁছিল "আধ্যাত্মিক জাতি"র বিরুদ্ধে একটি সচিত্র কবিতা—একটি বমশেল। বলা বাহুল্য, চিত্রগুলি তাঁহারই অঙ্কিত। ঠিক তাঁহার জাতের কার্টুনিস্ট আর এ দেশে হয় নাই। লেখা এবং ছবি—এ বলে আমায় ত্যাখ্, ও বলে আমায় ত্যাখ্, অদ্ভুত সামঞ্জস্য! অত্যদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার! তিনি উল্টা চাপ দিয়া শুরু করিলেন, বৈজ্ঞানিক তারুণ্যের স্বপক্ষে আমাদের পচা প্রাচীনতার বিরুদ্ধে—

"জেনেছি আত্মা অবিনশ্বর, জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া।—
তাই আমাদের নাহি ভয় কানা-কৌড়ি;
তাই পথ চলি দিনক্ষণ বেছে, খনার বচন শুনিয়া,
সাহেব এড়াই সেলাম করি' বা দৌড়ি';
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!
ইহকালে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক,—
আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি'।"

এই কালাপাহাড়ী সুরটাও 'শনিবারের চিঠি'র নিজস্ব, পূর্বাপর বজায় আছে। বনবিহারীবাবু আসিয়া এই দিকটাতে বিশেষ জোর দিলেন। আসর আরও জমিয়া উঠিল। পরশুরাম—রাজশেখরের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক গিরীন্দ্রশেখর আসিলেন "রুচিসংসদের ডায়ারী" লইয়া, সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন। পরশুরামের "সাহিত্য-সংস্কার," "তামাক ও বড় তামাক" প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গরচনা 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। গিরীন্দ্রশেখরের "ঝরা শেফালির মতো" (মাঘ, ১৩৩৪) সম্ভবত বাংলা-কথাসাহিত্যে তাঁহার একমাত্র "অবদান"—তাহাও পুনঃপ্রকাশিত হয় নাই। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের

তৎকালীন ভয়াবহ কাব্যচর্চাকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত "লুই পাস্তোর"-হস্তে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের শ্রীনির্মল মৈত্রও মাঘে আবির্ভূত হইলেন। এই ধরনের প্যারডিতে তিনি বিদগ্ধ জনের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

ফাল্গুন সংখ্যায় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবর শ্রীগোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি'র মণ্ডল-ভুক্ত হইলেন, "শেষ মহাসঙ্গীতি" দিয়া তাঁহার আরম্ভ। তিনি আমার পূর্বতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু (অগিল্‌ভি হস্টেলের) হিসাবেই শুধু নয়, একেবারে নিজগুণে অর্থাৎ ইংরেজী লেখার জোরে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ওয়েলফেয়ারে'র সহিত যুক্ত হইলেন। পরে 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ'-এও প্রবেশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল, প্রায় কুড়ি বৎসর 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।

বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'র লেখক-প্রধানদের অন্যতম 'বনফুল'—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শুভাগমন ঘটিল। আমি যখন ইস্কুলে পড়ি এবং জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া 'প্রবাসী'র গ্রাহক হইয়াছি, বনফুল তখনই 'প্রবাসী'র লেখক-শ্রেণীভুক্ত। ছোট ছোট কবিতা লেখেন, আমার ধারণা ছিল তিনি স্ত্রীলোক, দেখিতে ছোট্টখাট্টটি। স্বচ্ছন্দ-সরসতা ও সরল বলিষ্ঠতার জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতও ছিলাম। হঠাৎ একদিন 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি স্বশরীরে আবির্ভূত হইলেন, আর সে কি শরীর! বিপুল, বিশাল। গায়ে ঢিলাঢালা খদ্দরের পাঞ্জাবি, আমাদের রবি মৈত্রের মতই অসম্বৃতবাস। পরিচয় শুনিয়া তো আমার মনের বনফুল শুকাইয়া মরিয়া গেল। কিন্তু জীবন্ত যে মানুষটি অন্তরে প্রবেশ করিল তাহাকে আর ছাড়িতে পারি নাই। ১৩৩৪ ফাল্গুন মাসে প্রথম দেখার পর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, সে পুনরাগমনায় চ।

সর্বাধিক আশ্চর্য এই, ঠিক এই মাসেই 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পরিচয় পাইলাম, সরাসরি নয়—একটু তির্যকভাবে। তিনি 'কল্লোলে'র (ফাল্গুন, ১৩৩৪) আবর্তে "রসকলি"র ছাপ লইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। 'কল্লোল,' 'কালি-কলম,' 'প্রগতি,' 'ধূপছায়া' পাইলেই লাল-নীল পেন্সিল হাতে বসিয়া যাইতাম "মণি-মুক্তা" ও "সংবাদ-সাহিত্যে"র খোরাকের জন্য। অতিরিক্ত জিদের বশে ইহা বদ্অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। তারাশঙ্করের "রসকলি"তেও যে দাগ মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার সে বৎসরের বাঁধানো 'কল্লোল' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, চাঁদমারির ওই দাগমারা পর্যন্ত। গুলি ছুঁড়িতে আরও দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, বনফুলের কথা হইতেছিল। আপ্যায়ন, আলাপ ও পরিচয়ের পর জানা গেল, আমরা উভয়েই একই বৎসরের (১৯১৮) ম্যাট্রিকুলেট এবং উভয়েই বিজ্ঞানের ছাত্র। বনফুল আই. এস-সি. পাস করিয়া ডাক্তারি লাইন ধরিয়াছিলেন, সবে ডিগ্রী পাইয়া বাহির হইয়াছেন। আমিও বি.এস-সি. পাস করিয়া মেডিকেল কলেজের দরজা-ফেরত। পরস্পর মুখ শোঁখাশুঁখি পর্যন্ত হইয়া রহিল। ডাক্তারকে ধরিলাম, অতি-আধুনিকতা-ব্যাধির ডাক্তারী মতে একটা ব্যবস্থা দিতে। ডাক্তার "আধুনিক গল্প-সাহিত্যে করুণ রস" লিখিয়া দিলেন। চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'তে তাহা বাহির হইল। যতদূর মনে পড়িতেছে, বনবিহারীবাবুই বনফুলের সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়াছিলেন। তিনি শুধু ডাক্তারিতেই বনফুলের গুরু নন, সাহিত্যিক উপদেষ্টাও ছিলেন। "আধুনিক গল্প-সাহিত্যে করুণ রস"ই সম্ভবত বনফুলের রচিত প্রথম প্রবন্ধ। সুতরাং প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক। একটু উদ্ধৃত করিয়া রাখিতেছি—

“গল্পে করুণ-রস প্রকাশ করিবার নানাবিধ উপায় আছে। লেখকগণ সাধারণত তাঁহাদের গল্পকে করুণ করিবার দুইটি সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন—নায়ক কিংবা নায়িকাকে মৃত্যুকবলিত করাইয়া, কিংবা ... (ডট্ ডট্) দিয়া শেষ করিয়া। এই নিদারুণ পরিণামে পাঠকগণও মুহ্যমান হইয়া যান। কারণ, পাঠক হইলেও তাঁহারা মানুষ, এবং মানুষমাত্রেরই মৃত্যু ব্যাপারটাকে মর্মান্তিক বলিয়া মনে করা একটা সহজ দুর্বলতা। মানব-চরিত্রের এই দুর্বলতার সুবিধা লইয়া লেখকগণ পটাপট নায়ক-নায়িকাকে হত্যা করিতে করিতে সাহিত্য-মন্দিরকে ‘মর্গ’ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সকল নায়ক-নায়িকা এই ধাঁচে মারা যাওয়াতে কারুণ্যটা ক্রমেই একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে।

দেখিতে পাই, নায়ক-নায়িকারা হয় (১) ধীরে ধীরে মারা যান, কিংবা (২) হঠাৎ মারা যান। হঠাৎ মৃত্যু হয় সাধারণত ত্রিবিধ উপায়ে—(ক) বিষ খাইয়া। (খ) গলায় দড়ি দিয়া। (গ) জলে ডুবিয়া। ধীরে ধীরে যাঁহারা মারা যান, তাঁহারা কিন্তু প্রায়ই যক্ষ্মাকাশ হইয়া মরেন দেখিতে পাই। রোগ যখন অনেক রকম আছে, তখন নায়ক-নায়িকারা কেবলমাত্র যক্ষ্মারোগে মারা যান কেন?...নায়ক আমাশয়ে ভুগিতে ভুগিতে মারা গেলেন, এ কথাতে হাসিবার কি আছে? আমাশয়ের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। যক্ষ্মারোগের জীবাণুর নাম Tubercle Bacillus, ইহার এক জ্ঞাতি আছে তাহার নাম Bacillus Lepri, উভয়ের চেহারা এক রকম—ধরন-ধারণ এক রকম, মানব-শরীরে উভয়ের ফল সমান করুণ।

ধরা যাক, নায়ক বিরহগ্রস্ত। বিরহে হাত-পা ঝিনঝিন করিতেছে, গালে ঠোঁটে সুড়সুড়ি ধরিতেছে—তবু কই প্রিয়া তো আসিল না! তারপর যখন প্রিয়া সত্যই আসিল, তখন হয়তো স্পর্শানুভূতি হারাইয়া গিয়াছে। নায়ক স্পর্শ করিতেছেন—অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একসঙ্গে পাওয়া ও না-পাওয়া। ইহার অপেক্ষা করুণ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? পরে ব্যাপার করুণতর হইবে।...নায়ক শেষে একেবারে বিগলিত হইয়া যাইবেন।

প্রণয় ব্যাপারে আরও দুইটি জীবাণুর কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। একটির নাম Treponema Pallidum—ইহারা সাধারণত

সমাজদ্রোহী নায়কদেহেই বিরাজ করে। ইহাদের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মানবদেহের এমন কোন বিকার নাই, যাহা ইহারা করিতে পারে না। আধুনিক বিদ্রোহী লেখকগণ ইচ্ছা করিলে নায়ককে এই রোগে আক্রান্ত করাইয়া যে কোন tragic situation সৃষ্টি করিয়া করুণা প্রকাশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় জীবাণুটির নাম—Deplococcus Instracellularis of Neisser—ইহারা নিজেরাও খুব প্রেমিক, 'usually occurs in pairs' এবং প্রেমিকদেহেই বিহার করেন, বিশেষত যাঁহারা 'বিবাহের চেয়ে বড়' কিছু করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের দেহে।"

১৩৩৪ সালের আশ্বিনে মাসিকের আরম্ভ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালকে 'শনিবারের চিঠি'র উদ্যোগপর্ব বলিতে পারি। সাপ্তাহিকের পুরাতন রথী ও পদাতিকেরা তো ছিলেনই, নানা দিগ্দেশ হইতে শুধু আদর্শের আকর্ষণেই আরও অনেকে একে একে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্রের আয়োজন ক্রমেই জমজমাট হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই উদ্যোগপর্বেই ভীষ্মপর্বের বিষাদ-যোগ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে বা চক্রান্তে আমাদের একমাত্র ভরসা ও আদর্শ স্বয়ং জনার্দন সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'কে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বিরূপতাজনিত বিষাদ-যোগ দিয়াই আত্মস্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ।

প্রথম খণ্ডের উপসংহারে মোহিতলালের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। এই অবস্থায় তিনি নিজে শুধু কর্ণধার হইলেন তাহা নয়, তাঁহার অনুরাগী শিষ্য নীরদচন্দ্রকেও টানিয়া আনিলেন। শক্তিমান রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আসিলেন নিজের টানে। অবসন্ন আমাকে এই তিন জনই কর্ম ও জ্ঞানযোগের মন্ত্র শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিলেন। মোহিতলাল সারথ্য গ্রহণ করিয়া মুহ্যমানকে নিত্যসাহিত্যের সঞ্জীবনী গীতা শুনাইতে লাগিলেন। বিচলিতকে আশ্বস্ত করিবার

জন্য তিনি আমার উদ্দেশে যে কবিতাটি এই দুঃসময়ে লিখিয়াছিলেন, পৌষের 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে গোড়ায় তাহাই "'শনিবারের চিঠি'র উদ্দেশে" এই নামে ছাপা হইল—

"'শিব'-নাম জপ করি' কালরাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার!
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী!—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা!—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বীর-বপু, ঊর্ধ্বস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই!—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষার অজস্র ফণা, অর্ধমগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়—
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায়!
নগ্ন বক্ষে পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি আড়ষ্ট আনীল!"

আসলে মোহিতলাল স্বয়ং হাল ধরিয়া মাসে মাসে নিত্য-সাহিত্যবিষয়ক সুচিন্তিত ও গম্ভীর প্রবন্ধ দিয়া আমাদের লঘু হাস্যের ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভারসাম্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। চিন্তাশীল পাঠকের কাছে 'চিঠি'র মর্যাদা তিনিই বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার 'আধুনিক বাংলা-সাহিত্য' গ্রন্থের "মুখবন্ধে" এই কালের ইতিহাসকে তিনি এই ভাবে স্থায়িত্ব দান করিয়াছেন—

"এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি' নামক বহুনিন্দিত পত্রিকার উদ্ভব হয়; ঐ পত্রিকাতেই সাহিত্য-সমালোচনার মূলসূত্র ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছিলাম। যাঁহাদের অকৃত্রিম আগ্রহ ও সাহিত্যিক সমপ্রাণতা এই কার্যে আমার উৎসাহ রক্ষা করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান সজনীকান্ত দাস, শ্রীমান নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের নাম আমি এক্ষণে স্মরণ করিতেছি। শ্রীমান সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে অতিশয় অপ্রিয় ও দুঃখকর আলোচনার ভার লইয়া যেভাবে আমার লেখাগুলির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন—নিন্দার বিষ নিজ অংশে রাখিয়া যেভাবে প্রশংসার মধু আমার জন্য সংগ্রহ করিতেন, এবং তাহাতেই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন—আজিকার দিনে সেরূপ সাহিত্য-প্রীতি যথার্থই দুর্লভ। এই গ্রন্থের প্রায় সকল রচনাই এমনই ভাবে এই কালে লিখিত হইয়াছিল।"—১৩৪৩

মোহিতলাল আমার বিষপানটাই দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার চিত্ত তখন অমৃতের জন্য হাহাকার করিতেছিল। গূঢ় গোপন অন্তরলোকে এই কালে যে বিপর্যয় চলিতেছিল কবিতাকারে তাহার পরিচয় দিয়াই আমি প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি-রেখা টানিতেছি—

*   *   *   *

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ
বিশ্ব-হলাহল,
আমার বক্ষের মাঝে নব জন্ম লভে অকস্মাৎ
শুষ্ক তৃণদল।
নিখিলের পুষ্প যত চিত্তে মোর উঠে বিকশিয়া,
অনন্ত আনন্দ-রস ধরা-বক্ষে পড়ে যে ক্ষরিয়া ;
কলহ ডুবিয়া যায়—সত্য শিব বিরাজে সুন্দর,—
বিরহ পলায় দূরে, মিলনেতে বিশ্ব-চরাচর
শোভে মনোহর।
শুধু শান্তি অবিরাম, নিখিলের সঙ্গীত-কাকলী
উঠে যে উছলি।

*   *   *   *

মথিয়া বিশ্বের বিষ সুধা যত আহরণ করি
বিশ্ব করে পান।
কল্পনা-মৃণাল-বৃন্তে চিত্তপদ্ম রাখি নিত্য ধরি ;
সঙ্গীত মহান্

মনোবীণা হতে মোর উচ্ছ্বসিত হয় শূন্য মাঝে,
কর্মভারাতুর যবে কর্ণে মোর সে সঙ্গীত বাজে ;
চমকিয়া জাগি আমি—পান করি নিস্যন্দিনী ধারা,
কে আনিল স্বর্গজ্যোতি ! চারিদিকে অন্ধকার কারা,—
স্মৃতি দীপ্তিহারা !
ক্ষণে জাগ নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নসম মিলাও চকিতে—
ক্ষুব্ধ করি চিতে ।

কঠিন উপলখণ্ড পদে পদে বাধা হয় পথে ;
ক্ষণে ভুলি দিক—
ধূলায় কর্দমে হই নিস্পেষিত মহাকাল-রথে,
দুর্বল পথিক !
আবরণ টুটে যায়, প্রকটিত রন্ধ্রমুখ যত,
ন্যুব্জ হয়ে পথ চলি সংসারের গুরুভার-নত ,
হিংসা দ্বেষ অপমান চারিদিকে বহ্নিজ্বালা জ্বলে,
তুমি কোথা গুপ্ত রহ হৃদয়ের গোপন অতলে—
কোন্ মন্ত্রবলে !
বেদনা-জ্বালায় চিত্ত ছিন্ন-ভিন্ন শ্রান্ত ব্যথাতুর
আঘাতে নিষ্ঠুর !

কেন আস কেন যাও, কোন্ কল্পলোকে তব স্থান,
স্বপ্ন-সহচরী !
বার বার পরিচয়ে আজো তার হ'ল না সন্ধান ।
মায়া-যাদুকরী,
তোমারে চিনি না, শুধু ক্ষণে ক্ষণে পাই পরিচয়,
অন্তরের পূজা মোর বার বার লভে পরাজয়,
মায়াবিনী, তুমি তব অন্ধকার চিত্তগুহা হতে
চমক হানিয়া যাও, সংসারের কণ্টকিত পথে
আমার জগতে ।

কর্মক্লান্ত হয়ে যবে খুঁজি শান্তি আগ্রহে ব্যাকুল
নাহি মিলে কূল।

এই লুকাচুরি-খেলা, এও ভাল বস্তুর জগতে,
স্বপ্ন অবাস্তব
যত ক্ষণিকের হোক এই সত্য মিথ্যাময় পথে—
আলোক দুর্লভ!
পাষাণ-পঞ্জর টুটি' ক্ষণিকের এই উৎস-ধার,
কারাগারে রন্ধ্র-পথে এই স্পর্শ আলোক-রেখার,
ঘোর বিভীষিকা-মাঝে নন্দনের আনন্দের ছবি,
ক্লেদপঙ্ক মাঝে এই সুবাসিত কুসুম-সুরভি—
ধন্য মানে কবি!
যেথা থাকো পাই যেন রহি' রহি' রহস্য-আভাস।
জীবন-নিশ্বাস!

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

। নির্ঘণ্ট ।